লেখার কাজ : শ্রমসময়ের অ(ন)ভিজ্ঞতা ও লেখকের কথা

সংযোজন (ADDENDUM)

দেবরাজ দাশগুপ্ত

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা : ACSSS1100216 / 2015-16

তত্ত্বাবধায়ক : ডঃ অনির্বান দাশ

অধ্যাপক, সংস্কৃতিবিদ্যা

সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোস্যাল সায়েন্সেস, ক্যালক্যাটা

সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোস্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কোলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৪

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভূমিকা ১

[প্রথম অধ্যায়] *কাকে বলি লিখনের শ্রম?* ১১

ভূমিকা – রবীন্দ্রনাথ ও মানিক : আলোচনার সূত্রপাত – ‘লেখকের কথা’ – লিখণ ও শ্রমের উদ্বৃত্তমূল্যের তত্ত্ব – লিখনে কি ঘটে – দেরিদা ও লিখনের দর্শন – চিহ্ন ও মূল্যের তর্ক – উপসংহার

[দ্বিতীয় অধ্যায়] *বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য এবং সাহিত্যের সংজ্ঞা।* ৬০

ভূমিকা – বিষয়গত দিক দিয়ে মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনার প্রধাণ চারটি দিক – ডেরেক অ্যাট্রিজের সাহিত্যচিন্তা ও সৃজণের প্রসঙ্গ – বাংলা সমালোচনা সাহিত্য ও সাহিত্যের ধারণা – উপসংহার

[তৃতীয় অধ্যায়] *সাহিত্যিক মূল্য ও লিখন।* ১২৪

ভূমিকা – আয়ুব, মার্ক্সবাদ ও সাহিত্যের মূল্য – দেরিদা ও ভবিষ্যত চিন্তা – সৃজণ, ভবিষ্যত ও মূল্য – লেখকদের কথা – উপসংহার

উপসংহার ১৭৭

গ্রন্থপঞ্জী ১৮২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দীর্ঘ দিন ধরে ব্যক্তিগত ভাবে সাহিত্য রচনার পাশাপাশি, এম ফিলের গবেষণায় কমলকুমার মজুমদার বিষয়ক গবেষণার সূত্রে লিখনের দর্শন বিষয়ে নিবিড় পাঠে নিযুক্ত হই। আমার নিজের দীর্ঘ দিনের লেখা লিখির অভ্যাসটিকেই ক্রমে আরও নিপুণ ও বিশ্লেষণাত্মক উপায়ে বুঝতে শুরু করি যেন। কমলকুমার মজুমদার বিষয়েও ব্যক্তিগত কিছুটা আগ্রহ প্রায় স্নাতক স্তর থেকেই ছিল। সেই সূত্রেই হয়ত – সাধারণ ভাবে, লেখা লিখির ব্যক্তিগত অভ্যাস, বিচার, ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সাথে – লেখা-লিখি কেমন হওয়া উচিতের যে দ্বন্দ্বমূলকতা সেই বিষয়ে বারং বার ভাবতে হয়েছে আমাকে। ভাবতে হয়েছে জনপ্রিয় ও তথাকথিত উচ্চ-ঘরানার শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে। কমলবাবুর সাহিত্যের গোঁড়ার ঝগড়াটাই তো খানিকটা সেটা। মূলত আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজবাস্তবতাবাদী বা মার্ক্সপন্থী চিন্তকদের সাথে কমলকুমারের প্রধান তর্কগুলির মধ্যে দিয়ে ক্রমে একটি প্রশ্ন আমার মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে – তাহলে কমলকুমার বা অমিয়ভূষণ প্রমুখের সাহিত্যগুলির কি রাজনৈতিকতা নেই? এরই পাশাপাশি উঠে আসে যে প্রশ্ন, সেটা হল – তাহলে সাধারণ ভাবে লেখা-লিখির প্রক্রিয়াটিকে কি কোন একটা মানদণ্ড বা বিচার-ধারার মধ্যে দিয়ে বুঝে ওঠা আদৌ সম্ভব? বিদেশের লেখক, দার্শনিক এবং বাংলা সাহিত্যিক ও সমালোচকেরা কি এ বিষয়ে আদৌ কিছু ভেবেছিলেন? এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই যেন এই গবেষণার বছরগুলি পার হয়ে গেল। সাহিত্যের বিচার নিয়ে ভাবতে বসে, সাহিত্যের যাথার্থ্য - মূল্য থেকে আরম্ভ করে লিখনের প্রক্রিয়া লিখনের দর্শন, মর্ম তথা লেখার কাজ অবধি পৌঁছে যেতে হত আমাকে এবং সেখান থেকে ক্রমে সাধারণ অর্থে 'কাজ' বিষয়েও ভেবে ফেললাম খানিকটা। একটু একটু করে বুনতে বুনতে গবেষণার অন্তে এসে মনে হচ্ছে - যেন নিজের কাছেই অপ্রত্যাশিত কিছু একটা বুনে ফেললাম ক্রমে। শ্রমের তত্ত্ব বা অর্থনীতির কোন কিছুর সঙ্গে কখনই তেমন কোন সখ্যতা না থাকলেও – গবেষণার স্বার্থে সেসব বিষয়ে অনেকখানি পড়াশুনো করে ফেলতে হল। সাধারণ একজন বাংলা সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে হয়ত এত বিস্তৃত কোন ক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা করবার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারতাম না। প্রাথমিক ভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের বাংলা সাহিত্য পঠন এবং তার পর, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস ক্যালকাটা-র এম ফিল ও পি এইচ ডি-র সময়কার নানাবিধ বিচিত্র বিষয়ের গবেষণা-মুখী কোর্স-গুলির সাহায্যেই মূলত এতটা বিস্তৃত একটি কাজের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস পাই। সেন্টারের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, সেমিনার, আলোচনা, বন্ধু-বান্ধব, সবটুকুর থেকে প্রতি নিয়ত এত বেশি শিখেছি – যা ঠিক হিসেব করে ওঠা মুশকিল। হয়ত এম ফিলের সময়কার কমলমজুমদার বিষয়ক গবেষণার সময় থেকেই তাই – এত বিস্তৃত একটি কাজ করার সাহস মনের মধ্যে জেগে উঠতে থাকে। তাই এই

গবেষণার জন্য আমি মুখ্যত সেন্টারের কাছে এবং পাশাপাশি যাদবপুর বাংলা বিভাগের কাছে ভীষণ রকমের কৃতজ্ঞ।

আমার গবেষণার পরামর্শদাতা, ডঃ অনির্বাণ দাশের সাহচর্য ও পথ-প্রদর্শন ছাড়া এই কাজ অসম্ভব ছি - সে কথা বলাই বাহুল্য। গবেষণার বছরগুলির মধ্যে আমার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ওঠা-পড়ার দিনগুলিতেও অনির্বাণ দা (এবং ওনার পরিবার) যথার্থ পরামর্শদাতার মতন নিবিড় ভাবে আমার কাজের ছোট ছোট ত্রুটি ও সাফল্যগুলির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন – কখনো শিক্ষকের মতন, কখন বন্ধুর মতন আবার কখন একজন যথার্থ চিন্তকের মতন। সুতরাং ওনার অবদানের প্রসঙ্গটিকে সঠিক ভাবে দু-এক কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এছাড়াও বিশেষ কয়েকজনের বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য বলে মনে হয়, যেমন – লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর সন্দীপ দত্ত, আমার পড়শি প্রয়াত প্রভাত বাবু, বোধিসত্ত্ব দা, স্বাতী ঘোষ, ঋতু সেন চৌধুরী, কবিতা পাঞ্জাবি, প্রশান্ত চক্রবর্তী, চিরঞ্জীব বাবু, সুদীপ্ত দা, সম্রাট দা; আমার বন্ধুদের মধ্যে বিবস্বান, ঐশানী, অর্ঘ্য, শাওন, শুভ্রদা, পৃথা দি, সৌরভ, অনিমেষ, সুদীপ্ত, ইন্দ্রনীল, অর্ক, দিব্যেন্দু ; আমার ছেলেবেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গী অগ্রজ প্রতিম অনির্বাণ বসু ও অর্কপ্রভ বসু প্রমুখেরা এই গবেষণা পর্বের ছোট বড় নানা সময়, নানা ভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

কয়েকজনের প্রতি কৃতজ্ঞতার থেকেও অতিরিক্ত কোন উৎসর্গ-ভাবই হয়ত বেশি মাত্রায় জেগে ওঠে আমার মনে - কারণ পড়াশুনো ও গবেষণার বছরগুলিতে সর্বক্ষণ প্রায় ছায়ার মতন এঁরা আমাকে আগলে রেখেছিলেন – তাই পরিশেষে তাঁদের কথা না উল্লেখ করা সম্ভব নয় – আমার মা, বাবা, মামনি, দিদি, জামাইবাবু এবং সর্বোপরি আমার প্রিয় বন্ধু ইমন কল্যাণ দাশ – যার সাথে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিনগুলিতে আলাপ না হলে লিখনের গভীরতা বিষয়ে - আমি হয়ত আজীবন অজ্ঞই থেকে যেতাম।

ভূমিকা

আমাদের গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু ‘লেখার কাজ’। স্বভাবতই মনে হতে পারে - সাধারণ অর্থে ‘কাজ কী?’ - এই প্রশ্নটি থেকে আমরা ক্রমে ‘লেখার কাজ কী বা কীরূপ?’ - নামক প্রশ্নটিতে উপনীত হব। কিন্তু সেরকম তথাকথিত অবরোহী তর্কবিদ্যার পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা গবেষণায় অগ্রসর হব না। তার পরিবর্তে টুকরো-টাকরা, ছিন্নবিচ্ছিন্ন তথাপি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য আলোচনার মধ্যে দিয়ে, আমাদের গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে, ক্রমে আমরা ‘লেখার কাজ’ বিষয়ে একটি সাধারণ ধারণার কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করব এবং সেখান থেকে আরও বৃহৎ আরেকটি ধারণা – যাকে আমরা ‘কাজ’ বলি – সেই বিষয়েও মোটের উপর মৌলিক কোন দাবিতে পৌঁছানো যায় কিনা - সেই প্রচেষ্টা করবো। যদিও উল্লেখ করে নেওয়া উচিত ‘কাজ’ নয়, ‘লেখার কাজ’-ই আমাদের গবেষণার প্রধান আলোচ্য-বিষয়। আপাতত এই ভূমিকায় - আমাদের গবেষণার সার্বিক যুক্তিটিকে খানিকটা গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করবো, তারপর যতটা সম্ভব খণ্ড খণ্ড করে প্রতিটি অধ্যায়ের টুকরো টুকরো তর্কগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব। সামগ্রিক যুক্তিতে প্রবেশ করার পূর্বে, দুটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় – প্রথমত, ‘তর্ক’ শব্দটিকে আমরা আমাদের লেখায় বেশ কয়েকবার ব্যবহার করব। ‘তর্ক’[1] শব্দটি বাংলা ভাষার প্রচলিত ব্যবহারে - বিতর্ক বা যুক্তিসম্মত ঝগড়া, বিবাদ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা খুব নির্দিষ্টভাবে, ‘তর্ক’ বলতে ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে ‘Argument’ (যুক্তি)– সেটাই বোঝাতে চাইবো। ‘তর্ক’-কে বিতর্ক বা বিবাদের সঙ্গেই কেবলমাত্র গুলিয়ে ফেলবো না। স্পষ্ট কথায় – যুক্তি অর্থে, মতামত অর্থে খুব বেশি হলে সন্দর্ভ বা আলোচনা অর্থে ‘তর্ক’ -কে আমরা বুঝবো। কোন বিতর্ক বিষয়ে যখন আমরা আলোচনা করবো তখন তর্কের পরিবর্তে, বিতর্ক শব্দটিকেই ব্যবহার করবো। দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন তা গবেষণার পদ্ধতি বিষয়ক। আমাদের গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি অংশে যদিও আমরা আমাদের গবেষণার পদ্ধতি বিষয়ে বেশ কিছুটা বিস্তারিত আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি - তবুও আপাতত এখানে গবেষণার পদ্ধতি বিষয়ক কয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়। ঠিক কোন পদ্ধতিকে অনুসরণ করে আমরা গবেষণার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাব – এই প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে, ‘লেখার কাজ’-কে বুঝে উঠবার ক্ষেত্রে অনেকগুলি পদ্ধতিই প্রযুক্ত হতে পারে - যেমন, বাংলা সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে উপন্যাস, গল্প, কবিতা কিংবা নাটক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিক সংরূপের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার সঙ্গে, সেগুলির লেখকদের ব্যক্তিগত ডায়েরি, প্রবন্ধ কিংবা জবানির পারস্পরিক আলোচনা। সেই আলোচনা থেকে উঠে আসা কতগুলি প্রশ্ন আমাদের বুঝতে সাহায্য করতে পারে – লেখকদের

[1] ‘তর্ক’- শব্দটির ব্যবহার সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে, যুক্তি অর্থে নানা ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়েছে, ‘তর্কবিদ্যা’ বলতে আমরা সাধারণত দর্শণশাস্ত্রের ‘Analytical Logic’-এর প্রসঙ্গটিকেই বুঝে থাকি।

নিজস্ব বয়ান এবং তাদের রচিত সাহিত্যের মধ্যেকার তফাত থেকে কীভাবে সাহিত্যিকের কাজকে বোঝা যায় – সেই বিষয়ে। উক্ত আলোচনার সঙ্গে শ্রমতত্ত্বের আলোচনাকে পাশাপাশি পাঠ করে একভাবে আমরা গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করতে পারি। যদি এই পদ্ধতি অনুসরণ না করি, তাহলে – বাংলা ভাষায় লিখিত যে সকল 'সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত বয়ান' খুঁজে পাওয়া যায় তাদের জড়ো করে, বিদেশি সাহিত্যিকদের সমধর্মী লেখাগুলিকে তুলনামূলক বিচারে পাঠ করে গবেষণার প্রশ্নটিকে কেন্দ্রীভূত করতে পারি। এছাড়াও আমাদের গবেষণা কেবল গূঢ় অর্থে দার্শনিক লেখার উপর ভিত্তি করে, গড়ে উঠতে পারে - যেখানে কেবল বিশুদ্ধ দার্শনিক যুক্তির কাটা ছেঁড়ার মধ্যে দিয়েই মূল যুক্তির যাত্রা সম্ভবপর হয়। যেভাবে মূল ধারার বিজ্ঞান তাঁর গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যায়, প্রধানত সেটা বিশ্বজনীন কতগুলি পদ্ধতি নির্ভর (যদিও তার মধ্যে ব্যতিক্রম কার্যকরী) – সেভাবেই আমাদের গবেষণা কোন একটি বিশেষ পদ্ধতিকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে, 'লেখার কাজ' কী? এই প্রশ্নটি - সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনার প্রক্রিয়াটিকে জানবার তাগিদ থেকে, উঠে আসা একটি প্রশ্ন। সেক্ষেত্রে সাহিত্যিকের মনস্তত্ত্ব থেকে শুরু করে সাহিত্যের দর্শন, লেখকদের ব্যক্তিগত লেখা, লিখনের দর্শন, শ্রমের দর্শন - সাধারণ অর্থে সাহিত্যের দর্শনের ধারণাগত ইতিহাস এবং একই সঙ্গে সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস – এই সবকিছুকে একত্রে আলোচনা করার একটি প্রচেষ্টা থেকেই আমাদের গবেষণার প্রশ্নটি উঠে আসে। আমরা জানি সব কিছু নিয়ে আলোচনা করা একটা কাজের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তাই আমি এমন একটি রেখা বেছে নেওয়ার চেষ্টা করবো যেখান থেকে দেখলে, এই সবকটি দিককেই প্রায় যেন - একটি অঞ্চলে গুটিয়ে এনে, গবেষণার প্রশ্নটির ভিতর ছড়িয়ে থাকা অন্য অন্য প্রশ্নগুলির উত্তরও একই সঙ্গে আলোচনা করা যায় – অর্থাৎ সহজ কথায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার চেষ্টা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, বাংলার ও বিদেশের চিন্তকদের তুলনামূলক ভাবে পাঠ করার চেষ্টা – সবটুকুই যেন একত্রে সম্ভবপর হয়। তুলনামূলক পাঠের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে আমরা প্রথম অধ্যায়ের শেষে আলোচনাও করব – কোন সাহিত্যিক পাঠ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে যদি কোন সমালোচক দেশী বা বিদেশী দর্শন বা তথাকথিত 'তত্ত্ব' ব্যবহার করেন – সেই ব্যবহারের নানাবিধ রকমফের হতে পারে – কেউ মনে করতে পারেন তত্ত্বের ভার পাঠ্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া বা পাঠ্যকে তত্ত্বের সঙ্গে যথাযথ খাপ খাইয়ে নেওয়াই তত্ত্ব-প্রয়োগের একমাত্র লক্ষ্য আবার কেউ মনে করতেই পারেন - তত্ত্ব এবং কোন একটি পাঠ্যের ক্ষেত্রে সেই তত্ত্বের প্রয়োগ হুবহু একরকমের বিষয় নয়। প্রয়োগের ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও পাঠ্যের আলগা মিশ্রণ থাকবে, তেমনটাই স্বাভাবিক ও বাস্তবিক – কোন একটা তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে কোন একটি পাঠ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া সমালোচকের কাজ নয়। তত্ত্ব ও পাঠ্যের তুলনামূলক আলোচনায় যে ভাবনা-সূত্রগুলি, যে সম্ভাব্য সিদ্ধান্তগুলি উঠে আসছে সেগুলিকে প্রস্ফুটিত করাই সমালোচকের বা গবেষকের কাজ। তত্ত্বের প্রয়োগ আসলে তত্ত্বকে প্রমাণ করার হাতিয়ার নয়, তত্ত্বের প্রয়োগ আসলে কোন চিন্তার বা বোধের আরেক রকমের উন্মোচন। আমরা আমাদের গবেষণায় এই অর্থেই যে কোন দর্শন বা তত্ত্বের প্রয়োগ করার চেষ্টা করব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য – আমাদের গবেষণার

যে প্রধান প্রশ্ন – ‘লেখার কাজ কী?’ – সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে নেমে হয়ত অবশেষে আমরা আরও গভীর কিছু প্রশ্নের দিকে সরে যাব, হয়ত সেটাই যে কোন গবেষণার পরোক্ষ উদ্দেশ্য।

গবেষণার পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনার শেষে, আমাদের গবেষণার প্রধান বক্তব্যটিকে সহজ কয়েকটি বাক্যে তুলে ধরা প্রয়োজন। ‘লেখার কাজ’ শব্দ দুটি পাশাপাশি যেন কিছুটা ধন্ধ উদ্রেককারী সন্দেহ নেই। লেখা তো নিজেই একটি কাজ, তাহলে আলাদা করে লেখার মধ্যেকার কোন কাজ বিষয়ে আমরা আগ্রহী কেন? তেমন কি আদৌ কিছু হয়? কাজের মধ্যেকার কোন কাজ? বিষয়টি আদৌ তেমন নয়। লেখা (যা আমাদের আলোচনায় প্রায়শই ‘লিখন’ হিসেবে ব্যবহৃত) আসলে, নানাবিধ দার্শনিকের আলোচনায় সামান্য একটি কাজের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব বহনকারী একটি ধারণা। কীভাবে লিখন একটি বৃহৎ ধারণা সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত ভাবে গবেষণার মধ্যে আলোচনা করবো কিন্তু কেবল সেই কারণেই আমরা লেখা এবং কাজ শব্দ দুটিকে পৃথক ধরে নিয়ে পাশাপাশি বসিয়ে দিতে চাইনা। লেখা কি আদৌ সামান্য, তুচ্ছ একটি কাজ? সাহিত্যিকদের বেশিরভাগের মতেই লেখা অর্থাৎ সাহিত্য সৃষ্টি অর্থে লেখা আসলে মহৎ, অলৌকিক ঘটনা বিশেষ। চাষি বা মজুরের কায়িক কাজের থেকে লেখা একটি ভিন্ন এবং উঁচু স্তরের একটি কাজ। বেশিরভাগ সময়েই সাহিত্যিকদের এরকম উচ্চশ্রেনীধর্মী মতামত প্রকাশের জন্য বিভিন্ন পরিসরে অসম্মানিত এবং সমালোচিত হতে হয়। এই মতটি সত্যিই সমালোচনার যোগ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, লেখালিখি-কে উচ্চস্তরের কাজ ভেবে সমাজের বাদবাকি জীবিকা বা কাজগুলিকে ছোট করে দেখার মনোবৃত্তি অবশ্যই সমালোচনার যোগ্য – সন্দেহ কি? এরকম একটি পরিচিত বিতর্ক বা বিতণ্ডার গভীরে প্রবেশ করলেই আমাদের কাছে একটি প্রশ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ঠিক কি কারণে সাহিত্য-সৃষ্টির কাজকে মহিমাময় লেখালিখির কাজ বলে মনে করা হয়ে থাকে আর কি কারণে অন্যান্য কাজকে তেমন মহিমাময় মনে করা হয়না – এরকম মতামতের মধ্যে কি সত্যি কোন বিচারযোগ্য যুক্তি আছে, আলোচনা করার মত বিতর্ক আছে? এইসকল ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করলেই আমরা সাধারণ ভাবে - লেখকের প্রতিভা বা লেখার মধ্যে দিয়ে, সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে - ঐশ্বরিক, অতিলৌকিক, উত্তরণধর্মী অনেকানেক পবিত্র অভিজ্ঞতার বিষয়ে জানতে পারি। মোটা দাগে আলোচনা করলে - সাহিত্যিকদের কাজ অনেক বেশি অতিলৌকিক, মহিমাময়, ঐশ্বরিক এবং যেহেতু সেইসব অভিজ্ঞতা দুর্লভ ও কঠিন সাধনার বিষয় সুতরাং সকলেই সাহিত্যিক হওয়ার যোগ্য নয়। প্রকৃত অর্থে লেখা যেকোনো কর্মীদের সাধ্যের বিষয় নয়। মোটের উপর এরকম আলগা একটি যুক্তি দিয়েই লেখালিখির মাহাত্ম্য বিষয়ে সাধারণ মানুষের সচেতনতা কাজ করে থাকে বলে আমরা ধরে নিতে পারি এবং কেবল লেখা নয়, সাধারণ অর্থে শিল্প, সঙ্গীত সব ধরনের শৈল্পিক কর্মের ক্ষেত্রেই মানুষের মধ্যে এই ধারণা চালু আছে। এই ধারণাটিকে যদি প্রশ্নহীন ভাবে মেনে নিতে না হয়, তাহলে এই ধারণার বিরুদ্ধে একটি প্রশ্নকে দাঁড় করানো প্রয়োজন। ঠিক কোন কোন উপাদান দিয়ে লেখার কাজ বিষয়টি সংগঠিত বা লেখার কাজ ঠিক কোন ধরনের ধারণামূলক সমীকরণের মধ্যে দিয়ে ক্রিয়াশীল?

লেখার কাজের প্রধানত দুটি দিক, একটি হল প্রকাশ এবং অপরটি হল সম্বন্ধ। এই দুটি দিককে নানাভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা চলে। বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাব, নানাভাবে এই দুটি দিককে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকাশ যখন নির্দিষ্ট-রূপে সম্বন্ধে উপনীত হতে সক্ষম হয় তখনই যেন এক অর্থে লেখার কাজ তার সম্ভাব্য পূর্ণতা লাভ করে। কার প্রকাশ? লেখক লেখার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে এবং সেই সূত্রে তার পাঠকের সঙ্গে সম্বন্ধ রচিত হয়। পাঠক সাহিত্যের মধ্যে নিজেকে সম্পর্কিত করার প্রয়াস করেন এবং সেই সূত্রে যেন তিনি লেখকের সঙ্গে একভাবে সম্পর্কিত হন। এই প্রকাশ ও সম্বন্ধের খেলা, অবভাস বিদ্যার পরিভাষায় আত্ম ও অপরের সম্বন্ধের সন্দর্ভ। কিন্তু প্রকাশ ও সম্বন্ধের কোন বাঁধাধরা নিয়ম বা গত আছে কি? কোন একটি পথ ধরে চললে তবে এই কার্য সম্পন্ন হবে – এমন কোন সমীকরণ আছে কি? না তেমন কোন নির্দিষ্ট পথ নেই। প্রাচীন কাল থেকেই নানাবিধ আলোচনা আছে, মতান্তর আছে, দর্শন, তর্ক, বিতর্ক আছে। এই ধরনের আলোচনাগুলিকে আমরা - নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব বা শিল্প-তত্ত্ব বলে থাকি। এই সকল আলোচনার মধ্যেই প্রধানত সাহিত্য ও শিল্পের যাথার্থ্য বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কাকে সাহিত্য বলব, কাকে বলব না, কোন লেখা সাহিত্য এবং কোন লেখা সাহিত্য নয় – তার ভিত্তিই হচ্ছে, এই ধরনের আলোচনার মহাফেজখানা।

অন্যদিক দিয়ে দেখলে, সাহিত্য রচনার কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা পাচ্ছি, যা অন্যকাজের ক্ষেত্রে আছে কিনা সেটা বোঝা যাচ্ছেনা। সাধারণ নিত্য-নৈমিত্তিক সাহিত্যের ধারণায় – সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিকের কাজের মধ্যে যে পার্থক্য আমরা খুঁজে পাই – সেই পার্থক্যের কিছু ভিত্তি উপরের আলোচনায় আমরা খুঁজে পাচ্ছি। এই ধরনের বিশেষত্ব সূচক অনিশ্চয়তার সূত্র ধরেই, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে লেখকের এমন একধরনের সমস্যার দেখা পাওয়া যাচ্ছে, যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার থেকেও বড় কথা, সেই সমস্যাটি নিজেই অন্যান্য আরও অনেক প্রশ্নের দিকে আমাদের ঠেলে নিয়ে যায়। সমস্যা হল, সাধারণ অর্থে - শ্রমের মূল্য পরিমাপ বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে একজন চাষি বা মজুর এমনকি একজন কেরানীর শ্রমকে যথাযথ ভাবে পরিমাপ করে ফেলা সম্ভবপর হলেও, একজন শিল্পী বা লেখকের শ্রমকে কি পরিমাপ করতে পারা সম্ভব হচ্ছে? কারণ তার সাহিত্যিকের শ্রমের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা আগেই অনুমান করতে পারছি – যা অন্য কাজে নেই। তাহলে একটি পরিমাপ বিজ্ঞান দিয়ে দুধরনের কাজকে বিচার করছি কেমন করে? অন্য দিক দিয়ে ভাবলে, সাহিত্য বা শিল্পের কাজের ক্ষেত্রে শ্রমের মূল্য পরিমাপের যে সমস্যা – সেই সমস্যা কি আসলে, সার্বিক অর্থে কাজের ক্ষেত্রে শ্রমের মূল্য পরিমাপের যে বিজ্ঞান তার সীমাবদ্ধতাকেই প্রশ্ন করে ফেলছে? তাহলে সেই প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে আমরা কীভাবে বৃহত্তর অর্থে কাজের দর্শন বিষয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারি? প্রকারান্তরে 'লেখার কাজ' বিষয়ে, আরও নিশ্চিতভাবে কয়েকটি ধারণায় উপনীত হতে পারি। এই চিন্তার অনুষঙ্গেই মৌলিক একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে - আমরা তাহলে কীভাবে বুঝতে সক্ষম হই যে – কোন লেখাটি প্রকৃত অর্থে সাহিত্য এবং কোনটি অসাহিত্যিক লেখা? সমস্ত লেখার মধ্যেই তাহলে কি সাহিত্য হয়ে ওঠার বা অন্য অর্থে – লেখার সংকীর্ণ ব্যবহারিক সীমানা অতিক্রম করে, বৃহৎ পরিসরে উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়না?

যে সম্ভাবনার বিষয়ে আমরা আপাতত চিন্তিত হচ্ছি, সেই সম্ভাবনা বা যদি তাকে একধরণের অসম্ভাব্যতা হিসেবেও চিহ্নিত করি – তার প্রতি সচেতন হওয়ার ক্ষেত্রেও, সেই পথ অনুসরণ করার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই লেখকের বেশকিছু গুণাগুণ, অভ্যাস ও মতাদর্শের প্রয়োজনীয়তা আছে? নানাবিধ ব্যাখ্যায় তা নানারকম, সন্দেহ নেই। কিন্তু একভাবে বললে, একটি বিশেষ ধরণের সচেতনতা বা প্রস্তুতি ছাড়া কি আদৌ লেখক হওয়া সম্ভব, সাধনা ছাড়া কি সাহিত্য সম্ভব? এই বিতর্কে অনেক সময় নানামুণির নানা মত আমরা দেখতে পাই। কেউ কেউ বলেন লেখকের যদি যথাযথ জীবন-অভিজ্ঞতা, জীবন-যাপন, যাপিত-অভিজ্ঞতা না থাকে – তাহলে তার পক্ষে সাহিত্য লেখাই সম্ভব নয়, বাজারি কিছু উৎপাদন করে ফাটকা হাততালি পেলেও, সেই লেখা আসলে সাহিত্য নয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন বাজার কি একেবারেই বাতিল করে দেওয়ার জিনিস নাকি? বাজারে প্রতিষ্ঠা না পেলে, ব্যক্তিগত ভাবে কে কি লিখল তা ডায়েরি হতে পারে কিন্তু তা কখনই সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারেনা। একটা বিশেষ মানের লেখা না হলে – বাজার কখনই তাকে স্বীকৃতি দিতে পারেনা। কেউ কেউ মনে করেন অভিজ্ঞতা দিয়ে আদৌ লেখা হয়না, আসলে সবটাই লেখার গণিত, আঙ্গিক গত, সাহিত্যের রূপ-রীতি গত ব্যাপার – সেসব না জেনে, সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে সচেতন না হয়ে লিখতে গেলে কখনই যুগান্তকারী সাহিত্য রচনা করা সম্ভবপর নয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন লেখা কি আর কেউ ইচ্ছে করে লিখতে পারে – লেখা আসে। সৃষ্টি আসলে অনেকটা প্রসব বেদনার মতন – না সৃষ্টি করলে সেই বেদনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়না। অথচ সাধারণ ভাবে ভাবলে, লেখা তো আর পাঁচটা কাজের মতই একটা কাজ। কেরানীদের মতই লেখকেরা কাগজে বা টাইপরাইটারে কিংবা কম্পিউটারে বসে বসে লেখেন, সেই লেখা অন্তর্জালে বা দোকানে প্রকাশিত পুস্তক আকারে বিক্রি হয় এবং সেটা একজন পাঠক দাম দিয়ে কেনেন, কিনে চোখ দিয়ে পাঠ করেন – মোটাদাগে এর বেশি আর কোন কিছু হয় বলে সচরাচর শোনা যায়না। তাহলে কি সত্যিই লেখকের নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা থাকে, যা অ-লেখকদের থেকে ভিন্ন? তাহলে অভিজ্ঞতা ছাড়া কি লেখা হয়না?

আমাদের গবেষণায় এই প্রশ্নগুলিকে আমরা স্বাভাবিক ভাবে মূল কয়েকটি ধারণায় ভেঙে নিয়ে আলোচনা করেছি। এক হল – লেখকের অভিজ্ঞতা। দুই- সাহিত্যের সংরূপ। তিন – সম্বন্ধ বা সাহিত্যের মূল্য। চার – ভবিষ্যচেতনা বা জীবনদর্শন বা নীতি-রাজনৈতিকতা। মূল বক্তব্যটি খুব পরিষ্কার – লেখার কাজ একটি 'কার্য-ঘটনা' যা সম্পূর্ণরূপে লেখকের অভিজ্ঞতার উপরেও নির্ভর করেনা আবার লেখার আঙ্গিক বা সংরূপ বা রীতির উপরেও নির্ভর করেনা। একজন সাহিত্যিক লেখার কাজের মধ্যে দিয়ে, লেখার সংকীর্ণ অর্থনৈতিক সীমানাকে লঙ্ঘন করে – লিখনের সাধারণ অর্থনীতির দিকে ধাবমান হয় এবং তার এই কাজের মধ্যে সে সাহিত্যের এককত্ব এবং তার দার্শনিক সামান্যতার ধারণা কোনটিকেই সে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে যায়না। সাহিত্যের অনন্যতার মধ্যে দিয়েই যেন দার্শনিক সামান্যতার উন্মোচন চলে তার কাজে। এই কাজকে যেহেতু লেখকের অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বেঁধে ফেলা চলেনা সেই হেতু এ যেন একধরনের অনভিজ্ঞতা, অসম্ভাব্যতা। আবারও বলি – এই কারণেই লেখার কাজকে লেখকের অভিজ্ঞতা এবং অন্য দিকে সাহিত্যের বা লেখালিখির সংরূপ, রীতি, কাঠামোর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে

ধরে ফেলা বা বেঁধে ফেলা সম্ভবপর হয়না। লেখকের শ্রমের পরিমাপ একভাবে পরিমিত হয়েও রয়ে যায় অপরিমেয়। সেই ধারণাকে স্মরণে রেখেই আমাদের গবেষণার মূল বক্তব্য লেখার কাজ আসলে শ্রম-সময়ের একধরনের অ(ন)অভিজ্ঞতা। যে অ(ন)ভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত - সংকীর্ণতা থেকে উন্মুক্তি এবং নীতি-রাজনীতি, জীবনদর্শন তথা ভবিষ্যচেতনার প্রশ্ন। লেখকের আত্মের উন্মোচন এবং অপরের তরে কর্তব্যপরায়ণ ও নিমন্ত্রক বা আহ্বায়ক হয়ে ওঠার প্রসঙ্গ। সচেতন জীবনদর্শন বা জীবন-অভিজ্ঞতা ছাড়া লেখক হওয়া সম্ভবপর নয় কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও তার প্রকাশেই লেখার কাজ থেমে থাকেনা অপরের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা ও কাজের সংকীর্ণ সীমানাকে লঙ্ঘন করে অপরের প্রতি আহ্বায়ক হয়ে ওঠা এবং পরিশেষে যেন একভাবে অপরের সঙ্গে অসম্ভব সম্বন্ধে মিলিত হওয়ার মধ্যে দিয়েই লেখার কাজ, সাহিত্য সৃষ্টির কাজ পূর্ণতা লাভ করে থাকে। সম্ভবত ভূমিকাংশে এর থেকে বেশি স্পষ্ট করে, আমাদের গবেষণার মূল বিষয়টিকে তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। তিনটি অধ্যায় জুড়ে ক্রমে, ধাপে ধাপে আমরা আমাদের বক্তব্যটিকে সুস্পষ্ট রূপে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করবো। আপাতত তিনটি অধ্যায়ের যা বিষয়বস্তু পৃথক পৃথক ভাবে তাদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের গবেষণার মূল বক্তব্যটির আরও কিছুটা বিস্তার গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা প্রধানত আমাদের গবেষণার শিরোনামটিকে ('লেখার কাজ : শ্রমসময়ের অ(ন)অভিজ্ঞতা ও লেখকের কথা) যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্ন-পত্রাবলী' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লেখকের কথা' গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রথমে দেখাতে চেষ্টা করব - কীভাবে লেখার কাজ আসলে প্রকাশ ও সম্বন্ধ –এই দুটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। এই তর্কটির উপস্থাপনার ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি উল্লেখ করব এবং অতঃপর তার বিশ্লেষণ করব সেই উদ্ধৃতিটি হল –

"তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি...তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয়না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিংবা ভুল বুঝবি, কিংবা বিশ্বাস করবি নে, কিংবা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবল সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্য আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানেনা, আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না এবং নম্র-ভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না এবং যেটুকু তাদের নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না – তখন মনের ভাবগুলি তেমন সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকে যায়। এর থেকেই বেশ বুঝতে পারি আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে।

আমাদের ভিতরে সব চেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত ; তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই ”[২]

এই পঙ্‌ক্তি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমরা মূলত একধরণের সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে - সাহিত্য (যে শব্দের মূলে আছে সহিতত্বের দ্যোতনা) প্রকাশ এবং সংযোগ এই দুটি খুঁটির উপরেই দাঁড়িয়ে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং যেহেতু এই দুটি অংশই সাহিত্যের মূল সেই হেতু প্রকাশের ঘাটতি এবং সংযোগের অভাব দুয়েরই সম্ভাবনা থেকে যায় । একভাবে সংজ্ঞায়িত করলে বলা চলে এই প্রকাশ ও সংযোগই সাহিত্যের সংজ্ঞার প্রধান দুটি শর্ত। এই দুই শর্তের পূরণ যথাযথ হচ্ছে কিনা সেটাই আসল কথা। অন্যদিক থেকে দেখলে যে সকল লেখার ক্ষেত্রে এই দুটি শর্ত অপূর্ণ থেকে যায় সেসব লেখা সাহিত্য নয়। সাহিত্য সমালোচনার দীর্ঘ ইতিহাস কে লক্ষ্য করলে দেখা যায় নানা রকমের রেজিস্টারে এই সাহিত্য হওয়া এবং না হওয়াকে বুঝতে চাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও লেখকের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলেছে - এই নিয়ে। এটা ইউরোপ বা অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যের পরিসরেও হয়ে এসেছে। এই ইতিহাসটা সর্বদাই ‘সাহিত্য কী?’ –প্রশ্নটাকে জাগিয়ে রাখে, স্বাভাবিক ভাবেই। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে লেখকের শ্রমের পরিমাপ কীভাবে শ্রমের সাধারণ পরিমাপ-পদ্ধতির মধ্যে একটি ছিদ্র-বিশেষ, কীভাবে লেখকের শ্রম মেপে ওঠা যায়না সে বিষয়ে আলোচনা করব। প্রসঙ্গক্রমে আমরা প্রবেশ করব শ্রমের মূল্যতত্ত্বের প্রসঙ্গে। এই আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান পাঠ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লেখকের কথা’ গ্রন্থ – যেখানে মানিক লিখেছেন –

“ঘরে শিল্প-সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুঁজি ঘাটা আর ঘরে বাইরে সর্বত্র সব সময় মানুষকে আর জীবনকে তন্ন তন্ন করে দেখা ও জানা এবং মনের মধ্যে তাই নিয়ে তোলপাড় করা, যোগ বিয়োগ করা, মিলিয়ে দেখা আর অমিল খোঁজা ও সব কিছুর মানে বোঝার চেষ্টা – লেখকের বিরামহীন এই শ্রম মাপাই বা হবে কিসে, দামই বা কষা হবে কোন নিরিখে?”[৩]

অর্থাৎ লেখকের শ্রমকে, শ্রম-পরিমাপের মাপদন্ডে যথাযথ মেপে ওঠার ক্ষেত্রে একধরনের সমস্যা আলোচনার মধ্যে দিয়ে মানিক আসলে লেখকের শ্রমের যে বিশেষত্ব ও সেই বিশেষত্ব আলোচনার তাৎপর্য – সেই প্রসঙ্গে লিখছেন। এই যে পরিমাপের ঝামেলা, সংশয়, অসম্ভাব্যতা – এর মধ্যে দিয়েই আসলে সাহিত্য বা শিল্পের ঝামেলা বা সমস্যা বা একইসাথে বিশেষত্ব তথা তথাকথিত মহত্ত্বের একরকমের পরিচয় পাওয়া যায়। বোঝা যায় কেন লিখন আসলে সবিশেষ। কেন তাকে আর পাঁচটা কাজের মতো যেমন তেমন করে বুঝে ফেললে, মেপে ফেললে – বড় ধরনের

[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী* (‘ভূমিকা’), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

[৩] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-৩৭

সমস্যা তৈরি হয়। এই শ্রম ও তার পরিমাপের ঝামেলার প্রসঙ্গ থেকেই আমরা শ্রমমূল্যের আলোচনা তত্ত্বে প্রবেশ করব (যদিও সে আলোচনা আনুষঙ্গিক)। মূল্যতত্ত্বের প্রেক্ষিত থেকেও বিচারের প্রচেষ্টা করব খানিকটা।

রবীন্দ্রনাথ এবং মানিক আলোচনার সূত্রেই আলোচনা করবো – ঘটনা হিসেবে লিখনের তাৎপর্য। অমিয়ভূষণ মজুমদার তার 'লিখনে কি ঘটে' গ্রন্থে লিখন, সংবিত্তি (Communication) এবং নীতির বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন, সেই আলোচনার সঙ্গে আমাদের আলোচনার যোগসূত্র খুঁজব আমরা। অমিয়ভূষণের দুটি উদ্ধৃতির বিষয়ে এখানে উল্লেখ করতে পারি –

১। সাহিত্য ও সমাজের সোজাসাপটা সংযোগকে অস্বীকার করে অমিয়ভূষণ লিখেছেন –

"সোশ্যাল মিল্যু-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও, সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তা বলা যায় না। সাহিত্যে এমন কিছু থাকে যা সমাজে থাকেনা...আসলে সাহিত্যের সহিতভাব একটা লক্ষণ মাত্র। সবটুকু নয়। সহিতত্ব আছে বললেই সাহিত্যকে বোঝায় না।"[৪]

২। সাহিত্যিকের অতিরিক্ত কোন মহিমা-প্রসঙ্গকেও অমিয়ভূষণ নিজের মতন করে একভাবে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা করতে গিয়ে লিখেছেন –

"অন্তরে প্রয়োজনের বেশি বাড়তি খানিকটা কিছু আছে বলেই সাহিত্য করা। সেই বাড়তি কিছুর স্বরূপ নির্ধারণ কঠিন তো বটেই, কিন্তু বাড়তি কিছু থাকলেই তা সাহিত্যের দিকে টানবে বা ঠেলে দেবে এমন নিশ্চয়তা দেখছিনা।"[৫]

অধ্যায়ের অন্তে আমরা ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদার লিখন-দর্শন বিষয়ে আলোচনা করব। বিশ্বের তাবৎ দর্শণচর্চার ইতিহাসকে স্মরণে রেখেই বলা চলে, দেরিদা একমাত্র দার্শনিক যার দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে লিখনের তর্ক। আমাদের মতে লিখন বিষয়ক যে কোন আলোচনার দার্শনিক অঙ্গ হিসেবে দেরিদার দর্শন অপরিহার্য। সেই হেতু দেরিদা কীভাবে লেখালিখির সাধারণ ধারণা থেকে লিখন –কে একটি ব্যাপক দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করছেন, সেই বিষয়ে আলোচনা করব আমরা। দেরিদার দর্শনের সঙ্গে আমাদের গবেষণার সম্বন্ধ বিষয়েও আলোচনা করব এবং ক্রমে আমরা লক্ষ্য করব কীভাবে আমাদের আলোচনা আমাদের গবেষণার মূল প্রশ্নটিকে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট করে তোলে। মূল প্রশ্ন যার কথা আগেও বলেছি, এখানে আরেকবার লিখছি – "লেখার কাজ আসলে কী? কী

[৪] তদেব, পৃ-৯

[৫] অমিয়ভূষণ মজুমদার, *লিখনে কী ঘটে,* আনন্দ পাব্লিসার্স, কোলকাতা, ১৯৯৭, পৃ- ৭৫

আসলে শ্রমসময়ের অ(ন)অভিজ্ঞতা? এবং সেই প্রেক্ষিতে কীইবা লেখকের কথা?" – এই আমাদের মূল প্রশ্ন ও গবেষণার শিরোনাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমাদের মূল আলোচনার বিষয় হল – লিখন বিষয়ে আমরা যে তর্কটি তুলছি – সেটি কি কেবল দু'এক জন সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কোন আলোচনা নাকি, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যেভাবে লেখালিখিকে চিন্তা করা হয়েছে, সাহিত্যিক মূল্যকে চিন্তা করা হয়েছে – তার সঙ্গে আমাদের গবেষণার তর্কটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ? সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব মূলত বাংলায় লিখিত সাহিত্য- সমালোচনার ইতিহাসকে সামনে রেখে। প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসবে দেরিদীয় সাহিত্যের-দর্শন, দেরিদীয় চিন্তাবিদ ডেরেক অ্যাট্রিজের সাহিত্য ও সৃজন-চিন্তার সূত্রে আমরা আমাদের গবেষণার আলোচনাগুলিকে পাঠ করার চেষ্টা করব। অ্যাট্রিজ তাঁর "Singularity of Literature" এবং "Work of Literature" – দুটি গ্রন্থেই দেরিদার সাহিত্যচিন্তা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ডেরেক অ্যাট্রিজ তাঁর সিঙ্গুলারিটি অফ লিটারেচার গ্রন্থে প্রশ্ন করেছেন -

"… why is it (creation) so often described by creators not as an experience of doing something but of letting something happen?"[৬]

অ্যাট্রিজের এই তর্কের সূত্র ধরে আমরা দেখবো যে লিখন আসলে – এক ধরণের কার্য-ঘটনা। একই সাথে দেখব কিভাবে, লিখনের এরূপ দ্যোতনা দেরিদার দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। অর্থাৎ সৃষ্টিশীল কার্য হিসেবে লিখন একাধারে যেমন কিছু একটা করাকে বোঝায়, আবার অন্যদিকে কিছু একটা হওয়াকে বা কিছু একটা ঘটে যাওয়াকেও বোঝায় – তাই একে আমরা কার্য-ঘটনা বলতে চাইব। লিখনের এইরূপ ধারণার পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করব - আমাদের গবেষণার মূল আলোচনা ও ভবিষ্য-দর্শনের পারস্পরিক সম্বন্ধ কীরূপ। সেই বিষয়ে আলোচনা করে, পরিশেষে আমরা উপনীত হব – বিশেষত সাহিত্যিক মূল্য বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্নে – অর্থাৎ সাহিত্যিক মূল্য কি, কোনটা সাহিত্য এবং কোনটা সাহিত্য নয় ইত্যাদি প্রশ্নে। এই অংশের আলোচনা দীর্ঘ – আপাতত এখানে কেবল দুটি প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা প্রয়োজন –

১। আমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব – কীভাবে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু করে - বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রপরবর্তী সাহিত্য সমালোচক, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক – যেমন প্রমথ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু, সুধিন দত্ত, বিষ্ণু দে, ধুর্জটিপ্রসাদ প্রমুখের সাহিত্য-চিন্তায় মোটের উপর পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত – একধরনের যথাযথ সাহিত্য বা সাহিত্য এরকমটা হওয়া উচিত - জাতীয় মতামতের বহিঃপ্রকাশ তীব্র-ভাবে ঘটে যেতে থাকে। আমাদের ভাষায়, অ্যাট্রিজ ও দেরিদার সাহিত্য-বোধের প্রেক্ষিতে, যে প্রবণতা আসলে এক-একধরণের ভবিষ্যচিন্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেন এবং কিভাবে সে বিষয়ে আমরা নানাভাবে উক্ত অধ্যায়ে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করব।

[৬] Attridge Derek, The *Singularity of Literature,* Routledge, London, 2004, p – 3

২। দ্বিতীয়ত, পঞ্চাশ পরবর্তী দেশভাগ এবং নকশাল, হাঙরি প্রভৃতি আন্দোলন ও সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রভাবের ফলে, সাহিত্য নিয়ে চিন্তাভাবনায় – বিশেষ মাত্রায় বিশ্বসাহিত্য-চেতনার ঝোঁক এবং উদারীকরণ ও গোলকায়ণের ঝোঁক এসে সংযুক্ত হয় – তথাপি, আমাদের মতে এই সমস্ত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আসলে ত্রিশ-চল্লিশের সেই পুরোনো তর্কের জেরই আসলে বাংলা সংস্কৃতির মূল তর্ক হিসেবে সঞ্চালিত হয়েছে – কি সেই তর্ক? মার্ক্সবাদী প্রগতি সাহিত্য-চেতনা ও তার নানাবিধ বিরোধী সাহিত্য-চিন্তা ও চেতনার মধ্যবর্তী তর্ক-বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ও ঝুট-ঝামেলা। যে কারণে মার্ক্সবাদী সাহিত্যমূল্য ও তার বিরোধী সাহিত্যমূল্যের মধ্যেকার বিতর্ক আমাদের আলোচনার প্রাণ কেন্দ্র থেকে কখনই একেবারে সরে যেতে পারবেনা।

তৃতীয় অধ্যায়, আমরা শুরু করব ঠিক সেই সাহিত্যের মূল্যের তর্ক থেকেই – রবীন্দ্রপন্থী আবু সয়ীদ আইয়ুব ও মার্ক্সবাদীদের মধ্যেকার বিতর্ক থেকে আমরা বুঝতে চাইব – সাহিত্যের মূল্য ও ভবিষ্যতের সম্পর্ক, লেখকের জীবনদর্শন ও ভবিষ্যতের সম্পর্ক। এই অধ্যায়ে সাহিত্যের মূল্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আবার ফিরব শ্রমের মূল্য আলোচনার প্রসঙ্গে। কিভাবে নানাবিধ শ্রম, শ্রমের নানাবিধ মূল্য – সাহিত্যিক মূল্যের আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কে যুক্ত – সেটা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব আমরা। পরিশেষে, তিনটি অধ্যায় থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলিকে – বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন লেখকদের নিজস্ব লিখন বিষয়ক আলোচনা থেকে পুনরাবিষ্কার করার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের লেখার কাজ বিষয়ক সমগ্র আলোচনাটিকে সমাপ্ত করব। এই অধ্যায়ে, আমাদের যুক্তি-র যাত্রা, ক্রমে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও মার্ক্সবাদীদের মধ্যেকার বিতর্ক থেকে – লিখন, উপহার ও ভবিষ্যতের ধারণার আলোচনার মধ্যে দিয়ে – শ্রমের মূল্যতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গকে আশ্রয় করে লেখার কাজ সংক্রান্ত আলোচনার মানচিত্রটিকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছে। এই অধ্যায়ের শেষ অংশে – আমাদের গবেষণা থেকে উঠে আসা – লেখার কাজ সংক্রান্ত ধারণাকে আমরা বিশ শতকের শেষার্ধের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকজন লেখকের – লেখালিখি সংক্রান্ত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে পুনরায় সংগঠিত করে নেওয়ার চেষ্টা করব।

অতঃপর গবেষণার উপসংহার অংশে উপনীত হব। উপসংহার অংশে আমরা লেখার কাজ –এর আলোচনাকে কেন্দ্র করে কাজ-কে একরকম করে ধারণাধীন করার প্রয়াস করব।

আলোচনার নানান অংশে, একটি প্রশ্ন বারং বার উঠে আসবে, যে বক্তব্যটি দিয়ে আমরা আমাদের এই ভূমিকা শুরু করেছিলাম অর্থাৎ, লেখার কাজ বিষয়ে আমরা যেসকল সিদ্ধান্ত খুঁজে পেতে পারি – সেগুলিকে কি সাধারণ ও বৃহৎ অর্থে কাজের ধারণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে মনে করা যেতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে ঠিক নির্দিষ্ট অর্থে কোন সিদ্ধান্ত নয়, কেবল কয়েকটি অনুমান ও ভাবনাকে – গবেষণার সামগ্রিক আলোচনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, উপসংহার অংশে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। যদি সেই সব সূত্র ধরে কিংবা আমাদের গবেষণার যেকোনো আলোচনার সূত্র ধরেই নতুন কোন গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয় – তাহলে আমরা বুঝব আমাদের গবেষণা লেখার কাজটি কিছুটা সফল হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

এই অধ্যায়ের প্রাথমিক লক্ষ্য হল আমাদের গবেষণার মূল প্রশ্নটিকে বিস্তারিত ভাবে স্পষ্ট করে তোলা। আমাদের গবেষণার এই প্রশ্নটি কোন ধরনের বিশ্লেষণাত্মক চিন্তার ফলে উদ্ভূত হল এবং ঠিক কোন ধরনের যৌক্তিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে গবেষণার এই প্রশ্নটিকে আমাদের প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় - পর্যায়ক্রমে নানাবিধ আলোচনার মধ্যে দিয়ে সেটাই আমরা পরিস্ফুট করার চেষ্টা করব। এক কথায়, এই অধ্যায়ে আমাদের গবেষণার মূল বিষয়টির একটি ধারণাগত মানচিত্র প্রস্তুত করবার প্রয়াস করব আমরা – যার ভিত্তিতে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমাদের আলোচনা অগ্রসর হবে।

(অধ্যায়-সার)

১। অধ্যায়ের প্রথম অংশে, আমরা একদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছিন্ন-পত্রাবলী’ গ্রন্থের থেকে লিখন-বিষয়ক একটি তর্কের সঙ্গে - সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র বা রস-শাস্ত্রের কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা করব। অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লেখকের কথা’ গ্রন্থ থেকে লিখন সংক্রান্ত আলোচনার সঙ্গে এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী আলোচনার পারস্পরিক তুলনার মধ্যে দিয়ে আমরা এক ভাবে আমাদের গবেষণার মূল প্রসঙ্গটিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। লেখালিখির ঝোঁক কীভাবে সাহিত্যের নির্দিষ্ট প্রকোষ্টগত সংজ্ঞাগুলিকে ভেঙে ফেলে লিখন হয়ে উঠতে চায়, সেই তর্কই আমরা অনুসন্ধান করে দেখতে চাইব এই অধ্যায়ে। সেই অনুসন্ধানের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে আমাদের, রবীন্দ্রনাথ ও মানিকের বক্তব্যকে পাশাপাশি রেখে পাঠ করার প্রাসঙ্গিকতাটুকুও একইসঙ্গে স্পষ্ট হবে বলে আমার ধারণা।

২। দ্বিতীয় অংশে, মানিক ও রবীন্দ্রনাথের লিখন সংক্রান্ত আলোচনার সূত্র ধরেই, আমরা সাধারণ ভাবে ‘লেখার কাজ’- সংক্রান্ত আলোচনার আরেকটু গভীরে প্রবেশ করব। এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লেখকের কথা’ গ্রন্থ থেকে লিখনের পূর্ববর্তী আলোচনার সাপেক্ষে ‘লেখক’-এর অবস্থানকে বোঝার চেষ্টা করব। পাশাপাশি উঠে আসবে লেখক ও কেরানীর শ্রমের প্রসঙ্গ এবং একই সঙ্গে এই দুই ধরনের শ্রমের ‘তফাতে’র প্রসঙ্গ।

৩। তৃতীয় অংশে, আমরা ‘লিখনের’ সঙ্গে শ্রমের উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব – কারণ মানিকের এই গ্রন্থ বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে শ্রমের মূল্যতত্ত্বের প্রসঙ্গ অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত।

৪। চতুর্থ অংশে, মানিক এবং রবীন্দ্রনাথের আলোচনাকে সম্বল করে লিখন বিষয়ক যে ধরনের তর্কে আমরা এই অধ্যায়ে প্রবৃত্ত হবো – সেই ধরনের তর্ক বাংলা সাহিত্যের আরও নানান লেখকের লেখায় হয়ত আমরা খুঁজে পেতেই পারি এবং তা একই সঙ্গে প্রমাণ করে, যে এই তর্ক আসলে সমালোচনা সাহিত্যের গভীরের একটি তর্ক। সেই সূত্র ধরেই - এই অংশে আমরা অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘লিখনে কি ঘটে’ নামক একটি গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা করব । এই অংশের আলোচনা খানিকটা হলেও মানিক ও রবীন্দ্রনাথের লিখন সংক্রান্ত বক্তব্যগুলির সাধারণ বা সার্বিক প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আমাদের সচেতন করবে বলেই আমার ধারণা।

৫। আমাদের গবেষণায় লিখনের ধারণা বারং-বার যে দার্শনিকের লিখন-তত্ত্ব দ্বারা বিশ্লেষিত, প্রভাবিত ও সঞ্চালিত হতে থাকবে – সেই জাক দেরিদার লিখনের দর্শনটি আসলে ঠিক কি ছিল? অধ্যায়ের পঞ্চম অংশে আমরা সেই দর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনার সাপেক্ষে আমাদের এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী তর্কগুলিকে সাজানোর চেষ্টা করবো।

রবীন্দ্রনাথ ও মানিক : আলোচনার সূত্রপাত

“তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি...তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয়না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিংবা ভুল বুঝবি, কিংবা বিশ্বাস করবি নে, কিংবা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবল সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্য আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানেনা, আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না এবং নম্র-ভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না এবং যেটুকু তাদের নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না – তখন মনের ভাবগুলি তেমন সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকে যায়। এর থেকেই বেশ বুঝতে পারি আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে সব চেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত ; তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই ”[৭]

ছিন্ন-পত্রাবলী গ্রন্থের শুরুতেই ইন্দিরাদেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত আছে। এই উদ্ধৃতিটিতে রবীন্দ্রনাথ ছিন্ন-পত্রাবলীর মূল কথাগুলিকে যেন সাজিয়ে দিয়েছেন। উপরের বাক্যগুলি সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ‘ছিন্নপত্রাবলী’-র কালপর্বটিকে যদি একটি বাক্যে তুলে ধরতে চাই তাহলে সাধারণ

[৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী* (‘ভূমিকা’), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

অর্থে - কেবলমাত্র নিজস্ব চিন্তা দিয়ে রোম্যান্টিক কবির যে জগতটিকে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকে গড়ে তুলেছিলেন সেই জগতটা শহরের পরিধি ছেড়ে অন্য একটা গ্রামীণ জগতের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। সেই জগতটা প্রকৃতির বিরাট উপস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং অনেকাংশেই বদলে যাচ্ছে, বাস্তব অভিজ্ঞতায় সম্পৃক্ত হচ্ছে[৮]। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ তার ভাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে চিঠি লিখে চলেছেন। চিঠিগুলি প্রধানত ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের বিবরণ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এই চিঠিগুলিকে সংগ্রহ করে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে তিনি ঠিক এইরকম ভাবে অন্য আর কোথাও ভাবেননি[৯]। রবীন্দ্রনাথের এই পর্বটি একজন তরুণ কবির আত্ম-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয় সময়। রোসিঙ্কা চৌধুরী যখন ছিন্ন-পত্রাবলীর ইংরেজি অনুবাদ করেন তখন তিনি সেই গ্রন্থের নামকরণ করেন - 'Letters from an Young poet' নামে। গ্রন্থের ভূমিকাংশে উনি দেখিয়েছেন যে, কিভাবে 'ছিন্ন-পত্রাবলী'র চিঠিগুলির মধ্যে একজন কিশোর কবির আত্ম-সংগঠনের প্রক্রিয়া আছে[১০]। হয়ত সেই কারণেও রবীন্দ্রনাথ নিজের এই চিঠিগুলিকে সংরক্ষণ করে রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। একেবারে ব্যক্তিগত প্রেক্ষিতে সরে এসে উনি এমন কিছু লিখে ফেলেছিলেন এখানে, যা তিনি জনপরিসরের মাঝে হয়ত তেমন করে লিখে উঠতে পারেননি।

আপাতত আমাদের আলোচনায় পূর্বোক্ত বিশেষ উদ্ধৃতিটি থেকে কয়েকটি প্রশ্ন নির্দিষ্ট করে তুলে আনা প্রয়োজন –

এক) তিনি চিঠিতে এমন কিছু লিখছেন যা সাহিত্যে লিখতে পারছেন না। চিঠি এবং সাহিত্যের ভিতর এখানে তফাত টানছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জীবনানন্দ দাশ ১৯৫২ খ্রী : লেখা তাঁর 'লেখার কথা' প্রবন্ধে চিঠি এবং সাহিত্যের

---

[৮] রবীন্দ্রনাথের ছিন্ন-পত্রাবলী পর্বের (মোটের উপর ১৮৮৭-১৮৯৫) – 'সোনার তরী', 'চিত্রা-চৈতালি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'মণিহারা', 'নিশীথে' ইত্যাদি সহ অন্যান্য সাহিত্য-কীর্তিগুলির প্রসঙ্গ অনেকক্ষেত্রেই আলোচিত হয়। এই পর্বের সাহিত্য হিসেবে সেইসকল সাহিত্যকীর্তির পৃথক মূল্যও আছে। 'বসুন্ধরা' লেখাটি সর্বজনবিদিত, সেটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা, মাটির পৃথিবীর অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে। আরও নানা ভাবেই তাকে বিশ্লেষণ করা চলে। এই পর্বটি রবীন্দ্রনাথের জীবনে - প্রকৃতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর্ব। এই পর্বে জমিদারীর কাজে তিনি গ্রামজীবনের সংস্পর্শে আসছেন। পদ্মানদীর বুকে নৌকাবিহার করছেন। রোসিঙ্কা চৌধুরী, যাঁর গ্রন্থ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব – এবিষয়ে তার লেখায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই প্রেক্ষিত থেকে ছিন্নপত্রাবলীর এক ধরণের পাঠ একই সঙ্গে সম্ভবপর এবং প্রচলিত। কিন্তু, আমাদের আলোচনায় 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ব্যবহার বেশ কিছুটা অন্যরকম – সেটাই আমাদের মূল বক্তব্য।

[৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইন্দিরা দেবী তাঁর আত্মকথণে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা ধরণের ব্যক্তিগত ঘটণা ও তথ্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনেকানেক বিষয় আছে, কিন্তু আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল একটি পংক্তি – যেখানে ইন্দিরা দেবী, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এমন কিছু লিখছেন – যা আমাদের উপরোক্ত তর্কের অনুরণণ বলে মনে হতে পারে আমাদের। ইন্দিরাদেবী লিখছেন,

"আমার নিজের ধারণা এই যে, সাধারণে ও অসাধারণে যেমন প্রভেদও আছে তেমনি কিছু-না-কিছু যোগসূত্রও আছে, নইলে আমরা তাঁদের মহত্বও বুঝতে পারতুম না। আমার অনেক সময় মনে হয়েছে যে, আমরা ক্ষণিকের জন্য যে উচ্চস্তরে উঠে আবার শীঘ্রই অভ্যস্ত সমভূমিতে নেমে যাই, তাঁরা জীবনের বেশিরভাগ সময়েই সেই উচ্চস্তরে বাস করেন।"

- ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, *রবীন্দ্রস্মৃতি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১০

[১০] Chaudhuri Rosinka, *Letters from a Young Poet: 1887-1895*, Penguin, UK, 2014.

সঙ্গে গদ্য এবং কবিতার তফাত করতে চেয়েছিলেন। জীবনানন্দ দাশ লেখালিখি সংক্রান্ত যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন, তার মধ্যে অন্যতম একটি লেখার মধ্যেই তিনি এই তফাতের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। অথচ সাধারণ ভাবে উল্টো অর্থেই করেছেন, অর্থাৎ চিঠি অনেকেই লিখতে পারে কিন্তু সাহিত্য অনেক বেশি মগ্নতার বিষয়। এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে ক্রমে যুক্তি ও বিশ্বাসের একটা তর্কে গিয়ে আদত প্রকাশ এবং আলগা বা হালকা কিছুর মধ্যে একটা তফাত বোঝার চেষ্টা করেছেন। তফাৎটা খুব সহজে দাগিয়ে দেওয়া যায়নি। চেতনা ও চৈতন্যের তফাতের কথা বলেছেন[১১] এবং সেখানেও ঠিক রসবাদ না হলেও, রসবাদের মত মিস্টিক কিছু একটার দিকেই উনি ইঙ্গিত করেছিলেন। পরিশেষে বিশ্বাস ও যুক্তির আপন আপন প্রয়োজনের তর্কে গিয়ে লেখা থামান। সেই লেখায় মহৎ লেখক এবং সাধারণ লেখকের তফাৎটাকে জীবনানন্দ বজায় রাখছেন, ওনার 'সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি'[১২]-র ধারণাটা উনি কখনোই ছাড়ছেন না। জীবনানন্দের সাহিত্য-চিন্তা বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছিনা আপাতত প্রসঙ্গক্রমে জীবনানন্দের বক্তব্য উল্লিখিত রইল। যদিও তিনি অসচেতন ভাবেই রবীন্দ্রনাথের উল্টো-পীঠের কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এই ধরনের ভাবনা বাংলা সাহিত্যের পরিসরে নিত্যনৈমিত্তিক সাহিত্য-চেতনার অঙ্গ। চিঠির নগণ্যতা এবং মহৎ সাহিত্যের প্রাধান্য এটাই ওনার ভাবনার বিষয়, খটকার বিষয়। হয়ত সেই অর্থে ভাবতে গেলে, "প্রথাগত" ভাবে সাহিত্যের অন্যতম শত্রু চিঠি কিন্তু আমাদের পাঠে চিঠির মধ্যেই যেন লিখনের সুগভীর সম্ভাবনাগুলি ব্যক্ত হচ্ছে। যদিও ব্যক্তিগত লেখা ও প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বিষয়ক এই তর্কটি অনেক পুরাতন তবুও এরই পাশাপাশি আমরা ক্রমে নানাবিধ আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখব, এই তর্কটি আপাতভাবে খুব শীর্ণ ও তুচ্ছ একটি তর্ক মনে হলেও একই সঙ্গে এটি সাহিত্য ও লিখন বিষয়ক কতখানি গভীর ও মৌলিক একটি তর্ক। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন যে তিনি বিদেশে ভ্রমণ করতে গিয়ে কেবলমাত্র 'ছিন্ন-পত্রাবলী'-কেই সঙ্গে রেখেছিলেন বাংলার আদত চিত্রকে সঙ্গে সঙ্গে রাখার জন্য – তবু আমার মতে ছিন্ন-পত্রাবলীতে বাংলার গ্রামীণ চিত্রাবলীর বা প্রকৃতির প্রকাশ বিষয়টা কিছুটা গৌণ, অন্তত সেই কারণে রবীন্দ্রনাথও এই চিঠিগুলিকে সংরক্ষণ করতে চাননি বলেই মনে হয় – বরং এখানে সাহিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু

---

[১১] জীবনানন্দ দাশ, *আমার কথা কবিতার কথা*, ছোঁয়া, ২০১৫, পৃ-৯-১৮

[১২] জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' প্রবন্ধটি ওনার যাবতীয় প্রবন্ধের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত এ কথা সর্বজনবিদিত এবং সেই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই একটি বাক্য উনি লিখেছিলেন, 'সকলেই কবি নয়; কেউ কেউ কবি' – অর্থাৎ কবি এবং অকবির তফাৎ অনেকটাই যেন রবীন্দ্রনাথের রোজকার প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য এবং সত্যকারের প্রকাশের ধারণার সঙ্গে এক মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা ঠিক তেমনটা বলতে চাইছিনা কারণ – জীবনানন্দের ক্ষেত্রে এই কবিতার ধারণার মধ্যে এমন এক "অভিজ্ঞতার সারবত্তা"-র ধারণার কথা আছে, যা কেবল কবিদেরই আছে, অ-কবিদের নেই। এরকম কোন অটুট অভিজ্ঞতার শর্তে আমরা ঠিক প্রকৃত লেখক ও অপ্রকৃত লেখককে তফাৎ করার পক্ষপাতি নই, সেভাবে তফাৎ করলে কিভাবে আমরা উপস্থিতির অধিবিদ্যক ফাঁদে পা দিয়ে ফেলব, সে বিষয়ে অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা করব আমরা। আপাতত প্রকৃত প্রকাশ ও অপ্রকৃত প্রকাশের তফাতের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জীবনানন্দের 'আমার কথা' লেখাটির প্রসঙ্গে উল্লেখ করলাম মাত্র।

- জীবনানন্দ দাশ, (কবিতার কথা), *আমার কথা কবিতার কথা*, ছোঁয়া, ২০১৫, পৃ-১৪০

ভাবছেন, এমনভাবে নিজেকে মেলে ধরছেন যেভাবে তিনি তখনো পর্যন্ত আর কোথাও নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি।

দুই) তাঁর বক্তব্য অনুসারে, এই চিঠিগুলিতে তিনি ইন্দিরা দেবীকেই এমন কিছু লিখতে পারছেন – যা আর কাউকে লিখতে পারছেন না। এই যুক্তিটির মধ্যে অনেকখানি ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার প্রাবল্য থেকে থাকলেও আসলে এই বক্তব্যটিকে অন্যরকম ভাবে সম্বন্ধের শর্তে পাঠ করা যেতে পারে। 'সম্বন্ধ'-বিষয়ক আলোচনা আমরা আমাদের গবেষণার পরবর্তী অংশে আরও বৃহৎ অর্থে খুঁজে পাব।

তিন) অন্তরের গভীরতমকে দান-বিক্রয়ের ক্ষমতার অতীত বলছেন রবীন্দ্রনাথ। দান-বিক্রয় কথাটিকে পরবর্তীকালে আমরা আবার আলোচনা করব। দান এবং দান-বিক্রয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ করা যায় কিনা, বিক্রয় এবং দানের মধ্যে কী তফাত ইত্যাদি।

চার) সত্যের প্রতিবিম্ব ইন্দিরাদেবীর ভিতরে যেন অব্যাহত ভাবে প্রতিফলিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনের গোঁড়ার দিক থেকেই সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের প্রভাব গভীর। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারদের নানাবিধ মতামতের যে ধারা – সেই ধারার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক একটা অভিজ্ঞতা ছিল এবং সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে উনি নানা সময় সেই তর্কগুলিতে বিশেষত সেই তর্ক-ভাষায় ফিরে ফিরে গেছেন। এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য-চিন্তাকে বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আমরা বিচার করব। বিশ্বের নন্দনতত্ত্বের প্রধান ধারণাগুলির তথা রস-শাস্ত্রের খুব পরিচিত একটি তর্ক হল – 'সহৃদয়-সামাজিক'[১৩] পাঠকের মনমুকুর স্বচ্ছ হওয়া এবং লেখকের সঙ্গে বা শিল্প-স্রষ্টার সঙ্গে পাঠক বা দর্শকের একীভূত হওয়ার ঘটনা – যাকে 'সাধারণীকরণ' বা একীভবন বা অন্যভাষায় রসনিষ্পত্তিও বলা হয়েছে[১৪]। উপরোক্ত উদ্ধৃতিটিতে প্রতিফলন এবং সত্যের যে যুক্তি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ পাঠকের সঙ্গে ইন্দিরাদেবীকে আলাদা করতে চেয়েছেন – তার মধ্যে খুব সরাসরি না হলেও, প্রকারান্তরে রসবাদী যুক্তির ছাঁচ স্পষ্ট। হয়ত আরও খানিকটা প্রসারিত অর্থে এই যুক্তিটিকে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ ঔপনিষদিক চিন্তার সঙ্গে তুলনা করবেন কিন্তু আপাতত সরাসরি সেই আলোচনায় আমরা প্রবেশ করবোনা। যে রসবাদের কথা উল্লেখ করলাম তার একটি প্রাচ্য-তত্ত্বগত রূপরেখা তুলে ধরা প্রয়োজন। অবন্তী-

---

[১৩] 'সহৃদয়-সামাজিক', আসলে রসতত্ত্বের একটি পরিভাষা, এই পরিভাষার আসলে, আধুনিক সমাজের প্রেক্ষিতে পাঠককেই নির্দেশ করে – কিন্তু এমন একজন পাঠক যিনি নিজেকে অনুশীলনের মাধ্যমে যথার্থ পাঠক হিসেবে গড়েছেন, নিজের মনের স্বচ্ছতাকে আরও বেশি পরিশিলিত করেছেন এবং লেখকের হৃদয়ের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। অবন্তীকুমার তাঁর গ্রন্থে, রসবাদী অভিনবগুপ্তের 'অভিব্যক্তিবাদ' আলোচনার প্রসঙ্গে, এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা অনুসারে এই সহৃদয় হয়ে ওঠার কাজ কেবল পাঠকেরই নয়, একই সঙ্গে লেখকেরও বটে।

- অবন্তীকুমার সান্যাল, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ-৬০

[১৪] অবন্তীকুমার সান্যাল, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ-২২

কুমার সান্যাল তাঁর "ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব" গ্রন্থের 'প্রস্থানভেদ' ('প্রস্থানভেদ' শব্দটিকে আমরা নন্দনতত্ত্বের নানাবিধ মতামত বা ঐতিহ্য হিসেবে বুঝে নিতে পারি) অধ্যায়ে রসবাদের নানাবিধ বিভাজন বিষয়ে লিখেছেন[১৫], ভরতের নাট্যশাস্ত্র বা নাট্য-উপস্থাপনা সংক্রান্ত তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দীর্ঘ কাল ধরে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে, এক দলের থেকে অন্য দলের যে মতপার্থক্য গড়ে উঠেছে তা আসলে, ব্যাখ্যা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জোর দেওয়া এবং মৌলিক নানাবিধ আনুষঙ্গিক তর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে – সেগুলিকে একত্রে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই প্রস্থানগুলির কিছু প্রধান কর্ণধার ছিলেন। অবন্তী কুমারের মতে তাঁরা কেউই নিজেদের প্রবর্তক বলে দাবি করেননি বরং তাঁরা এক একটি বিশেষ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছিলেন ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছিলেন। ভামহ, উদ্ভট, রুদ্রট – অলংকার প্রস্থান ; দণ্ডী, বামন – রীতি প্রস্থান এবং ধ্বনিকার, আনন্দবর্ধন, অভিনব গুপ্ত – ধ্বনি-প্রস্থানের প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত। আগেই বললাম এরা নানা বিষয়ের উপর জোর দিয়ে ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করার মধ্যে দিয়ে নিজেদের মতামতগুলিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এই ইতিহাস দীর্ঘ এবং প্রতিটি প্রস্থানের তাত্ত্বিক জটিলতায় প্রবেশ করার কোন প্রাসঙ্গিকতা আমাদের আপাতত নেই। সুশীল কুমার দে তাঁর 'History of Sanskrit Poetics' –গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ভরত থেকে শুরু করে সংস্কৃত নন্দনতত্ত্বের সম্পূর্ণ ধারাটিকেই ক্রমান্বয়ে তুলে ধরেছেন। সেই গ্রন্থের মত বিস্তৃত না হলেও সেই মতবাদগুলিকে ক্রমান্বয়ে যথেষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাজিয়েছেন অবন্তী-কুমার সান্যাল। অবন্তী কুমারের গ্রন্থটির মান বিচার নিয়ে আপাতত আমরা চিন্তিত নই – বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, অতুল গুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতেরা রসতত্ত্ব বিষয়ে মৌলিক লেখালিখি করেছেন, কিন্তু অবন্তীকুমার কাব্যতত্ত্বের বিভিন্ন প্রস্থানগত ব্যাখ্যার ক্রমপরম্পরার বিশ্লেষক হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একজন চিন্তক।

আপাতত সাধারণ অর্থে রসতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্যকে বুঝবার জন্য যদি ভরতের রসসূত্রটির ব্যাখ্যা করতে যাই, তাহলে বিষয়টি কতকটা এরকম দাঁড়ায় – সংস্কৃত ভাষায় ভরতের রসসূত্রটি হল,

'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ'[১৬]

এই শ্লোকটিকে ভেঙে আলোচনা করলে তার অর্থ দাঁড়ায় – বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের সংযোগের ফলে রসের নিষ্পত্তি ঘটে। অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারীভাব সংযুক্ত হয়ে স্থায়িভাবকে - রসে নিষ্পন্ন করে। খুব সংক্ষেপে বললে, বিভাব কি? বিভাব রসনিষ্পত্তির হেতু বা কারণ – অর্থাৎ যে যে কারণগুলি উপস্থিত থাকলে

---

[১৫] এক্ষেত্রে কোন ধরণের রসবাদী প্রস্থান প্রধাণ আলোচ্য হিসেবে বিবেচিত সেই বিষয়েও অবন্তীকুমার আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখছেন, "সমুদ্রবন্ধ মহিমভট্টের অনুমিতিপক্ষকে বিচারযোগ্য বলে মনে করেননি (বিচারাসহত্বেন)। সমুদ্রবন্ধ কথিত পাঁচটি পক্ষকে অলংকার, রীতি, রস ও ধ্বনি-প্রস্থানের মধ্যে ব্যাপক অর্থে অন্তর্ভুক্ত করায় কোনই বাধা নেই।"[15] অর্থাৎ মোটের উপর যে কয়েকটি প্রস্থান উল্লেখিত হল, তার মধ্যেই তথাকথিত 'ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের' আলোচনাকে বেঁধে ফেলা সম্ভব।

[১৬] অবন্তীকুমার সান্যাল, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব* , সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ-২১

রসনিষ্পত্তি সম্ভবপর হয়, সেটাই হল বিভাব – একে অনেকে উদ্বোধকও বলেন[১৭]। অনুভাব কি? অনুভাব রসনিষ্পত্তির উপায় – অর্থাৎ যে উপায়ে রসনিষ্পত্তি সম্ভবপর হয় তাকে অনুভাব বলে[১৮]। ব্যভিচারীভাব বা সঞ্চারীভাব আসলে স্থায়ীভাবের আনুষঙ্গিক কতকগুলি ভাব বিশেষ। যা স্থায়ীভাবকে নির্দিষ্ট রসে সঞ্চারিত হয়ে নিষ্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে। নির্দিষ্ট স্থায়ীভাবগুলির, রসে নিষ্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক ভাবগুলির সাহায্য প্রয়োজনীয়। একদিক থেকে দেখলে, অনুভূতির নিষ্ক্রমণের প্রক্রিয়াকে একটি বিশ্লেষণাত্মক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাই রসতত্ত্বের প্রধান প্রকল্প। সেই সূত্রেই নানাবিধ বিশ্লেষণাত্মক শ্রেণি ও বর্গ বিভাজন করেছেন তাত্ত্বিকেরা। স্থায়ীভাবের উল্লেখ, ভরতে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, পরবর্তীকালের আলোচনায় তার গুরুত্ব আরও বেশি বাড়তে থাকে। ভরত বর্ণিত প্রায় সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিভাজনগুলিকে নিয়েই পরবর্তী নন্দনতাত্ত্বিকেরা তাঁদের প্রস্থান অনুসারে আলোচনা করেছেন। এই সূত্রেই নিষ্পত্তি-র ধারণাটিকে ঘিরে নানামুনির নানা মত ছিল – ভট্টলোল্লট বলেছিলেন উৎপত্তিবাদের কথা[১৯] অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের সংযোগে স্থায়ীভাব থেকে রসের উৎপত্তি হয়। স্থায়ীভাব কি? সহজ কথায় বললে, সহৃদয়-সামাজিকের মধ্যে পূর্ব থেকেই কিছু ভাব স্থায়ী-রূপে সুপ্ত থাকে। উৎপত্তিবাদ বলবে, সেইসকল ভাব থেকেই রসের উৎপত্তি হয়।

অর্থাৎ উৎপত্তির যুক্তি দিয়েই এক্ষেত্রে বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারীভাবের সংযোগ বা 'সম্বন্ধ'-টিকে পাঠ করা হচ্ছে। অবন্তী-কুমার আগেই উল্লেখ করেছিলেন যে অনুমিতিবাদকে সমুদ্রবন্ধ মেনে নেননি, খারিজ করেছিলেন তবু এই নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনায়, ভট্টলোল্লটের তর্কে, উৎপত্তিবাদের সঙ্গে মতান্তর দেখতে পাই। অবন্তী-কুমার এই মতান্তর বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন এবং অনুমিতিবাদ সর্বাংশে খণ্ডিত হয়ে গেলেও অনুমিতিবাদের সমর্থনে পরবর্তীকালে মহিমভট্ট আবার সওয়াল তোলার চেষ্টা করেছিলেন সেকথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটি তর্কের লড়াইয়ে জয়লাভ করতে পারেনি। অনুমিতিবাদের ক্ষেত্রেও রসের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উঠে আসেনি। কিন্তু, উৎপত্তিবাদের খন্ডনরূপে অনুমুতিবাদের তাৎপর্য অনেকখানি।

---

[১৭] অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *কাব্যজিজ্ঞাসা* , বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, কলকাতা, ১৮০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ – ২৩

[১৮] অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *কাব্যজিজ্ঞাসা* , বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, কলকাতা, ১৮০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ – ২৪

[১৯] "ভট্টলোল্লটের মতে, বিভাব স্থায়ীভাবের উৎপত্তির কারণ (উৎপত্তৌ কারণম্), যেমন নাটকের শকুন্তলা দুষ্যন্তের রতি নামক স্থায়ীভাবের উৎপত্তির কারণ। তার অর্থ স্থায়ীভাব কারণ বিভাবের কার্য। স্থায়ীভাব এইভাবে বিভাবের কার্য হওয়ায় ভরতের সূত্রের 'নিষ্পত্তি' অর্থ দাঁড়ায় 'উৎপত্তি'। অনুভাব ও ব্যাভিচারীভাবগুলো স্থায়ীভাবের কারণ নয়; বিভাব-অনুভাব-ব্যাভিচারীভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট (উপচিত) হলেই রস হয়। স্থায়ীভাব নিজে অপরিপুষ্ট। অন্তরের স্থায়ীভাবের সঙ্গে বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীর 'সংযোগ' হওয়াতেই রস হয়। তাই এখানে সংযোগ অর্থ দাঁড়ায় 'সম্বন্ধ'। বিভাব-অনুভাব-ব্যাভিচারীভাবের সঙ্গে উৎপাদ্য-উৎপাদভাব সম্বন্ধ ; অনুভাব অর্থাৎ আকার ইঙ্গিত চেষ্টা ইত্যাদি যা কিছু দিয়ে অন্তরের ভাব অনুমান করা যায় বা বোঝা যায় তার সঙ্গে গম্য-গমকভাব সম্বন্ধ; আর ব্যাভিচারীভাব রসকে পুষ্ট করে বলে তার সঙ্গে পোষ্য-পোষকভাব সম্বন্ধ। বিভাব-অনুভাব-ব্যাভিচারীভাব পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হলেই রস হয়।"

- অবন্তীকুমার সান্যাল, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব* , সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ-৪১

রসের ব্যাখ্যাকর্তাদের মধ্যে যাকে অভিনব গুপ্ত সবথেকে বেশি অনুসরণ করেছিলেন তিনি হলেন ভট্টনায়ক। যার মতবাদ ছিল ভুক্তিবাদ। অবন্তী-কুমার লিখছেন,

"রসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভট্টনায়কই সর্বপ্রথম বিষয়ের দিক থেকে বিষয়ীর দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়েছেন। রসকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সহৃদয় বা কাব্যরসিকের অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভবের বিশ্লেষণের পথে।"[২০]

আরও লিখছেন,

"তিনি রসনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তিনটি পৃথক ব্যাপার স্বীকার করেছেন – তারা হচ্ছে অভিধা, ভাবনা এবং ভোগীকরণ (অভিধা ভাবনা চান্য অদ্‌ভোগীকৃতমেবং চ)"।[২১]

পরবর্তীকালে আমরা যখন ধ্বনিবাদ-কেন্দ্রীক রসবাদী বিশ্লেষণের কথা পাই সেখানে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার কথা পাই। এই বিভাজনের একটা ছাঁচ ভুক্তিবাদের মধ্যেই রয়ে গেছে। 'ভোগীকরণ' শব্দটির মধ্যেই ভোগ-এর ধারণা আছে। অন্য দর্শনের ঘরানা থেকে এলেও অভিনব গুপ্ত ভট্টনায়কের এই তর্কের অনেকখানি ব্যাখ্যাকেই আত্তীকরণ করেছিলেন। "History of Sanskrit Poetics" গ্রন্থে সুশীল কুমার দে, স্পষ্ট ভাবে ভট্টনায়কের হারিয়ে যাওয়া বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।[২২]

---

[২০] যাকে রস বলা হয় তা অনুমিত স্থায়ীভাব। তাকে অনুমান করতে যে-হেতুচিহ্নের প্রয়োজন হয়, কার্য-কারণ-সহকারীরূপ বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীভাব সেই প্রয়োজনটি সিদ্ধ করে। অনুমিত স্থায়ীভাবের আশ্রয় অনুকর্তা অভিনেতা, কিন্তু দর্শক-শ্রোতার সেই স্থায়ীভাব অনুমান করার হেতুচিহ্নগুলো প্রকৃত পক্ষে অনুকার্য চরিত্রের, অভিনেতা সেগুলো অনুকরণ করে মাত্র, তাই তার পক্ষে সেগুলো কৃত্রিম। কিন্তু কৃত্রিম হেতুচিহ্ন দিয়ে কি অভিনেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুমান করা সম্ভব? শঙ্কুক বলেন, তা সম্ভব এই জন্যে যে, হেতুচিহ্নগুলো কৃত্রিম বলে দর্শক-শ্রোতার কখনো মনে হয়না, সেগুলো অভিনেতার বলেই মনে হয়।"

- অবন্তীকুমার সান্যাল, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ-৪৬

[২১] অবন্তীকুমার সান্যাল, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ-২২

[২২] "It is unfortunate that Bhatta Nayaka's Hrdaya-darpana is now lost. From the citations of Abhinavagupta and others, the conjecture is likely that it was not a comm entary on Bharata's Natya-sastra but an independent work written in prose and verse (i.e., with verse-karika and prose-vritti) and resembling Mahimbhatta's later *Vyakti-viveka* written in the same style and with the same object. Like the latter work, it was composed, if not for establishing a new theory of Poetics, at least for controverting the position of the *Dhvanyaloka* and formulating a different explanation of Dhvani, especially of *rasa-dhvani*. When Mahimbhatta later on took upon himself the task of "demolishing" the Dhvani-theory, he boasted are the outset of his elaborate attack that he had composed his Vyakti-viveka without looking into the *Darpana* (presumably Hrdaya-darpana, as explained by commentator), which was therefore obviously written with the same object of *dhvani-dhvamsa*. No doubt, Bhatta Nayaka was one of the four writers (mentioned by Abhinava, Mammata and others) who formulated explanations of Bharata's original *sutra* or rasa; but this in itself is reason to take him as a commentator on Bharata's text."

- (Ed.) Kumar De Sushil, *History of Sanskrit Poetics*(In Two Volumes), Firma K LM Pvt. Ltd., Calcutta, 1998, P-180

আপাতভাবে বলা চলে হয়ত অভিনবগুপ্তের আলোচনায় ভট্টনায়ক একজন 'ভোগবাদী' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছেন, তাঁর মত আদতে ঐরকমটা ছিল কিনা সেটা সত্যই গবেষণার বিষয়। সাংখ্য দর্শনে ভোগের ধারণা কি সে নিয়ে নানা তর্ক হতে পারে। হয়ত এঁরা উভয়েই কাছাকাছি কোনো তর্কেই ঘোরাফেরা করছেন, হয়ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের একেবারেই ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে -

"রসনিষ্পত্তির ব্যাপারে সাধারণীকরণের প্রতিষ্ঠা ভট্টনায়কের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র নন্দনতত্ত্বে ভারতীয় মনীষার এটি একটি মৌলিক দান এবং ভট্টনায়ক আবিষ্কর্তা না হলেও নির্বিবাদ প্রতিষ্ঠার গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। অভিনব গুপ্ত ভট্টনায়কের সাধারণীকরণের তত্ত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন; রসের আস্বাদ যে পরম-ব্রহ্মাস্বাদের মতো তাও স্বীকার করেছেন..."[২৩]

অবন্তী-কুমার আরও লিখছেন[24] এই অংশের আলোচনার সার হিসেবে, অবন্তী-কুমার মূলত ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্তের মধ্যবর্তী তফাতের জায়গাটা দিয়েই ভট্টনায়ককে পড়ার কথা লিখেছেন এবং সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয় –

"ভট্টনায়কই সম্ভবত প্রথম আলংকারিক যিনি কেবল রসকে দর্শকের অন্তর্ব্যাপার গণ্য করে তাকে subjective দিক থেকেই বিচার করেননি, নান্দনিক উপলব্ধিকে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির সঙ্গেও যুক্ত করেছেন এবং বিশেষ দর্শনের আলোকে তার ব্যাখ্যা করেছেন। পরবর্তীকালে প্রধান প্রধান আলংকারিকও তাই করেছেন। ভট্টনায়ককে সাংখ্য-দর্শনের অনুযায়ী বলা হয়েছে। তার 'ভোগ' পরিভাষাটি সাংখ্যসিদ্ধান্তেরই। অভিনব গুপ্ত তাঁর রসতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন শৈব প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন অনুসারে, পরবর্তীকালে মম্মট, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ বেদান্ত অনুসারে।"[২৫]

কিন্তু আসল কথা হল, অভিনবগুপ্তের রসব্যাখ্যার মৌলিক উপাদানটি ভট্টনায়কের ধারণাগুলির উপর নির্ভরশীল যেটা নিয়ে আগেও আলোচনা করলাম। অভিনব গুপ্ত তাঁর 'অভিনবভারতী' গ্রন্থেই মূলত এছাড়াও আরও কিছু জায়গায় নিজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে তুলে ধরেছেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন[২৬]। তিনি ভট্টনায়কের পূর্ববর্তী মতগুলিকে সম্মান করেছেন এবং এমন ভাবে পুনর্লিখন করেছেন যেন সেগুলি আসলে একই কথার রকমফের এবং অন্যদিকে নিজের মতকে আসলে ভরত মুনির মতের পুনর্লিখন বলে দাবি করেছেন –

---

[২৩] অবন্তীকুমার সান্যাল, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ-৬১

[২৪] "ভট্টনায়কের ভাবনা ও ভোগীকরণ নামে দুটি পৃথক ব্যাপারও মেনে নেননি, তাদের বিভাগকে তার অবান্তর মনে হয়েছে। তাঁর মতে, ভট্টনায়কের তত্ত্ব মানলে ভট্টলোল্লটের মতো রসের উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে।"

- অবন্তীকুমার সান্যাল, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ-৫২

[২৫] অবন্তীকুমার সান্যাল, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ-৫৩

[২৬] অবন্তীকুমার সান্যাল, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ-৫৯

"অভিনব গুপ্ত বলেছেন, তিনি যে সংশোধিত রসতত্ত্বের (পরিশুদ্ধতত্ত্বম্) কথা বলতে চলেছেন, তা ভরতমুনিই বলে গেছেন। তাতে নতুন কিছু যোগ করার নেই। কেননা ভরতই বলেছেন, কাব্যের অর্থ বা প্রাণবস্তুকে ভাবনাগম্য করে বলেই চিত্তবৃত্তিগুলোকে ভাব বলে (কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ)। কাব্যের এই অর্থ বা প্রাণবস্তুই রস।"[২৭]

অভিব্যক্তিবাদের গভীরে আছে আসলে শৈব ধর্মতত্ত্ব কারণ অভিনব গুপ্ত শৈব ছিলেন। কিন্তু ভট্টনায়কের বিশ্লেষণকে আমরা বস্তুবাদের নিরিখে অনায়াসেই পাঠ করতে পারি – হয়ত তার জন্য আমাদের শৈবধর্মের প্রয়োজনীয়তা নেই আলাদা করে। পরবর্তীকালে যখন আমরা আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ে যাব তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং আবু সৈয়দ আইয়ুবের বক্তব্য নিয়ে কথা বলব – দেখব উনি কীভাবে মার্ক্সবাদী সাহিত্য চিন্তার সঙ্গে একধরণের রসবাদী তত্ত্বের দ্বন্দ্বকে পাঠ করছেন এবং ঐ তর্কের ক্ষেত্রে আইয়ুবের প্রধান ঢাল হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-চিন্তায় রসবাদ নিয়ে বারং বার ফিরে ফিরে এসেছেন। এটা ঠিক যে ওনার লেখায় দৈবের ধারণা নানা রকম ভাবে এসেছে। কখনও জীবনদেবতা, কখনো বড় আমি ছোট আমির ধারণা, কখনো উপনিষদ, কখনো বা নির্দিষ্ট অর্থে হিন্দুধর্ম। অবন্তী-কুমার লিখেছেন, আগেও উল্লেখ করেছি যে, অভিনব গুপ্ত থেকে যে শৈববাদী দর্শনের ধারা রসবাদের ব্যাখ্যায় নামে তার অনুসরণে পরবর্তীকালে অনেকেই (যেমন, মম্মটভট্ট উপনিষদ চিন্তাকে কেন্দ্র করে) এসেছেন। এছাড়াও রাজশেখরের, সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের, জগন্নাথের – কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক নিজস্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছিল। অতুল গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' নামক শীর্ণকায় গ্রন্থটিতে প্রধানত ধ্বনীবাদ ও রসবাদের প্রেক্ষিত থেকে সমগ্র আলোচনাটিকে সাজিয়েছেন, যেহেতু ওনার মতে এই ধারায় আলোচনা করার মধ্যে দিয়ে, আধুনিক তার্কিক পরিসরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা সহজতর হয়ে ওঠে। আমরাও অল্প-বিস্তর সেসব পরিচিত তত্ত্বগুলির মধ্যে দিয়েই আমাদের কাব্যতত্ত্বগত আলোচনাটিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছি, কারণ আপাতত আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তার মধ্যে, সত্য, সম্বন্ধ ও প্রকাশের তর্ককে রসবাদী আলোচনার সঙ্গে এক পঙক্তিতে পাঠ করা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে আমরা ওনার চিন্তার বিশেষত্বে আরও বেশি করে প্রবেশ করব, আপাতত এই সাযুজ্যটুকুই প্রতিপাদ্য এবং আরও নির্দিষ্ট করে বললে, 'ছিন্ন-পত্রাবলী'র পূর্বোক্ত বাক্যাংশটির মধ্যে যে সম্বন্ধের প্রসঙ্গ আছে তার অসচেতন সূত্রটি সম্ভবত রসতত্ত্বের সম্বন্ধের ধারণার মধ্যেই নিহিত। রসবাদ সংক্রান্ত আমাদের এই আলোচনা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঔপনিষদিক ব্যাখ্যার সঙ্গে রসবাদী ব্যাখ্যার মিলমিশ হয়ে গড়ে ওঠা একপ্রকারের সাহিত্য চিন্তার সম্ভাবনা সবসময়েই প্রস্তুত করে গেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা যখন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তা নিয়ে আরও গভীরে আলোচনা করব কিন্তু আপাতত রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত পত্রাংশটির মধ্যে আমাদের রসতত্ত্ব খুঁজে নিতে কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়, সেকথা আবার স্মরণ করে নেওয়া যাক। প্রতিফলনের ধারণাটিকেও রসবাদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রতিফলনের যে কথা রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, সেটা কি –

---

[২৭] অবন্তীকুমার সান্যাল, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব* , সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ-৫৯

‘Reflection’ অর্থে নাকি ‘Resonances’ অর্থে ? রবীন্দ্র সাহিত্য-চিন্তায় এই বিষয়টি কোন একভাবে আসেনি, বিভিন্ন লেখায় বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে বলেই আমাদের ধারণা।

তাহলে আবার পুরোনো আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক যে - প্রাথমিক ভাবে চিঠি এবং সাহিত্যের তফাত-রেখা অঙ্কিত হচ্ছে এখানে। চিঠিকে সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপগুলির থেকে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আর জনপরিসরের বৈপরীত্যেই আলাদা করা হচ্ছেনা বরং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ইন্দিরাদেবীকে লিখিত পত্রগুলিতেই যেন তিনি অধিক সত্যের প্রকাশে সক্ষম। অন্যান্য সংরূপগুলিতে পাঠকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক অমোচনীয় দূরত্ব কাজ করে – কারণ পাঠক যেন তাঁকে বিশ্বাস করে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে মেলে ধরতে পারেনা। সাহিত্যের যে অংশগুলো পাঠক বুঝতে পারেননা সেগুলোর জন্য নিজেকে উন্মুক্ত করেননা, নিজেকে নিয়োজিত করেননা। সহৃদয় পাঠকের প্রতিশ্রুতি যেন ইন্দীরাদেবীর কাছে পাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। তাহলে চিঠির মধ্যে সাহিত্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (পত্রসাহিত্য নিজেই একটি সংরূপ কিন্তু আমি এখানে সেই তর্কে যাচ্ছিনা এবং সাহিত্য সংরূপ ধরে কিছু একটা লিখলে সেটা যে সাহিত্য হবেই এরকমও কোনো সমীকরণ নেই)। তাঁর উদ্ধৃতিটিতে রবীন্দ্রনাথ আরও একটি উপলব্ধি ব্যক্ত করছেন – যা আমাদের গভীরতম, উচ্চতম তা আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছায় দান-বিক্রয় করতে পারিনা। আরও একধাপ এগিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ চিঠিতে লিখেছিলেন যে আমাদের সত্যিকারের প্রকাশ যেন দৈবিক কিছু। এই দৈবিকের ধারণার সূত্র ধরে অনেকেই বেদ-উপনিষদ বা প্রাচীন দর্শনের প্রসঙ্গে যেতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ কি সাহিত্যকে, পার্থিব বা মানবিকের চেয়ে অনেক বেশি দৈবিক হিসেবে ভাবতে চেয়েছেন ইত্যাদি প্রশ্ন সহজেই উঠে আসতে পারে – কিন্তু আমার মতে এখন রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-চেতনার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, শিল্প বা সাহিত্যে আয়ত্তের বাইরের সে অংশটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করতে চাইছেন, সেই প্রসঙ্গটিতে যেন এক অজানার পরিসর খুলে রাখছেন তিনি। দান-বিক্রয় শব্দটিকে অনেকরকম ভাবেই বিশ্লেষণ করা যায়। এই ধারণা গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়ে উঠে আসবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, দুটি – প্রথমত, প্রকাশ করা এবং একই সঙ্গে পাঠকের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাওয়া বা অন্যদিক থেকে দেখলে পাঠকের সংযুক্ত হতে চাওয়ার প্রচেষ্টাকেই স্বাভাবিক ধরে নেওয়া আর দ্বিতীয়ত, পাঠককে এই প্রকাশটুকু দেওয়া বা তাকে সংযুক্ত করতে চাওয়া। লেখালিখির এই নির্দিষ্ট অংশটুকুই রবীন্দ্রনাথের মতে লেখকের ইচ্ছাধীন নয় বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে এই সম্বন্ধের পরিসর, সত্যের প্রকাশের সমীকরণমালা যেন পরিচ্ছন্ন ও পরিমেয় নয়। অবশ্যই এটি টুকরো চিঠির একটি ছিন্ন অংশ, সেহেতু ঠিক কি মর্মে রবীন্দ্রনাথ এখানে এই তত্ত্বগুলিকে ব্যবহার করছেন – সেকথা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। কিন্তু সাহিত্য (যে শব্দের মূলে আছে সহিতত্বের দ্যোতনা) যে প্রকাশ এবং সংযোগ এই দুটি খুঁটির উপরেই দাঁড়িয়ে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং যেহেতু এই দুটি অংশই সাহিত্যের মূল – ফলত প্রকাশের ঘাটতি এবং সংযোগের অভাব দুয়েরই সম্ভাবনা থেকে যায় । একভাবে সংজ্ঞায়িত করলে বলা চলে এই প্রকাশ ও সংযোগই সাহিত্যের সংজ্ঞার প্রধান দুটি শর্ত। এই দুই শর্তের পূরণ যথাযথ হচ্ছে কিনা সেটাই আসল কথা। অন্যদিক থেকে দেখলে যে সকল লেখার ক্ষেত্রে এই দুটি শর্ত অপূর্ণ থেকে যায় সেসব লেখা সাহিত্য নয়।

সাহিত্য সমালোচনার দীর্ঘ ইতিহাস কে লক্ষ্য করলে দেখা যায় নানা রকমের রেজিস্টারে এই সাহিত্য হওয়া এবং না হওয়াকে বুঝতে চাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও লেখকের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলেছে – এই নিয়ে। এটা ইউরোপ বা অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যের পরিসরেও হয়ে এসেছে। এই ইতিহাসটা সর্বদাই 'সাহিত্য কি?' –প্রশ্নটাকে জাগিয়ে রাখে, স্বাভাবিক ভাবেই। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের যে দিকগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তাতে করে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বাকি রয়ে যায় যে, উনি যখন চিঠি এবং সাহিত্যের তফাত করছিলেন তখন পত্র-সাহিত্যও একটি সাহিত্য – এরকম কোনো ধারণার কথা মাথায় রেখে করেননি। বরং চিঠিকে সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিকতা থেকে বা প্রথাবদ্ধতা থেকে বাইরে বেড়িয়ে আসার এবং আরও বেশি করে সত্যকার প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা হিসেবে দেখেছেন। তাহলে যেকোনো লেখারই কি সাহিত্য হয়ে ওঠার বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে? এই প্রশ্ন থেকেই আমরা পরবর্তী আলোচনায় প্রবেশ করব। লেখা কি? লেখার যে কাজ, সেই কাজের ধারণা কি কি উপাদান নিয়ে গঠিত হয় কিংবা তাকে কী কী ভাবে ধারণার অধীন করা সম্ভব এই প্রশ্নটা এখানে প্রধান হয়ে উঠছে। প্রধান হয়ে উঠছে - কারণ সেই সূত্রেই আমরা, 'সাহিত্য কি?' - সেই প্রশ্নটাকে পুনরায় লেখার রেজিস্টারে ফিরে দেখার অবকাশ পাব। লেখার কাজটিকে আমাদের বুঝতে হচ্ছে, ফলত লেখার কাজের সূত্রে সাধারণ ভাবে - কাজ কি? সেটাও যেন একভাবে বুঝে নেওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে এবং যেহেতু আমরা দেখছিলাম যে, 'সাহিত্য কি?' এই প্রশ্নের মূলে আছে দুটি মৌলিক ধারণা, এক -প্রকাশ এবং দ্বিতীয়টি হয়ত আরও বেশি অজানা একটা কিছু – সেটা হল – সংযোগ। আলোচনার সূত্রে, পরবর্তীকালে আমরা এই দুটি ধারণার গভীরে প্রবেশ করব।

আপাতত লেখা-র প্রসঙ্গটিকে ধরে আমরা প্রবেশ করব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লেখকের কথা' গ্রন্থের আলোচনায়। ১৯৫৭ সালে, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে 'লেখকের কথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মানিক - প্রেস মালিকদের বিষয়ে, বাংলা উপন্যাসের ধারা বিষয়ে, সাহিত্য সমালোচনা ইত্যাদি নানান বিষয়ে কথা বললেও প্রধানত নিজের কথা – নিজের প্রথম গল্প লেখার কথা, বাংলা সাহিত্যের দরবারে আকস্মিক গল্প লিখতে আসার কথা – ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আপাতভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছুটা ব্যক্তিগত এবং খানিকটা অন্যান্য আলোচনার আড়ালে, আসলে মানিক তাঁর লেখায়, লেখক এবং লেখার সম্পর্ক বিষয়েই কথা বলেছেন। এখানে তিনি লেখার প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলেছেন এবং লেখক কেন লিখবেন সেটা নিয়ে বলেছেন। সমস্ত লেখার আড়ালে বা উপরিতলে আসলে লেখক হিসেবে নিজের সমস্যা, ধন্দ এবং অভিযোগগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছিলেন। এই গ্রন্থের 'কেন লিখি' নামক লেখায় তিনি লিখেছেন –

"চিন্তার আশ্রয় মানসিক অভিজ্ঞতা। ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশি। প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে...মানসিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও উৎসাহ অথবা নেশা এবং প্রক্রিয়াটির চাপ ও

তীব্রতা সহ্য করবার শক্তি অনেকগুলি বিশ্লেষণ-যোগ্য বোধগম্য কারণে সৃষ্টি হয়, বাড়ে বা কমে। আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।"[২৮]

অর্থাৎ সেই 'প্রকাশে'-রই যুক্তি যেন। 'কেন লিখি'-র শুরুতেই মানিক বলবেন –

"লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে-সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি। অন্য লেখকেরা যাই বলুন, আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, তাঁরা কেন লেখেন সে-প্রশ্নের জবাবও এই।"[২৯]

অর্থাৎ প্রকাশের বিশেষত্ব। সেই বিশেষত্ব যেন আবশ্যিক কোনো একটা শর্ত। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি অন্যভাবে উপস্থাপন করেছিলেন, তিনি লিখেছিলেন - একমাত্র ইন্দিরাদেবীকে 'লেখা' চিঠিতেই যেন তাঁর প্রকাশ শ্রেষ্ঠ রূপে সম্ভবপর হয়। মানিক উক্ত লেখাটিতেই আরও লিখছেন –

"লেখার ঝোঁকও অন্য দশটা ঝোঁকের মতোই। অঙ্ক শেখা, যন্ত্র বানানো, শেষ মানে খোঁজা, খেলতে শেখা, গান গাওয়া, টাকা করা ইত্যাদির দলেই লিখতে চাওয়া। লিখতে পারা ঐ লিখতে চাওয়ার উগ্রতা আর লিখতে শেখার একাগ্রতার ওপর নির্ভর করে। বক্তব্যের সঞ্চয় থাকা যে দরকার সেটা অবশ্যই বলাই বাহুল্য – দাতব্য উপলব্ধির চাপ ছাড়া লিখতে চাওয়ার উগ্রতা কিসে আনবে!"[৩০]

'লেখকের প্রতিভা' কথাটায় মানিকের খানিকটা আপত্তি ছিল। সেটা মানিক অন্য জায়গাতেও লিখেছেন আমরা সবিস্তারে আলোচনা করব। কেউ কেউ লেখার প্রতিভা নিয়েই জন্মান, সেই লেখকেরা ঈশ্বর-তুল্য এরকম ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিশ্লেষণে মানিকের হয়ত খানিকটা আপত্তি ছিল। ব্যক্তিকেন্দ্রিক হিসেবে বুঝছি তার কারণ – কোন সাহিত্য উৎকৃষ্ট মানের হলে, তার গুন প্রকারান্তরের ব্যক্তি লেখকের অলৌকিক ক্ষমতার উপরে নির্ভরশীল – এই ধরনের তত্ত্বের মধ্যে দিয়েই আসলে সাহিত্যের অলৌকিক দৈবিক গুণাবলীর বিচার করা হয়ে থাকে। মানিক প্রাথমিকভাবে একজন বিজ্ঞানমনস্ক ও তাঁর সমসময়ের প্রেক্ষিতে বস্তুবাদী হওয়ার নিরিখে কখনই এই ধরনের বক্তব্যকে সমর্থন করেননি। বরং তিনি লিখেছেন –

"জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সঙ্গে

[২৮] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-১১

[২৯] তদেব

[৩০] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-১১

আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।”[৩১]

অর্থাৎ এক্ষেত্রে মানিক লেখকের মধ্যে প্রকাশের বা অন্যভাবে বিচার করলে, এক প্রকারের দানের আকাঙ্ক্ষার কথা বলছেন। দান যা ঠিক দেওয়া নয়, কারণ তাতেও আবার ব্যক্তি লেখকের মহিমাকেই বড় করে দেখা হয় – বরং পাঠককে যেন লেখকের অভিজ্ঞতাটা পাইয়ে দেওয়া। অর্থাৎ ঐশ্বরিক দান সমৃদ্ধ কোনো ব্যক্তি লেখকের প্রতিভার কথা অস্বীকার করে, অন্য ধরণের দানের কথা বলছেন সম্ভবত মানিক। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যে প্রকারান্তরে বলতে চেয়েছেন, যেন দৈবিক বরদান ভিন্ন যেন লেখকের লেখা আদতে সম্ভবপর নয়। দৈবিক বরদান কথাটা হয়ত কৌতুকের মত শোনাতে পারে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর উক্তিতে 'দৈবক্রমে'র উপর এতটাই জোর দেন যে, সেটা অস্বীকারের কোন জায়গা নেই। পরবর্তীকালে আমরা দেখব যে – এ-দুয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সেটা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আছে, মানিকের ক্ষেত্রেও আছে। মানিক যেমন একদিক থেকে বলবেন যে, লেখকের লেখার ক্ষেত্রে ঐশ্বরীকতার কোন হাত নেই, তেমনি বলবেন যে লেখক, পাঠককে লেখার অভিজ্ঞতাটুকু পাইয়ে দেওয়ার জন্য উদগ্র হয়ে থাকে - অর্থাৎ লেখকের দিকেই, তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের দিকেই যেন মানিকের আলোচনার পাল্লা বেঁকে আছে। মানিক লেখক-কে নিয়েই লিখছেন, সুতরাং ওনার ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক খানিকটা তবু আমরা যে সূক্ষ্ম বিভাজন বিষয়ে এখানে কথা বলতে চাই তার সঙ্গে মানিকের লেখক-কেন্দ্রিকতার সম্বন্ধ আছে। লেখকের চেতনা বিষয়ক ধারণা, পাঠকের সঙ্গে অজানা সংযোগে যুক্ত হতে চাওয়ার তর্কের সম্বন্ধ আছে। তাহলে যে কথার পৃষ্ঠে এতখানি কথা আলোচিত হল সেই কথাটুকুকে যদি আবার গুছিয়ে নিয়ে লেখা যায় তাহলে কতকটা এরকম দাঁড়ায় যে - দান-বিক্রয় আর সংযোগ অর্থে দানের মধ্যে একটা তফাৎ অবশ্যই আছে। সেই তফাৎটাকে দুজনে দুভাবে পড়ছেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - মানিক আসলে লেখার রেজিস্টার ধরে সরাসরি এই দানের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলছেন। লিখছেন –

“আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারি যা কোনোদিন পেতো না। কিন্তু এই কারণে লেখকের অভিমান হওয়া আমার কাছে হাস্যকর ঠেকে। পাওয়ার জন্য অন্যে যত না ব্যাকুল, পাইয়ে দিতে পারলে পাঠকের চেয়ে লেখকের সার্থকতাই বেশি। লেখক নিছক কলম-পেষা মজুর। কলম-পেষা যদি তার কাজে না লাগে তবে রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক।

কলম-পেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতায় দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ করি বলে আফসোস জাগে যে খাঁটি লেখক কবে হবো!”[৩২]

---

[৩১] তদেব

[৩২] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-১২

অর্থাৎ লেখকের যে ঐশ্বরিক ক্ষমতার দাবি, সেটার সমালোচনা করে মানিক বলতে চাইছেন, খাঁটি লেখক সেই - যে লেখক হিসেবে ঐশ্বরিক বরদানের কোন গর্ব বা অহংকার রাখেন না। যেমন মজুর কোনো উৎপাদিত পণ্যের স্রষ্টা হিসেবে নিজের অহংকার করেনা। অর্থাৎ যেন লেখকের তাঁর লেখার উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই – এরকম একটা তত্ত্বায়নের কাছাকাছি মানিক যেতে চাইছেন।

মানিক এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিকে একত্রে বিচার করলে বোঝা যায়, কথাটা যেন প্রকারান্তরে খুবই কাছাকাছি একটি কথা। উভয়ত লেখক, পাঠকের এই সহিতত্বের মধ্যে দিয়ে দেখাটা প্রয়োজনীয়। সাহিত্যকে তার প্রচলিত ধারণা অর্থাৎ প্রতিভাবান লেখকের, উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও সমঝদার পাঠকের যথাযথ বিশ্লেষণ এই কাঠামো থেকে খানিকটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টাই আমরা রবীন্দ্রনাথ ও মানিকের আলোচনার মধ্যে খেয়াল করি। তার বদলে বলতে চাওয়া হচ্ছে, সত্যিকারের প্রকাশের কথা এবং সেই প্রকাশের সূত্রে সম্বন্ধের কথা। সেটার জন্য প্রচলিত সাহিত্যের সীমাবদ্ধতাকে যেন প্রশ্ন করতেই হয়। এই সত্য প্রসারিত হয় যে, সাহিত্য কাকে বলব সেটা সংরূপ বা প্রথার উপর এমনকি সম্ভবত ভাষার উপরেও সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয় বরং ‘লেখার কাজের’ উপর নির্ভরশীল। যেটা কখনো কখনো সাহিত্য হয়েও সাহিত্যে উত্তীর্ণ হতে পারছেনা, তার নিজস্ব শর্তপূরণের অভাবে। অন্যদিক থেকে দেখলে, সাধারণ একটা লেখার মধ্যেও যেন সাহিত্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে – সেই শর্তের ভিত্তিতে। ফলত কেরানীর লেখা এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের লেখার মধ্যে পরিচিত কাঠামোর ভিত্তিতে পার্থক্য করা উচিত নয়, এই কথাটা যেমন সত্য তেমনি আবার ঠিক সাহিত্যের পরিসরে না হলেও নিজের প্রকাশ করতে চাওয়ার লেখার মধ্যে নিজেকে মেলে ধরার, অপরের প্রতি বা পাঠকের প্রতি উন্মুক্ত করার, অপরের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হয়ে ওঠার যে ব্রত আছে – তা যেন খাঁটি লেখক হয়ে ওঠার প্রধানতম শর্ত। পূর্ববর্তী পঙক্তিতে খাঁটি লেখক বা খাঁটি সাহিত্যের সঙ্গে অ-সাহিত্যিক লেখার তফাৎটা খুব সূক্ষ্ম কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তফাত, গবেষণার পরবর্তী অংশেও আমাদের এই তফাৎটুকু আমাদের বার বার ফিরে ফিরে আবিষ্কার করতে হবে।

আপাতত ‘লেখা’-র আলোচনার সূত্রে আমরা মানিকের প্রথম তর্কটিতে ফিরব। যেখানে উনি বলবেন যে অভিজ্ঞতা থেকেই লেখা আসে[৩৩]। অর্থাৎ লেখকের অভিজ্ঞতা থাকাটা বাঞ্ছনীয়। তিনি বলবেন তাঁর নিজের অনেক বেশী জীবন দেখার অভিজ্ঞতা ছিল। সেখান থেকেই ‘গল্প লেখার গল্প’ প্রবন্ধে মানিক কীভাবে তার প্রথম গল্পটি লেখেন সেটা নিয়ে লিখেছেন। বলেছেন, জীবনকে দেখা ও জানার একটা ইচ্ছা থেকেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় শুরু হয়, তিনি বৈজ্ঞানিকের মন নিয়েই ছেলেবেলায় জীবনকে দেখতেন ইত্যাদি। কতকটা খেলার ছলে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে মানিক তার প্রথম গল্প ‘অতসীমামী’ লেখেন (যদিও এটি বিতর্কিত একটি তথ্য)[৩৪]। যখন লেখেন, তখন তাঁর

[৩৩] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-১১

[৩৪] মালিনী ভট্টাচার্যের – *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : একটি জীবনী* - নামক গ্রন্থটি থেকে আমরা – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার প্রতি দায়বদ্ধতা, কলম পেষা মজুর বিষয়ক নানাবিধ চিন্তা ধারা সহ আরও নানা কিছু জানতে পারি । ‘অতসী মামী’ - গল্পটি যে ওর প্রথম গল্প

জীবন বিষয়ক অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল এবং জানার কৌতূহল ছিল – যার কথা উনি অন্যত্র লিখেছেন। তিনি লিখছেন –

"প্রস্তুতির কাজটা অবশ্য লেখক সচেতনভাবে নাও করতে পারেন। কিভাবে যে প্রক্রিয়াটা ঘটেছে এ সম্পর্কে তার কোনও ধারণা পর্যন্ত না থাকতে পারে। জীবন যাপনের সমগ্র প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকায় লেখক হবার আগে এই প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার বিশেষ তাৎপর্য ধরতে না পারাই স্বাভাবিক।"[৩৫]

এই গ্রন্থেই তিনি লিখছেন যে অন্তত একটা বয়সের আগে সাহিত্য লেখা উচিত না এবং লেখার অভ্যাস ও জীবনকে জানার অভ্যাস যেন একই প্রকারের কিছু, এই ধরনের চর্চা করা লেখকের কর্তব্য। প্রতিভা বা ঐশ্বরিক বরদান বা সেরকম কোনো অতিলৌকিক প্রভাবের বদলে উনি ধাত কথাটিকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। ধাত থেকেই লেখক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি হয় এবং এই প্রতিভা গোছের উদ্বৃত্ত যদি কিছু থেকেও থাকে সেটা থেকে বৈজ্ঞানিক বা লেখক যেকোনোটাই হতে পারে মানুষ। সম্পূর্ণ 'লেখকের কথা' গ্রন্থটিই যেন ব্যক্তি লেখকের ঐশ্বরিক অতিলৌকিক মহিমার বিরুদ্ধে একটা যৌক্তিক বিশ্লেষণের প্রয়াস। এই তত্ত্বের বিপরীতেই তথাকথিত রোম্যান্টিক, ভাববাদী রবীন্দ্রনাথের লেখায় নানা সময় ব্যক্তি লেখকের মহিমার উদ্‌যাপন হয়েছে সন্দেহ নেই। বিশেষত উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনার একটা বড় অংশ ব্যক্তি কবির গৌরবগাঁথায় পরিপূর্ণ। এটা কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে নয়, প্রায় সমগ্র বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ধারাতেই, সেই সময় কালে – এই তত্ত্বের প্রভাব ছিল। কিন্তু ক্রমে বিশ-শতকের গোঁড়ার দিক থেকে আস্তে আস্তে ইউরোপীয় বস্তুবাদী চিন্তার, বাস্তববাদী সাহিত্য-চিন্তার আলোচনা বাড়তে বাড়তে মানিক যখন 'লেখকের কথা' লিখছেন তখন বিষয়টা প্রায় একটা চোখা বৈজ্ঞানিক ও আরও নির্দিষ্ট করে বললে সমাজ-বাস্তবতার প্রেক্ষিত থেকে, তথাকথিত প্রগতি সাহিত্যের প্রেক্ষিত থেকে দেখার প্রয়াস শুরু হচ্ছে সমাজে। প্রগতি সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই 'কেন লিখি' সংস্করণে, সেই সময়কার আরও বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে মানিকের এই 'কেন লিখি'- লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে – এই লেখা, 'লেখকের কথা' গ্রন্থে সংকলিত হয়। মূলত মানিকের মাথায় প্রগতি সাহিত্যের প্রধান তর্কটা ছিল বলেই আমাদের ধারণা। ওটা থেকেই মানিক বার বার লেখার কাজকে কেবল শুকনো একটা যুক্তির নিগড়ে এনে তার সারমর্মটুকু ছেঁকে নিতে চাইছিলেন, যাতে করে সাহিত্যের প্রগতির পথটা আরও বাস্তবিক ভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর হয়। প্রগতি সাহিত্য বিষয়ে মানিকের নিজের কিছু মত ছিল এবং ওর সমসাময়িক অনেকের সঙ্গেই তর্কও ছিল, সেটা যদিও অন্য প্রসঙ্গ।

নয়, পরবর্তীকালে স্মৃতি রোমন্থণ করতে হয়ত খানিকটা ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে - সেই বিষয়ে মালিনী আমাদের স্বচ্ছ ভাবে অবগত করেছেন।

- মালিনী ভট্টাচার্য, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : একটি জীবনী*, আর বি এন্টারপ্রাইসেস, কোলকাতা, ২০২১

[৩৫] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-১৩

লেখকের কথা

'লেখকের কথা' গ্রন্থের 'নতুন জীবন' প্রবন্ধে মানিক লেখকের শ্রম বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। আমাদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে যে, আমরা খানিকক্ষণ আগে লেখক, সাহিত্য ও পাঠকের প্রথাগত, পুরাতন ধ্যানধারণার পরিবর্তে একটা নতুন তত্ত্বায়ণের কথা বলছিলাম – 'ছিন্নপত্র' ও 'লেখকের কথা' –র আলোচনার সূত্রে। এর পরবর্তী আলোচনা সেই দিকেই আমাদের নিয়ে যাবে এবং সেইসূত্রেই আমাদের গবেষণার প্রশ্নটিও পরিস্ফুট হবে। মানিক লিখছেন,

"ঘরে শিল্প-সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুঁজি ঘাটা আর ঘরে বাইরে সর্বত্র সব সময় মানুষকে আর জীবনকে তন্ন তন্ন করে দেখা ও জানা এবং মনের মধ্যে তাই নিয়ে তোলপাড় করা, যোগ বিয়োগ করা, মিলিয়ে দেখা আর অমিল খোঁজা ও সব কিছুর মানে বোঝার চেষ্টা – লেখকের বিরামহীন এই শ্রম মাপাই বা হবে কিসে, দামই বা কষা হবে কোন নিরিখে?"[৩৬]

অর্থাৎ এখানে সমস্যা স্পষ্ট যেন - একজন কেরানি কতক্ষণ তার কায়িক শ্রম দিয়ে কলম পিষছে সেটা আমরা মাপতে পারছি কিন্তু একজন লেখকের এই সমাজ কে, জগৎ জীবনকে দেখা, ভাবা, তাকে মাপা – এই সবটার পরিমাপ হচ্ছেনা। পরিমাপ করা যেন একপ্রকার অসম্ভব প্রায়। সেটা পরিমাপ করার কোনো নিরিখ যেন আবিষ্কৃত হয়নি। এই চিন্তার যে যাত্রায় লেখক নামেন তার যথাযথ পরিমাপ করাটা মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আবার খেয়াল করলে দেখা যাবে এই চিন্তার ভিত্তি অভিজ্ঞতা সুতরাং, লেখকের শ্রমটা ঠিকমতো না মাপা গেলে, তার অভিজ্ঞতা মাপা গেছে কথাটা বলা চলেনা। সেক্ষেত্রে কোনো একটা লেখা থেকে লেখকের অভিজ্ঞতাকে যথাযথরূপে বের করে আনা অসম্ভব প্রায়। অভিজ্ঞতা আর লেখার তুল্যমূল্য বিচারে দেখা যাচ্ছে যে - কিছু একটা উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে। মানিক বলবেন লেখকের এই অভিজ্ঞতাটুকু, জীবনকে দেখার শ্রমটাই উদ্বৃত্ত থাকছে। আমরা আরেকটু এগিয়ে বলতে পারি যে - ঠিক অভিজ্ঞতা ও লেখার তুল্য-মূল্য বিচার হচ্ছেনা। কি যেন একটা বাড়তি ধরা পড়ছে এখানে।

খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাজন মানিকের লেখায় আছে। মানিক যখন লিখবেন যে - কেরানীর সঙ্গে লেখকের পার্থক্য জীবনদর্শনে – অর্থাৎ আমাদের ভাষায় লেখক নিজের উপলব্ধিগুলিকে চিন্তা দিয়ে বিচার করেন, একটা আত্মপ্রতিফলণশীল কার্যের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেন আর কেরানি ক্রমে যেন নিছক একটা কেঠো যন্ত্রের মত চলতে থাকে। যার ফলে মানিকের মতে লেখকের কাছে একটা সুযোগ আছে পক্ষ নেবার। অর্থাৎ মানিকের লেখায় এই পক্ষটা বিচার করলে দেখা যাবে এটা মূলত শ্রেণী-পক্ষ। কারণ এটাই মানিকের প্রগতিবাদী সাহিত্যের প্রাথমিক

[৩৬] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-৩৭

শর্ত। এ নিয়ে যদিও নানা রকমের মতভেদ আছে যে, কোন কোন পন্থায় পক্ষ নেওয়া যেতে পারে ইত্যাদি। সেটা নিয়ে চিন্মোহন সেহানবিশের সঙ্গে মানিকের তর্কও ছিল খানিকটা। এই পক্ষপাতিত্বকেই মানিক অন্য ভাষায় জীবনদর্শন বলবেন।

'লেখকের সমস্যা' অধ্যায়টিতে 'জীবনদর্শন' শব্দটি এখানে উঠে এসেছে তাই এই শব্দটিকে ধরে মানিকের এই অংশের বক্তব্যকে আমাদের বুঝতে হবে। মার্ক্সবাদী চিন্তার গতিপথকে অনুসরণ করেই মানিকের বিশ্লেষণ প্রধানত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই অগ্রসর হয়। দুটি ধারণার সংঘর্ষ, তফাত, নির্মাণ, একের উপর অন্যের কর্তৃত্ব এই রাজনৈতিক চিন্তা-প্রণালী সর্বদাই মানিকের লেখার গায়ে গায়ে লেগে আছে। এই ধরনের চিন্তা ও ভঙ্গিমা নিয়েই মানিক শ্রম ও সাহিত্যের আলোচনায় অবতীর্ণ হন। আলোচনাটি শুরু হচ্ছে নীতি ও দুর্নীতি থেকে, সেটাতে আমরা খানিকক্ষণ পরে আসব। ক্রমে সেই আলোচনাটি লেখক ও শ্রমিকের বিভাজনে গিয়ে উপনীত হয় এই বিভাজনকে আমরা মানসিক শ্রম এবং কায়িক শ্রমের বিভাজনও বলতে পারি। এখানে মানিক প্রথমেই বলে নিচ্ছেন, মজুর এবং কেরানি উভয়ত একই প্রায়, অর্থাৎ খাঁটি লেখক বলতে উনি প্রধানত যথার্থ সাহিত্যিকদের কথাই ভাবছেন, কেরানি বা মজুরেরা যুক্তিগত দিক দিয়ে তার উল্টো-পীঠ -

"মজুর বেচেন কায়িক শ্রম। কেরানীও প্রায় তাই। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই মাথার কাজ বারবার করে যেতে যেতে সেটা আর মাথার কাজ থাকেনা, মজুরের কায়িক শ্রমে দেহ ক্ষয় করার ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়ায় মর্চে ধরে দেহ ক্ষয় করার কায়িক পরিশ্রমে দাঁড়িয়ে যায়।

কায়িকশ্রম আর মানসিক শ্রমের মধ্যে কৃত্রিম গুণগত ও মূলগত তারতম্য দু'রকম শ্রমের মজুরিদাতারাই সৃষ্টি করেছে।"[৩৭]

মানিক প্রথমে মানসিক এবং কায়িক শ্রমের বিভাজনকে ক্ষমতাবান শ্রেণীর নির্মাণ বলে চিহ্নিত করছেন। অর্থাৎ একদিকে মানসিক ও শারীরিকের নির্মিত ব্যবধানকে ভাঙছেন অন্যদিকে এই বিভাজনকে দিয়েই খাঁটি লেখকের সংজ্ঞাটিকে ধরেও রাখতে হচ্ছে ওকে। নিজেকে যখন কলম পেশা মজুর বলছেন তখন আসলে রূপকার্থে সেই কথা বলছেন। লেখকের দৈবিক মহিমাকে ত্যাগ করতে চাইছেন ঠিকই কিন্তু একইসঙ্গে লেখকের কাজের মধ্যে যে বিমূর্ততা, অপরিমেয়তা – তাকেও নির্দেশ করতে তিনি কখনো ভুলছেন না।

"মজুর কেরানীর মতো কোন মতে বাঁচার মতো মজুরি নিয়ে খেটে পেশাদার সাহিত্যিক হলে তার খাটুনিটা কেন মালিকশ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে প্রচার হতেই হবে?

---

[৩৭] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-৩৫

এই কারণে সাহিত্যিকের কেন পেশাদার হওয়া চলবে না? মজুর কেরানীর মতোই তো তিনি শুধু তার শ্রমটুকু বিক্রি করবেন, পক্ষপাতিত্ব নয়।”[৩৮]

তাহলে লেখকের পেশাদার হওয়াটা সমস্যা নয়, সমস্যা পক্ষপাতহীন হয়ে পড়া, জীবনদর্শনহীন নির্জীব হয়ে পড়া। একদিকে তিনি এই অর্থে ‘খাঁটি লেখক’-কে মজুররূপী কেরানীর থেকে আলাদা করছেন পক্ষপাতের ভিত্তিতে, অন্যদিকে তিনি কেরানি এবং লেখকের ভিতর এই একই শর্তে বিভেদরেখা টানছেন বলছেন পক্ষপাতহীন কেরানি আসলে যন্ত্র মাত্র। অর্থাৎ লেখকের পেশাদার হয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা অপরাধের দিকও আছে, কি সেটা?

“অপরাধ হবে এইজন্য যে, লেখক মজুর বা অল্প বেতনের কেরানি নন, শ্রমটাই তার একমাত্র পণ্য নয়। তাঁর পক্ষপাতিত্বের মূল্য এত বেশি যে, তাঁর শ্রমের মূল্য বিচার তুচ্ছ হয়ে যায়।

লেখকের পক্ষপাতিত্বের মূল্য কিন্তু তার শ্রম দিয়েই নির্ধারিত হয়। লেখকের শ্রম এমন এক ধরনের যে সেটা খাটুনির ঘণ্টার হিসাবে বা উৎপন্ন পণ্যের হিসাবে মাপা যায় না।

নিজস্ব একটা জীবন-দর্শন ছাড়া সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্য তাঁর শুধু বসে বসে লেখার বা প্রুফ সংশোধন করার শ্রম নয় – সব সময় সর্বত্র জীবনকে দর্শন করার বিরামহীন শ্রমও তাকে চালাতে হয়।”[৩৯]

ঠিক সেই প্রসঙ্গেই ফিরে এলাম আমরা যে, লেখকের এই নিরন্তর খাটুনিকে আমরা পরিমাপ করব কীসের নিরিখে? জীবনকে দর্শন করা আর ‘জীবন-দর্শন’ এই দুটি আপাত দূরবর্তী ধারণা বাস্তববাদী চিন্তা ধারার মোচড়ে অদ্ভুত ভাবে এক হয়ে যায় মানিকের লেখায়। কারণ প্রকারান্তরে এই তত্ত্বকে উনি জুড়ে দেন পক্ষ অবলম্বনের সঙ্গে। বহুল প্রচলিত একটি শব্দে যদি ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে বলা চলে, আসলে তিনি জুড়ে দেন মতাদর্শের সঙ্গে।

তাহলে ঠিক প্রতিভা বা অলৌকিক শক্তি – লেখক কে কেরানীর থেকে আলাদা করেনা বরং এই জীবনদর্শন বা জীবনবোধ এবং তার অনুপস্থিতি এই দুটি কাজকে আলাদা করে। এককথায় কোন একটা মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনার বই হাতে তুলে নিলে মনে হতে পারে যে – মার্ক্সবাদীরা তো এটাই সবসময় বলে এসেছেন – সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি আসলে মতাদর্শের-ই প্রকাশ। কিন্তু আমরা খেয়াল করলে বুঝতে পারব, এই অধ্যায়ের প্রথম থেকে তর্কটা শুরু করে যে পথ বেয়ে আমরা এতদূর অবধি এলাম – তাতে করে এটা ঠিক সেই পুরোনো মার্ক্সবাদী চিন্তার পুনর্লিখন নয় - এটা যেন একটা নতুন সম্পর্কের বা সম্বন্ধের ভিত্তিতে লেখার কাজকে ভাবার এক-ধরণের প্রয়াস। এর মধ্যে পরিমাপের সমস্যা, বোধের সক্রিয়তা, সত্তার প্রশ্ন এবং সম্পর্কের প্রশ্ন – এগুলোই

[৩৮] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-৩৫

[৩৯] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ- ৩৬

প্রধান, মতাদর্শের প্রশ্ন তুলনামূলক ভাবে গৌণ। আমাদের আলোচনায় মানিকের স্বাভাবিক মার্ক্সবাদী কথাগুলি যেন অনিশ্চিত তর্ক-ক্ষেত্রের মধ্যে নিয়ত অসম্ভব কিছু একটার দিকে ধাবিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের বিচার এবং মানিকের বিচারকে পাশাপাশি পড়লে লিখন বিষয়ে অনেকান্তিক আলোচনার পথ খুলে যায়। মানিক তাঁর ‘প্রতিভা’ নামক নিবন্ধটিতে লিখছেন –

‘প্রতিভা সম্পর্কে সাধারণ লোকের এবং স্বয়ং প্রতিভাবানদেরও – ধারণা আছে ওটা এক ঈশ্বরদত্ত রহস্যময় জিনিস। প্রতিভাকে এরকম রহস্যময় পদার্থ মনে করার ফলে লেখক-কবিদের এ জিনিসটার উপরে প্রায় একচেটিয়া অধিকার জন্মে গিয়েছে।’[৪০]

এই নিবন্ধেই তিনি কবিদের প্রতিভার রহস্যময়তা বিষয়ে সমালোচনা করে লিখেছেন যে,

‘যুগ যুগ ধরে মানুষের রহস্যময় অন্তর্লোকের সন্ধান জানিয়ে জানিয়ে, সাধারণ বুদ্ধিতে অগম্য অনাগত ভবিষ্যৎকে অনুভূতির সঙ্কেতে প্রকাশ করে করে, হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দ বেদনার হিল্লোল জাগিয়ে জাগিয়ে এবং নিজেকে সযত্নে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে ও মাঝে মাঝে শুধু অসাধারণ অলোকসামান্য কথাবার্তা চালচলন ব্যবহারের মধ্যে খানিক খানিক আত্মপ্রকাশ করে জনতার মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে যে মিথ্যা মোহ, ভ্রান্ত ধারণা বহুকাল ধরে লেখক কবিরা সৃষ্টি করে এসেছেন, আজ বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার যুগে সেই জালে আটক পড়ে তাঁদের বিপদের সীমা নেই।’[৪১]

বিজ্ঞান এসে প্রতিভার পসার কমিয়ে দিচ্ছে। প্রতিভার বাজার আর নেই এরকম কিছু একটা বলতে চাইছেন মানিক কারণ তাঁর লক্ষ্যই হল প্রতিভার ধারণার সমালোচনা করা, সে কথা আগেই লিখেছি। “আর্ট ফর আর্ট সেক” – ধারণাটির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই মানিকের একটা বিরোধের সম্ভাবনা ছিল কারণ এই মতবাদ অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীর বা লেখকের প্রতিভা, ব্যক্তিগত গুনকে প্রাধান্য দিয়েছিল। প্রতিভার বিরোধিতা করলেও মানিক আসলে ঐ তত্ত্বের মতাদর্শের অংশটির বিরোধিতা করেননি। অর্থাৎ শিল্পের জন্য শিল্প বললেও, শিল্প বিষয়ক একটি মতকে বোঝানো হয়। এর উল্টোটা মানিক বলছেন, যে শিল্প আসলে শিল্পীর জীবনদর্শন তথা পক্ষকে প্রকাশ করে। এই পক্ষ নির্বাচনে এক শিল্পীর থেকে অন্য শিল্পীর তফাত হতে পারে, কিন্তু কোন জীবন দর্শন ছাড়া কেবল টাকার জন্য শিল্প করাটা খাঁটি শিল্পের লক্ষণ নয়। ভীষণ অদ্ভুত ও অতিরিক্ত সূক্ষ্ম একজন বস্তুবাদী হিসেবে মানিকের এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে – বস্তুবাদ কতখানি বহুমাত্রিক – তাকে দু-এক কথায় সংকীর্ণ করে আনা সহজ কাজ নয়। এই বিষয়ে মানিকের বক্তব্য সরাসরি উদ্ধার করছি –

---

[৪০] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-৪৬

[৪১] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-৪৯

"শিল্প সাহিত্যকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করলে খাঁটি শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না – আমি এই মূলনীতির কথাই বলছি। স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক টাকার জন্য লিখলে লেখকের ক্ষমতা অনুসারে লেখার যে মান হওয়া উচিত লেখা তার চেয়ে নীচু স্তরের হয়ে যাবেই। সকল সাহিত্যিকের পক্ষে এই নীতি প্রযোজ্য।

এই নীতিটাকে 'আর্ট ফর আর্টস সেক' দুর্নীতিটার সঙ্গে অনেকে একাকার করে ফেলেন।"[৪২]

অর্থাৎ 'আর্ট ফর আর্টস সেক'-কে মানিক দুর্নীতি বলবেন সাদা বাংলায়। কিন্তু টাকা রোজগার করা শিল্পের কাজ নয়, সে বিষয়েও মানিক একমত।

কিছুটা পুরাতন বিশেষত অনাধুনিক চিন্তার সঙ্গে এই তত্ত্বায়নের যেন একটা আঙ্গিক-গত তফাত আছে। কিন্তু সে কথা আপাতত এখানে বিচার্য নয়। লেখকের অভিজ্ঞতা এবং লেখার মধ্যে যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কিছু একটা উদ্বৃত্ত থাকছে, যাকে ঠিক শ্রমের পরিমাপে ধরা যাচ্ছেনা। জীবনদর্শন কিংবা পক্ষের আলোচনা ধরে আমরা একটি দিকে অগ্রসর হয়েছিলাম। এবার আমরা ফিরব শ্রমের আলোচনায়। লেখকের শ্রম পরিমাপ করা যাচ্ছেনা। কিছু একটা উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আমাদের প্রাথমিক প্রতিপাদ্য হল - লিখনের প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন কিছু একটা ঘটছে যা উদ্বৃত্ত, যা পরিমাপের অতীত হয়ে ধরা দিচ্ছে। অর্থাৎ একইভাবে যেন রবীন্দ্রনাথের সেই অজানার ধারণাটিকে এখানে আবার ফিরিয়ে আনা যায় – কেমন করে যে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে লেখক, লেখক নিজে জানেনা। এ তার প্রতিভা এরকমটা ঠিক নয় আবার কি যে ঠিক বোঝাও যায়না যেন। রবীন্দ্রনাথ বলবেন দৈবক্রম। মানিকের ক্ষেত্রে যেন সেটা উদ্বৃত্ত। ঠিক এই যুক্তি-ক্রমেই অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'লিখনে কি ঘটে' গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ একটি তর্ক হিসেবে পাঠ করা যেতে পারে। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব।

লিখন ও শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব

যাইহোক পূর্বের সমগ্র আলোচনার সঙ্গে (বিশেষত লেখার শ্রমের প্রসঙ্গের সঙ্গে) বহু-চর্চিত মার্ক্সবাদী 'শ্রমের মূল্যের' তর্কের একধরণের তুলনামূলক আলোচনা সম্ভবপর বলে মনে হয়। এই আলোচনা আমাদের নতুন কোন তার্কিক পরিসরের দিকে নিয়ে যেতে পারে কিনা একই সঙ্গে সেটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে। উদ্বৃত্ত কথাটি শ্রমের মূল্যের তত্ত্ব প্রসঙ্গেও বার বার ফিরে আসে – Excess অর্থে না হলেও Surplus অর্থে। যদিও এই দুই উদ্বৃত্তের মধ্যে নানা বিধ ব্যবধান তর্ক-বিতর্ক আছে। এই দুটিকে এক করে দেখার আলাদা কোন তাৎপর্য নেই – মার্ক্সবাদী মূল্য তত্ত্ব ও দর্শণ, এমনকি মার্ক্সের নিজস্ব মূল্য বিষয়ক লেখাগুলিও কোথাও উক্ত বিষয় দুটিকে এক বলে দাগিয়ে দেয়নি। মার্ক্সের মূল্যতত্ত্ব আমাদের গবেষনার বিষয় নয় – মার্ক্সের মূল্যতত্ত্ব বিষয়ক বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ

[৪২] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-৩৩

গ্রন্থ আছে, যেমন "Karl Marx and the close of his System", "The Making of Marx's Capital", "The value controversy" – ইত্যাদি । মার্ক্সের মূল্যতত্ত্ব বিষয়ে - আমরা I.I.Rubin -এর "Essays on Marx's Theory of Value" -গ্রন্থটির উপরেই প্রধাণত নির্ভর করেছি (যদিও তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ও স্বাতী ঘোষের লেখা আলোচনার মধ্যে দিয়ে – মূল্য বিষয়ে আরও কিছুটা গভীরতর আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করব) । যদিও মার্ক্সের মূল্যতত্ত্ব সরাসরি আমাদের আলোচনার বিষয় নয় - তবু আমাদের পূর্বের যাবতীয় আলোচনার নিরিখে - সামগ্রিক ভাবে কাজের আলোচনার একটি যথাযথ রূপ পরিস্ফুট করার ক্ষেত্রে মার্ক্সের মূল্য-তত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করছি। আপাতত এখানে কার্ল মার্ক্সের শ্রমতত্ত্ব বা উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বটি সবিস্তারে আলোচনা করা যাক[৪৩]।

সাধারণ অর্থে একটি বস্তুর মূল্য এই কারণে নির্ধারিত হয় যে - ওটা নির্মাণের পিছনে কতটা শ্রম আছে। যে বস্তুতে যতটা শ্রম থাকে সেই হিসেবে সেটার মূল্য। অ্যাডাম স্মিথ তার অর্থনীতির তত্ত্বে প্রথম পণ্যের দুটি মূল্যের কথা বলেন – ব্যবহারিক মূল্য এবং বিনিময় মূল্য (গুণগত ও পরিমাণগত মূল্য)[৪৪]। কিন্তু স্মিথের তত্ত্বে অনেকগুলি খামতি ছিল। তারমধ্যে একটা প্রশ্ন হল, যদি একটি পণ্যের মধ্যে কেবল শ্রমই থাকে তাহলে ওটার পিছনে যে পুঁজি খরচ হয়েছে সেটা? পুঁজিপতি ওটা শ্রমিকের কাছ থেকে নিয়েছিল[৪৫]। তাহলে এককথায় সমস্যাটা মূল্যের নয়, বণ্টনের। যেকোনো অর্থনীতির ক্ষেত্রেই একটি পণ্য বেচা হয়, অর্থ পাওয়া যায়, তারপর সেই অর্থ দিয়ে অন্য পণ্য ক্রয় করা হয়। কিন্তু আরও একটি সমীকরণ আছে যেটা হল, অর্থকে যখন কোনো পণ্য উৎপাদনের কাজে লাগানো হয় এবং সেই পণ্যটা যখন বাজারে বিক্রি করা হয় এবং তার ফলে যে অর্থটা পাওয়া যায় – সেটা তখন প্রাথমিক অর্থের চেয়ে পরিমাণে বেশি হয়। এভাবে জিনিসটা বাড়তে থাকে। অর্থকে যখন পুঁজি হিসেবে পণ্যের উৎপাদনে ব্যবহার করা হচ্ছে তখনি সেটা মূলত পুঁজি হয়ে উঠছে - কিন্তু এটা হচ্ছে কেন? মূল্যের যে শ্রমতত্ত্ব - কার্ল মার্ক্স

---

[৪৩] স্বাতী ঘোষের "The Gendered Proletariat" – নামক গ্রন্থের "মূল্যতত্ত্ব" অংশটি নিয়ে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করব। এই গ্রন্থটিতেও যথেষ্ট সরল ভাষয় – মার্ক্সের মূল্যতত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই কারণে এই গ্রন্থ থেকে একটু উদ্ধৃতি এই পাদটিকায় উল্লেখ করলাম :

"In political economy, value is (a) a social production relation among people; (b) which regulates the distribution of labour; and (c) is an expression of abstract labour (Rubin 1928: 63). This threefold defination explains the laws of exchange in the market. The theory connects distribution of labour in production economy through equalization of things in process of exchange, which is equalization of the products of human labour… Following Rubin, value is 'reified production relation among people', that is value is not property of things but a social form acquired by things (Rubin 1996: 72)".

- Ghosh Swati, *The Gendered Proletariat : Sex Work, Workers' Movement and Agency*, Oxford University Press, Delhi, 2017 , p - 39-40

[৪৪] Fredric Engels and Karl Marx 2010, Lawrence & Wishart Electric Book, Marx and Engels Collected Works : vol 35

[৪৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য - ডেভিড রিকার্ডো তার অর্থনীতির মূল্যের তত্ত্বে মুনাফার গণিতের সঙ্গে, উদ্বৃত্ত মূল্যের গণিতকে এক করে দেখেছিলেন, সে বিষয়ে কার্ল মার্ক্সের সমালোচনা আছে।

Marx Karl, Capital VOL 1 , Modern Library NewYork, 1906– p -235-243

সেটার বিরুদ্ধে কিছু প্রশ্ন তোলেন, যার উত্তর হিসেবে মার্ক্স উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বে উপনীত হন[৪৬]। প্রশ্নগুলি কতকটা এরকম ছিল যে, শ্রমশক্তি অন্য পণ্যের থেকে ভিন্ন কেন? এছাড়া শ্রমের মূল্য কিভাবে শ্রমদ্বারা উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের চেয়ে কম? একই বস্তু কেন বাজারে একই ও ভিন্ন মূল্যে বাড়ে। প্রাকৃতিক যে বস্তু তাদের মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হবে। একটা শ্রমিক যদি চার ঘণ্টাতেই নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন করতে পারে তাহলে তার আট ঘণ্টা কাজের দরকার কি? উদ্বৃত্ত যে শ্রমটা শ্রমিক দেয় – সেটা আসলে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে কিন্তু শ্রমিককে পুঁজিপতির উৎপাদন ব্যবস্থার উপরেই কাজ করতে হয়, তার আর কোনো উপায় নেই কারণ পুঁজিপতি অতীতে শ্রমিকের শ্রমকে আদর্শ অর্থে আত্মসাৎ করে রেখেছে। পুঁজির ক্ষেত্রে মার্ক্স দুটো বিভাজন করেছিলেন – একটা হচ্ছে অপরিবর্তিত পুঁজি আর একটা পরিবর্তিত পুঁজি। সাধারণ অর্থে মেশিন বা কাঁচা মাল, যেগুলো কেবল এক হাত থেকে অন্য হাতে যাচ্ছে এবং মূল্যের বদল ঘটছেনা - অন্যদিকে পরিবর্তিত পুঁজি যেটা শ্রমিকের পিছনে পুঁজিপতি ব্যয় করছে। এটার উপরেই উদ্বৃত্ত মূল্য নির্ভর করছে। যেটাকে ভিত্তি করে মার্ক্স ‘Organic composition of capital’এর কথা বলেন[৪৭] কিন্তু অপরিবর্তিত পুঁজির ভূমিকাটা উৎপাদনের ক্ষেত্রে আবশ্যিক। এবার উৎপাদনের অঙ্ক-হিসেব ইত্যাদি দিয়ে মার্ক্সের দীর্ঘ আলোচনা আছে। অঙ্ক কষে মার্ক্স ঐ মূল্যের অংশটাকে চিহ্নিত করেন এবং পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতা ও পুঁজিবাদের সমস্যা আলোচনার ক্ষেত্রে এর আরও গভীরে যান। কিন্তু অঙ্ক-র দিকটি নিয়ে আমাদের গবেষণা আগ্রহী নয় এবং এও স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, গণিতের ভিত্তিতে আলোচনা করার মতন ক্ষমতা আমার মধ্যে অনুপস্থিত। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি তার বিস্তার আক্ষরিক অর্থে বিপুল বলে আমি মনে করি, কেবল অঙ্কই নয়, অজস্র নানান প্রকার বিদ্যাচর্চা থেকেই এই প্রশ্নগুলিকে দেখা যেতে পারে। অঙ্কের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও আমরা এখানে ঠিক অঙ্ক দিয়ে বিষয়টিকে বুঝতে চাইছিনা, অন্য আরেকটি দিক দিয়ে (মূলত সাহিত্যিক চর্চার দিক দিয়ে) আলোচনা করছি। আপাতত I.I.Rubin-এর খুব সাধারণ কয়েকটি কথাই আমাদের এই প্রশ্নগুলো, এখানে বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

এই প্রসঙ্গে I.I.Rubin –এর “Basic characteristics of Marx’s theory of value” – লেখাটির খানিকটা আলোচনা প্রয়োজন এখানে। সেখানে রুবিন লিখছেন,

“All the basic concepts of political economy express, as we have seen, social production relations among people”[৪৮]

এই দিক থেকে দেখলে ‘মূল্য’ আসলে কোন একটা সমাজের মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক। কিন্তু বিষয়টা অবশ্যই বিমূর্ত এবং যেভাবে মার্ক্সবাদে পণ্যের ‘ব্যবহারিক মূল্য’ বিমূর্ত, ‘বিমূর্ত শ্রমে’-র ধারণা বিমূর্ত - সেরকম ভাবেই

---

৪৬ কার্ল মার্ক্সের তত্ত্ব একটি বিশেষ অংশে তার পূর্বের সমস্ত অর্থনীতিবিদদের থেকে আবশ্যিক ভাবে পৃথক – কারণ মার্ক্স শ্রমের গণিতে, শ্রমের ধারণাকে শ্রম-শক্তির ধারণা হিসেবে ধরে নিয়ে আলোচনা করেন। এই বিষয়টি এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য।

৪৭ Marx Karl, Capital VOL 1 , Modern Library NewYork, 1906

৪৮ Rubin I.I, *Essays on Marx’s theory of value,* Black Rose Books, New York, P-63

এই সম্পর্কের বিষয়টিও বিমূর্ত। বিমূর্ত ভাবেই এটি উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে রুবিন মার্ক্সের সেই তত্ত্বের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, যেখানে মার্ক্স সমাজের সামগ্রিক শ্রম এবং তার বিতরণের বিষয়ে কথা বলেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হবে যে পণ্যের আদত মূল্য, শ্রমের গুণগত দিকটির উপরে নির্ভরশীল। রুবিন আরও লিখছেন –

"Thus, labor which we earlier considered as social, as socially equalized and quantitatively distributed, now acquires a particular qualitatively and quantitatively characteristic which is only inherent in a commodity economy, labor appears as abstract and socially necessary labor."[৪৯]

এবং আরও লিখবেন,

'this means that "value" does not characterize things but human relation in which things produced.'[৫০]

কথাগুলি গভীর এবং খুব ভেঙ্গে আলোচনা করলেই হয়ত এর সবকটি দিক নিখুঁত ভাবে বোঝা সম্ভব। কিন্তু প্রাথমিক ভাবে আমরা বুঝতে পারি, মূল্য যা কিনা আদতে নিজে বিমূর্ত, উৎপাদনের সন্দর্ভে মূর্ত রূপে ধরা দেয়। এরই মাঝে, উৎপাদনের চক্করে যে মূল্যটুকু পরিমাপের অতীত হয়, তাকে এই পুরো পরিমাপ ব্যবস্থাতেই আঁটিয়ে তোলা যায়না। বরং তা পরিমাপের মাপকাঠি থেকে উপচে পড়ে - মূল্যের উদ্বৃত্ত হয়ে দাঁড়ায়। মার্ক্সের মতে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার গোড়াতেই এই অপরিমেয়কে পরিমেয়তে আঁটিয়ে তোলার প্রক্রিয়া আছে, যাতে করে সর্বসাকুল্যে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষতি হয়। সমস্যাটা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পুঁজিপতি বা উঁচু শ্রেণীর মানুষের মানসিকতা বা মতাদর্শের মধ্যেই নেই, এই সমস্যা পুঁজিবাদের বাস্তবিক ভিত্তি। একই রকমের ধারণা-রূপক মার্ক্স ব্যবহার করেছিলেন পণ্যরতি-র ক্ষেত্রেও। সেখানেও পরোক্ষ কিছু একটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছিল। পরোক্ষ ছিল এই কারণে যে ওটা আসলে মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক যেটা "Reified" –হয়ে পণ্য হয়ে ওঠে। আর পুঁজিবাদের একমাত্র আবিষ্কার 'শ্রমশক্তি' নামক পণ্যটির ক্ষেত্রে যে এটা কি অসম্ভব ভাবে ঘটে চলেছে তা আমাদের বুঝতে বাকি থাকেনা। মূল্যের আলোচনা রুবিনের লেখায় বিস্তৃত এবং রুবিন প্রধানত 'বিমূর্তের' সঙ্গে 'সম্পর্কে'র সংযোগ খুঁজে পেয়েছেন – সেটা বিমূর্ত শ্রম হোক কিংবা বিমূর্ত মূল্য ইত্যাদি। এই সম্বন্ধের ইঙ্গিত যদিও মার্ক্সের মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে উপস্থিত ছিল। মার্ক্সের দর্শনের এই অংশটিতেই সত্ত্বা-বিজ্ঞানের নানান সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। জাক দেরিদার 'স্পেক্টার্স অফ মার্ক্স' গ্রন্থটি প্রধানত দু-তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে বেশি মাত্রায়, তার মধ্যে প্রেত, সময় এবং অনাপেক্ষিক বা পরোক্ষের ধারণা কীভাবে মার্ক্সের তর্কে আছে – সেটা কীভাবে পণ্যরতি-র ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে যায় সে বিষয়ে দেরিদা লিখেছিলেন। সেখানে আসলে জোর দেওয়া হয়েছিল অনাপেক্ষিকের -

[৪৯] Rubin I.I, *Essays on Marx's theory of value,* Black Rose Books, New York, P - 66

[৫০] Rubin I.I, *Essays on Marx's theory of value,* Black Rose Books, New York, P - 69

আপেক্ষিক হয়ে ওঠার দর্শনের উপর। যার মধ্যে দিয়ে সত্ত্বা-বিজ্ঞান এবং মার্ক্সবাদের মধ্যেকার নিহিত অধিবিদ্যক সত্ত্বাচিন্তার একপ্রকার বি-নির্মাণ করেন দেরিদা। সত্ত্বা-বিদ্যা বা ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি ontology, তার ফরাসি উচ্চারণ আসলে অনেকটাই 'হন্টলজি'-র মত। অর্থাৎ যা হন্ট করে, হানা দেয়। দেরিদার দর্শনে প্রেত হানা দেয়। সত্তার মধ্যেও যেন একরকমের হানা দেওয়ার লক্ষণ আছে অথবা বলা চলে ঐ হানাগুলির মধ্যে দিয়েই সত্তাকে ধরা যায়, বোঝবার চেষ্টা করা যায়, তার লেশ খুঁজে পাওয়া যায়। একরকমের অনুপস্থিতের উপস্থিতি যেন, যা দেরিদীয় অর্থে উপস্থিতের অধিবিদ্যার বিরোধিতা করে। এই সূত্রে রাজনৈতিক অর্থে কীভাবে মার্ক্সের চিন্তা বর্তমানের পাশ্চাত্য দর্শনকে হানা দেয় বা বর্তমানের দর্শন-চিন্তায় মার্ক্সের প্রেত কিভাবে ক্রমাগত হানা দিয়ে চলে, সেই বিষয়ে অনেক কিছু লেখেন। এমন ভাবে লেখেন যেন এই ঐতিহাসিক হানা দেওয়ার দুর্ঘটনাগুলি, দার্শনিক আলোচনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত – বি-নির্মাণবাদের স্বভাবচিত কায়দায় দেরিদা মার্ক্সের দর্শনকে পাঠ করেন তাঁর গ্রন্থে। বি-নির্মাণ এবং দেরিদার চিন্তা বিষয়ে অন্যতম একজন কর্তৃত্ব-শীল দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও গায়ত্রী স্পিভাকের 'মূল্য' সংক্রান্ত একটি লেখা ঠিক এই শর্তগুলিতে মার্ক্সের মূল্যের ধারণাকে পড়ছেন না। পড়ছেন না বলাটা হয়ত ঠিক হবে না, বরং বলা চলে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে, আরও গভীর ভাবে পড়ছেন। ওনার ক্ষেত্রে আলোচনাটি মূলত – ভাববাদ ও বস্তুবাদের প্রাথমিক পরিভাষাগুলিকে প্রশ্ন করতে করতে এগিয়ে চলা এবং মূলত ভাষা ও সত্ত্বার সম্পর্ক ধরে মূল্যকে বুঝতে চাওয়া। এক্ষেত্রে উনি আরও অনেক কিছুর সঙ্গে স্যসুরের চিহ্নতত্ত্বের আলোচনাকেও সংযুক্ত করেছেন। স্পিভাক পরবর্তীকালে মার্ক্স নিয়ে আরও অনেক কথা লিখেছেন যদিও, তবু তাঁর এই প্রবন্ধটি বিশেষ রকমের জটিল ও নতুন চিন্তা উৎপাদনকারী বলে আমার ধারণা। কিন্তু এই প্রবন্ধে উনি মার্ক্সের চিন্তায় 'বিইং'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ধারণা উল্লেখ করেন যেটা আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনীয়। মার্ক্সের ভাষায় একটি মুদ্রার সত্ত্বা বা 'বিইং' আসলে ঐ মুদ্রাটির যে নানান হাত ফেরতা হয়ে ঘুরে বেড়ানো কিংবা ঘষা খেতে খেতে ক্ষয়ে যাওয়ার ঘাত-প্রতিঘাত - তার উপর নির্ভরশীল। এগুলির মধ্যে দিয়ে আসলে মূল্য চিহ্ন নির্মিত হয়[৫১]। একটা কয়েনের ছড়িয়ে পড়া, এখানে সেখানে, এহাত ওহাত ঘুরে বেড়ানোর

---

[৫১] বিষয়টি যদিও খুব সরল নয়, 'Scattered Speculations on the Question of Value' ভীষণ জটিল একটি লেখা। বিশেষত যারা স্পিভাকের দর্শন এবং তার লেখা-পত্রের সঙ্গে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরিচিত তাদের পক্ষেই একমাত্র এই নিবন্ধটির সঠিক মর্মোদ্ধার করা সম্ভব। আমরা এই লেখাটির প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসবো ঠিকই কিন্তু, আমাদের গবেষণায় এই লেখাটি টুকরো কিছু কিছু আলোকপাতের সার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে বা হবে। আমাদের ধারণা এই লেখাটির সঠিক তাৎপর্য উদ্ধার আসলে নিঃসন্দেহে একজন প্রকৃত দার্শনিকের কাজ। যে প্রসঙ্গটির উল্লেখ আছে স্পিভাকের লেখায়, সেই প্রসঙ্গটিকে যথাযথ উদ্ধার করে এনে, কেবলমাত্র বোঝাতে চাইছি যে ওনার বক্তব্যকে আমরা কিভাবে পাঠ করতে চাইছি এখানে –

"Marx describes this phenomenon as the "Dasein" of the coin as "value sign" [wertzeichen]. "The circulation of money is an outer movement [auBere Bewegung]… in the friction with all kinds of hands, pouches. Pockets, purses…the coin rubs off…By being used it and by used up" [A Contribution to the critique of Political Economy 108; the translation of *Dasein* as the "work it performs" seems puzzling.] ' (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য Spyros Lapatsioras and John Milios তাদের "The notion of Money : from the Grundrisse to Capital - নামক লেখায় আলোচনা করেছেন – প্রাথমিক ভাবে মার্ক্স টাকার ক্ষেত্রে দুটি মূল্যের কথা ভেবেছিলেন – একটি প্রাকৃতিক এবং অপরটি Symbilic. মার্ক্সের মূল্যের তর্ক খুবই সূক্ষ্ম এবং জটিল – তথাপি স্পিভাকের উল্লেখিত লেখাংশটুকুকেও যেন একভাবে মার্ক্সের প্রাথমিক টাকা বিষয়ক ধারণার আলোকে ভাবা

মধ্যে দিয়ে মূল্য বিকশিত হয় যেন - অর্থাৎ তাহলে সত্ত্বার গভীরে মার্ক্স সম্পর্কের কথাই ভেবেছেন হয়ত একভাবে, সম্ভবত তিনি এভাবেই ভাবতে চেয়েছিলেন। পুঁজিবাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় যখন আমরা একটি পণ্যের কথা ভাবছি তখন তার অব্যবহিত নির্দেশ মানুষের সম্পর্কের দিকেই যাচ্ছে। পণ্যের ব্যবহার এবং পণ্যের বিনিময় এই দুটি মূল্যের ভিতর আসলে প্রথমটি স্বাভাবিক হয়েও বিমূর্ত। যেমন একটি মুদ্রার ব্যবহারিক মূল্যের চেয়ে বিনিময় মূল্য বেশি এবং আলাদা অবশ্যই। তাহলে ওর ব্যবহারিক মূল্য নির্দিষ্ট হচ্ছে, এক বিমূর্ত সংযোগের উপর নির্ভর করে। এই সংযোগ আসলে সত্ত্বার সংযোগ কিন্তু তাকে দেরিদার দর্শন উপস্থিতের অধিবিদ্যার মাপে মেপে নিতে নারাজ হবে এবং এ নিয়ে সিদ্ধান্তসূচক কোন মন্তব্য করা কি আদৌ চিন্তাবিদদের কাজ? দেরিদা ওনার প্রেক্ষিত থেকে হয়ত ঐ সত্ত্বা আলোচনা প্রসঙ্গে বলবেন প্রেত, লেশ (trace) ইত্যাদির কথা। মূল্যের অঙ্কে প্রবেশ করার ইচ্ছে আমাদের নেই, আগেই লিখেছি - তাই আপাতত স্পিভাকের তর্কের অনেকটা অংশই ছেড়ে দিয়ে, আমরা মূল বক্তব্যে ফিরে আসি সেখানে (আবার তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা প্রসঙ্গক্রমে স্পিভাকের প্রসঙ্গে ফিরে আসবো) যেখানে আসলে অজানা কোন সংযোগের কথা, অসম্ভব অর্থে অনুমান করা হচ্ছে। মার্ক্সের তর্কে সেটা প্রধানত মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক (এদিক থেকে দেখলে অনেকেই মার্ক্সকে মানবতাবাদী হিসেবে সমালোচনা করবেন, বহুবছর ধরেই করে চলেছেন) । কিন্তু মানবতাবাদকে আমরা নানাভাবে সমালোচিত হতে দেখেছি গত শতকে এবং এই সময়ের অনেকটাই উত্তর-মানবিক দর্শনের সময়, সে বিষয়েও আমরা অবগত। সেদিক থেকে ভাবলে - মানবতাবাদী কথাটা উচ্চারিত হলেই যেন মানুষকে কেন্দ্রে আনতে চাওয়া হয় – এমনটা মনে হওয়ার অবকাশ তৈরি হয়। আমরা যাদের নিয়ে আলোচনা করছি প্রথম থেকে – তারা উভয়েই এক অর্থে চরমতম মানবতাবাদী (রবীন্দ্রনাথ এবং মানিক) কিন্তু আমরা জানি - এই শতকে অন্তত যে 'সম্পর্ক' বলতে আমরা যা অনুমান করতে চাইছি - সেখানে যদি মানুষের কথা বলতেই হয়, তাহলে বলতে হবে - আরও সঠিক ভাবে, মানুষের সঙ্গে বাদবাকি সৃষ্টির সম্পর্ক। এই শর্তে আমাদের আলোচনা সম্ভবপর হতে পারে, বিশ্লেষিত হতে পারে, এগিয়ে যেতে পারে এবং খুব নির্দিষ্ট করে বললে সেটা নিয়েই আমরা প্রধানত আগ্রহী। বাদবাকি বিষয়গুলি তর্কের স্বচ্ছতার কারণে উল্লেখ করে করে এগিয়ে চলেছি।

আমরা আমাদের আলোচনায় বার বার মানুষের প্রসঙ্গে জোর দিতে চাই একটাই কারণে - লেখা মানুষের কাজ, লেখা মানুষের প্রকাশ, মানুষকে আমরা যা যা দিয়ে চিনি তার মধ্যে লেখা একটি প্রাচীন এবং মৌলিক কাজ। যা ইতিহাসের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিতও হয়েছে এবং ক্রমে মানুষিক কাজ হিসেবে এর মূল্য একেবারে শূন্য থেকে আস্তে আস্তে আধুনিক সমাজে এসে চরমে পৌঁছেছে (বিশেষত বিশশতকে)। লিখনের এই দার্শনিক

যেতে পারে। অর্থাৎ যেন টাকার প্রাকৃতিক মূল্যটুকু – এহাত-ওহাত সঞ্চরণশীলতার মধ্যে দিয়ে এক নতুন চিহ্নস্বরূপতার মূল্য অর্জন করে যেন। খুব গভীরে না হলেও কেবল আলোচনার খাতিরে এখানে এটুকুই উল্লেখিত থাক।)

- Gayatri Spivak, 'Scattered Speculations on the Question of Value', Diacritics, Winter, 1985 p-81

অভিঘাতের কথা আমরা দেরিদার দর্শনে বারং বার পাই – সেই আলোচনাতেও আমরা যাব। কিন্তু মানুষ এবং মানুষ নির্মিত যন্ত্রমানব ভিন্ন, লেখা কোন পশু বা বৃক্ষ কিংবা কীট ইত্যাদির কাজ নয়। মানুষের নির্মাণের ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাস সভ্য-অসভ্য জাতির, প্রকৃতি-সংস্কৃতি, শিক্ষা-অশিক্ষা, এমনকি মানব – মানবেতর ইত্যাদি বিপরীত ধারণা-যুগ্মে জর্জরিত। কিন্তু আধুনিক সমাজে, আধুনিক বিজ্ঞান যাকে মানুষ বলে এবং যা যা প্রাণীকে অমানুষ বলে তাদের মধ্যে একটি জরুরি তফাত হল মানুষ লিখতে পারে, মানুষ লেখার মধ্যে দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে, বাকিরা পারেনা। আবার বলছি, এতে করে জগতের অস্তিত্বের বিশ্লেষণকে মানবতাকেন্দ্রীক হতেই হবে এর কোন মানে নেই কিন্তু জ্ঞানের একটা অংশ যে আসলে 'মানব'অস্তিত্ব এবং মানবসমাজের উপরেই নির্ভরশীল সেটা অস্বীকার করা সম্ভব নয় এবং সেই অংশের চোখ দিয়েই জ্ঞানচর্চার সিংহভাগ রচিত ও চর্চিত হয়ে এসেছে এবং হয়ে চলেছে। এক অর্থে সমস্ত বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানই মানব-প্রেক্ষিতের ছায়ার অন্তর-বাহিরে খেলা করে। কিন্তু এটা কেবল একটা ভঙ্গিমা, আমরা আদৌ মানুষের পুণঃকেন্দ্রীকরণের কথা ভাবছিনা – কিন্তু 'মানুষিক প্রেক্ষিত' থেকে আমাদের আলোচনাকে পুনর্বিবেচনা করার চেষ্টা করছি। অন্তত মার্ক্স নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে মানুষকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারিনা, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে, মানিক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের সিংহভাগ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেই আমরা মানুষকে ছেড়ে যেতে পারিনা কারণ – মানুষ এবং তার শ্রেণী বৈষম্যের ইতিহাস না থাকলে – কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো রচিত হতে পারত না। মানুষ ক্যাটেগরিটিকে সরিয়ে দিলে সেই গ্রন্থের মূল্য নষ্ট হয়ে যায়, যেমন মূল্যহীন হয়ে পড়ে উল্লেখিত আরও নানান কিছুই। লুই আলথুসারের মানবতাবাদী মার্ক্সবাদ বিষয়ক সমালোচনা বহুলচর্চিত এবং হেগেলের দর্শনের সঙ্গে কার্ল মার্ক্সের তফাৎ আসলে দ্বন্দ্বের চরিত্রগত তফাৎ - এই কথা আলথুসার বলতে চাইবেন[৫২]। অর্থাৎ হেগেল থেকে আমরা যখন মার্ক্সবাদী চিন্তার মধ্যে এসে পড়ছি, পাঠক হিসেবে আমাদের বিবেচনা করা উচিত – সেই পরিবর্তন কিন্তু কেবলমাত্র একটা দ্বন্দ্বকে উল্টেপাল্টে দেওয়া নয় বরং হেগেল থেকে মার্ক্স-এ আসার সময় দ্বন্দ্বের চরিত্রটিও পাল্টে যাচ্ছে। বস্তুবাদ নতুন এক দ্বান্দ্বিক প্রতর্ক দিয়ে জ্ঞানচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফলত সেই প্রেক্ষিতে মানবিকতার, মানুষের আত্মিক আধ্যাত্মিকতার এবং শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, সম্পর্ক – প্রভৃতির যোগ নিয়ে ভাবার আর তেমন প্রয়োজন থাকছেনা। ঐতিহাসিক ভাবেই থাকছেনা। যুদ্ধপরবর্তী বিশ্ব মানবতার চিরাচরিত মহিমার তত্ত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কারণ মানুষ নয় আমরা তখন অন্য পরিভাষা দিয়ে ভাবতে শিখছি – যেমন বস্তু, জীব, প্রাণ, বস্তুগত-দ্বন্দ্ব, দ্বিবিধ প্রকারের দ্বন্দ্ব, 'উৎপাদন' ইত্যাদি ইত্যাদি। যেখানে মানুষ কেবলমাত্র চিন্তা-উৎপাদনকারী যন্ত্র বই কিছু নয় হয়ত – অন্য জীবের সঙ্গে তার হয়ত এটুকুই তফাৎ খুব বড় অর্থে। গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হল – এর ভিত্তিতেও মার্ক্সবাদী তর্ককে ভাবতে আলথুসারের সমস্যা হবেনা। ফ্রান্সে বিশ শতকে – উত্তর-যুদ্ধ পর্বের যে-সকল চিন্তাভাবনা, তা মূলত অ-মনুষ্যবাদ দ্বারাই চালিত। যেখান থেকে ক্রমে আমরা পরবর্তীকালে জাক দেরিদা বা জিল দ্যলুজের তর্কে সরাসরি না-মানুষবাদের কথা পাব। এই সন্দর্ভের মধ্যেই নানা মতের অবকাশ আছে – এ যেন এক প্রকার বিশৃঙ্খলা।

[৫২] Althusser Louis, *For marx* , The Penguin Press, France, 1969, P – 161 - 219

যেমন একই সঙ্গে যখন মানুষ ও যন্ত্রের তর্ক উঠে আসে তখন, জগতকে দেখার ও জানার যে প্রাথমিকতা আছে মানুষের চেতনায় – তার প্রেক্ষিতে যন্ত্রের কথা আসে - আমরা যে জগত নিয়েই চিন্তিত হইনা কেন – তার মূল প্রারম্ভিকতায় যে মানুষের অবভাসিক অস্তিত্ব তা আমরা যৌক্তিক ভাবে অস্বীকার করতে পারিনা, আবার অন্যদিকে একদল বৈজ্ঞানিক আছেন যারা যন্ত্রমানবকে একেবারে মানবের অনুরূপ বলেই দাবি করেন। অর্থাৎ একজন যন্ত্রমানব যদি একটি আশ্চর্য দর্শনের বই লিখে ফেলে তাহলে আমি কিভাবে মানুষ ও না-মানুষের তফাৎ করব ইত্যাদি। এই তর্ক পুরনো, মার্টিন হেইডেগারের মনুষ্যচিন্তাকে আশ্রয় করে অনেক যন্ত্র-তাত্ত্বিকেরাই এ নিয়ে বহুদিন যাবৎ বিরোধিতা করে আসছেন এবং আমরা এভাবেও ভাবতে পারি যে এটা হয়ত যন্ত্র-সভ্যতারই একটা দিক, যেটার সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্কও যথেচ্ছ। যন্ত্রকে মানুষের উপরে তুলে আনতে পারলে, নিপীড়িত মানুষের উপর কর্তৃত্বের সুযোগটাও বাড়ে (বি-নির্মাণবাদী চিন্তক Bernard Stiegler সহ আরও অনেকের লেখালিখিতে যন্ত্র–তত্ত্ব বিষয়ে নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক উঠে এসেছে, আমরা সেই আলোচনায় প্রবেশ করছিনা)। যেহেতু এর উত্তর খুব গভীর স্বত্ত্বাবিজ্ঞানের না-পাওয়া উত্তরগুলির সঙ্গে সংযুক্ত ফলত এ নিয়ে যেকোনো পথেই আলোচনা করতে কোন কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায়না। বিশ শতকের না-মানুষবাদ, একুশ শতকে এসে মনুষ্য জাতির অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে – সুতরাং এটি প্রাথমিকভাবে একটি স্বত্বা-রাজনীতির (Onto-political) প্রশ্ন (যে কথা আমরা আগে আলোচনা করছিলাম) যার একরোখা কোন উত্তরের কোন অর্থ হয়না। এটা বনাম ওটা – হয়ত তর্কটা আমার মতে তেমন নয়, বরং দুটো দিক নিয়েই আরও বেশি চিন্তা ও প্রতিফলনের অবকাশ খোলা রাখাটাই আমাদের কর্তব্য এবং এ বিষয়ে ফরাসি তাত্ত্বিক জুলিয়া ক্রিস্তেভার "প্যাশনস অফ আওয়ার টাইম" গ্রন্থের 'ডেয়ার হিউম্যানিজম অংশের একটি আলোচনা বিষয়ে আমরা সচেতন হতে পারি আপাতত – যার মূল প্রতিপাদ্য কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার মাল্টিভার্স তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে নিয়ে মানবতার সেইরকম অন্য-একটি প্রেক্ষিতের কথা ভাবতে চাইছেন জুলিয়া – যে ভাবনার মধ্যে অবশ্যই মার্টিন হাইডেগার, জাঁ পল সার্ত্র, হানা আরেন্ট – এর মতন মানুষতার চিন্তকেরা আছেন। এখানে ক্রিস্তেভা, 'ডেয়ার হিউম্যানিজম' কথাটির একটি রাজনৈতিক সংজ্ঞায়ণ করার কথা বলছেন –

'I entitled my remarks "Dare Humanism". Why? When humanism is reified into *systems* – Auguste Comte's or Marx's, or Sartre's "radical secularism", which he assured conserved religion's moral values but abandoned their divine guarantee and are consequently as many theologies that ignore each other – it becomes a metaphysical relic. It moves divine worship of the Absolute in society or human nature to wind up in a "sociolotry" or a "humanolatry" that contemporary philosophy has not failed to deride'[৫৩]

---

[৫৩] Kristeva Julia, *Passions of Our Time*, Columbia University Press, New York, 2018.

কিন্তু এই মানবতার ধারণাকে আমরা কেন ভাবব যখন আমরা আলথুসারের দ্বন্দ্বের বিখ্যাত বিচিত্র ব্যাখ্যার কথা ভাবছি? কেন ভাবব, যখন আমাদের সামনে দেরিদা বা দল্যুজ-এর উত্তরসূরিদের অসংখ্য লেখা-পত্র আছে, না-মানুষবাদ কিংবা যন্ত্র-তত্ত্ব নিয়ে? আমি এটাকেও খানিকটা বিনির্মাণের যুক্তিতেই বুঝতে চাইছি, যন্ত্রকে মানুষের বিপরীতে সর্বশক্তিশালী বস্তু হিসেবে দাঁড় করানোর মধ্যে দিয়ে যে ক্ষমতাবাদের সম্ভাবনা উন্মোচিত হয় তাকে বধ করার বান হয়ত প্রান্তিক মানুষতাবাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও থাকতে পারে। একবগগা কোন জ্ঞানতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা আসলে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক-বিন্যাসের প্রতি একটি অন্যায্য পদক্ষেপ বলে মনে করা যেতে পারে। ২০২১ সালে, জুলিয়া ক্রিস্তেভা তাঁর একটি বক্তৃতায়[৫৪] যখন পুরাতন ধারণাবৃত্তগুলি থেকে ক্রমে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার কথা বলেন, বরং সেই প্রস্তাবের মধ্যে হয়ত আলথুসারের দ্বন্দ্বকে আরেকভাবে পাঠকরা যায় – সে প্রসঙ্গে আমরা আপাতত যাবনা বরং এখানে আমরা একটা তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলা অনুভব করি যেন – নানা মতের মধ্যে কোন একটায় ঠাঁই করতে পারিনা। 'বাংলায় বিনির্মাণ/অ-বিনির্মাণ' গ্রন্থ থেকে দীপেশ চক্রবর্তীর একটি অনুচ্ছেদ তুলে আনা প্রয়োজন, যেখান থেকে বোঝা যায়, বিশৃঙ্খলা চিন্তার অঙ্গ কারণ এক ধারনা, এক নাম অপরের সঙ্গে জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে, একেবারে আলাদা, টুকরো করে নেই, তাই চিন্তকের স্বভাবতই পুরনো কোন ফেলে আসা ক্যাটেগরিকে ধরে রেখে চিন্তা করার দায়িত্ব থেকেই যায় –

"কেজো, ব্যস্ত, গণতান্ত্রিক মানুষ জিজ্ঞেস করবেন, কী কাজে লাগে এইসব? আগেই বলেছি রাজনীতিমনস্ক ও ব্যবহারিক চিন্তায় সত্যের একটি বিশেষ চেহারা আমরা ধরে নিই। মনে করি যেসব 'নাম' ব্যবহার করছি, তারা তর্কাতীতভাবে আছে। তাই নি:সন্দেহে আঙ্গুল দেখিয়ে বলি, ওই বাঙালি, ওই ক্যাপিটালিস্ট, ওই তো শ্রমিকশ্রেণী। এমন চিন্তা 'ভুল' নয়। কিন্তু চিন্তায় অনেক অসমন্বিত দ্বন্দ্বকে অনিবার্যভাবে উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফসল এইসব নাম। দেরিদার পদ্ধতি আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সজাগ করে। আমরা আত্মসমালোচনায় প্রবুদ্ধ হই, নীতির প্রশ্নগুলি আবার সামনে এসে দাঁড়ায়।"[৫৫]

তাহলে স্যসুরের চিহ্নতত্ত্বের সমালোচনার মধ্যে দিয়ে দেরিদা যে লিখনের কথা বলেন তার ব্যাপ্তি আরও অনেক বেশি গভীর। স্বভাবতই তা মানবতাবাদকেও সমালোচনার লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে, আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে সেই লিখনের দর্শন – তথাপি যেহেতু আমরা ঠিক পাঠ্য (text) বা পাঠক (Reader) – এর তত্ত্ব আলোচনায় নামিনি, আমাদের জন্য আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ পথ হল - লেখকের আত্ম (Self). ফরাসি-তত্ত্বের কোন সূত্র ধরে বিশ-শতকের দর্শনে লেখকের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উত্তরকাঠামোবাদ আঘাত হানে সে বিষয়ে বিদ্যাচর্চামহলে আমরা অনেকটা আলোচনা করেছি – সেই প্রেক্ষাপট নিয়েও আমরা খানিকটা কথা বলব

[৫৪] Kristeva Julia, *Thinking with Julia Kristeva*, La Maison Françoise of New York University, Apr 5, 2021. (এই বক্তৃতাটির ছাপা সংস্করণ এখনও প্রকাশিত নয় – তাই আপাতত জানার সুবিধার্থে কেবলমাত্র ইউটুবের একটি লিঙ্ক দেওয়া হল। https://www.youtube.com/watch?v=-xDSmCu0X4E

[৫৫] অনির্বাণ দাশ, (সম্পা.) *বাংলায় বিনির্মাণ/অবিনির্মাণ*, অবভাস, কোলকাতা, ২০০৭, পৃ - ১৩৮

পরবর্তীকালে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল, ‘লেখকের আত্ম’ কি মানুষের অস্তিত্বের তোয়াক্কা করে? আমরা যে অর্থে লেখার কাজ নিয়ে আলোচনা করছি, সেই অর্থে করে। এমনকি যদি আমরা একজন যন্ত্র-লেখকের কথাও ভাবি, তার সাহিত্যিক বা ভাষাগত যে সম্ভাবনাগুলি একজন যন্ত্রনির্মাতা কোড আকারে লিখছেন সেটাকে মানুষের প্রেক্ষিতে কিভাবে পড়ব? আসলে যে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে পারিনা সেটা হল, মার্ক্সের তর্ক, ভবিষ্যতের তর্কের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে জুড়ে লেখার কাজকে ভাবার কারণটাই হয়ত সেটা (পাশ্চাত্য দর্শনে মার্ক্সবাদী নন্দনতত্ত্বও এই প্রশ্নগুলির সঙ্গে জুঝেছিল অনেকটাই) – যে মার্ক্স তাঁর শ্রমের তত্ত্ব, পুঁজিবাদের সমালোচনা এবং ভবিষ্যৎ এই সবকিছুরই হিসেব কষতে চাইছেন সমসাময়িক পাশ্চাত্যের মানবসমাজের ভিত্তিতে। তাঁর শ্রমিক যদিও পরিসংখ্যানে এক শ্রমশক্তির একক মাত্র, কয়েকটা সংখ্যা কেবল – তবু পুঁজিবাদের সমালোচনার নৈতিক প্রসঙ্গ বাঁধা আছে মূল্যের তর্কের সঙ্গে, যেখানে বিষয়ীর প্রশ্ন উঠে আসে, যেখানে উঠে আসে সম্পর্কের প্রশ্ন – যা নিয়ে আগে আমরা কথা বললাম, অধ্যায়ের শুরু থেকেই কথা বলে যাচ্ছি। এই সম্পর্ক নেহাত মানবিক একথা বলার অর্থ হয়না, একে বিভিন্ন দর্শন নানাভাবে বিশ্লেষণ করে থাকে, কিন্তু মার্ক্স যে সমস্যাটিকে সামনে রেখে কথা বলছেন বা মানিক বলছেন বা রবীন্দ্রনাথ বলছেন – সেই সমস্যা আসলে মানুষের সঙ্গে বাদবাকি সৃষ্টির কি সম্পর্ক সেটার প্রশ্ন। সেটা যত গূঢ় অর্থে আবিষ্কার করা যাবে, ততই ভবিষ্যৎ বিষয়ে সুনিশ্চিত ও সঠিক হওয়া যাবে। এই তথাকথিত সামাজিক নৈতিকতার সঙ্গে অস্তিত্বের একটা জট লেগে আছে বলেই আমাদের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ, এই বিশৃঙ্খলা ভিন্ন মানুষতার আলোচনা অপূর্ণ বলেই আমার মনে হয়। এক অর্থে বলা চলে সত্ত্বার সঙ্গে যেভাবে রাজনীতি জড়িয়ে থাকে, এও যেন তেমন কোন একরকম জড়িয়ে থাকা – মানবিক অভিব্যক্তিকে সরিয়ে রেখে আমরা বৃহতের সঙ্গে সম্পর্কের আলোচনায় বা অস্তিত্বের আলোচনায় অপারগ। এই সূক্ষ্ম ভেদরেখাগুলি নিয়েই আমাদের চলতে হবে। কারণ আমরা আমাদের গবেষণায় সত্ত্বার প্রসঙ্গটিকে দেখছিই লেখকের আত্মের প্রেক্ষিত দিয়ে।

আমাদের এই বিশ্লেষণ কি লেখা ছাড়া অন্য কার্যের আলোচনায় একইভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে? এককথায় বলা মুশকিল, কারণ লেখা এমন একটি কাজ যেখানে চিন্তার কাল্পনিক জগত এবং তথাকথিত দেহের বাস্তবিক জগত পরস্পর মিলিত হয় এবং সেই মিলন লিপিবদ্ধ হয়ে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। দেরিদা নানাবিধ কারণে লিখনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন কিন্তু আমার মতে কাজের সাধারণ ধারণার ‘এক্সেমপ্লার’ হিসেবে লেখার কাজের ধারণার গুরুত্ব সবিশেষ। তাই লিখনের তত্ত্বের ভিত্তিতে কার্যের তত্ত্বকে অবশ্যই ভাবা যেতে পারে কিন্তু প্রতিটি কার্যের ক্ষেত্রে আমূল বদলে যাবে তর্কের রকমফের। লেখার সঙ্গে তথাকথিত ভাষা, চিহ্নের সম্পর্ক এবং সেখান থেকেই কথন ও লিখনের তর্কের যেমন একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল দেরিদার লিখনের আলোচনায়, তেমনি আমাদের ক্ষেত্রে, আমরা যখন লেখার কাজ নিয়ে আলোচনা করছি তখন মানুষ এবং অমানুষিকের তফাত এই আলোচনার ক্ষেত্রে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল এবং আমরা এই তফাৎগুলিকে ক্রিয়াশীল রেখেই আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, এই বিশৃঙ্খলা ছাপিয়ে নতুন কোন আলোচনার প্রবেশ পথে যেতে চাইনা, সেটা নিশ্চয়ই সম্ভব

কিন্তু আমাদের আলোচনার ধরণ গড়ন তেমন নয়। (এই অনুসঙ্গেই - আরও গভীর একটি প্রশ্ন হল – লিখন বা সাহিত্যিক কাজের ক্ষেত্রে কি অন্য কোন শ্রম ব্যবহৃত হয় – নাকি শ্রম ঐ একই থাকে – আসলে শ্রমের সঙ্গে মূল্যের যে চিরাচরিত সম্পর্ক সেটাই – এক্ষেত্রে বদলে যায়!) এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে অবশেষে আমরা দেখব – ঠিক কোন প্রশ্নের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা ।

আপাতত পাদটীকায় রুবিনের লেখার একটা বড় অংশ[৫৬] এখানে উল্লেখ করে মূল্যের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের অংশের আলোচনাটুকুর এখানেই ইতি টানছি। এক-কথায়, পণ্য হিসেবে শ্রম-শক্তি-র দ্বিবিধ চরিত্র একটা ব্যবহারিক অপরটি বিনিময় জাত। এর মধ্যেই যেন একভাবে ঐ বিমূর্ত শ্রম এবং সত্ত্বাসার ও পরিমাপের খামতির প্রসঙ্গটি স্পষ্ট। সেটার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে সামাজিক ভাবে সংগত শ্রমের পরিমাপের তর্ক এবং সম্পর্কের প্রসঙ্গ। মার্ক্সের তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে এই তর্কগুলি ঘুরে ফিরে বার বার আসে নানা ভাবে।

---

[৫৬] "Thus, Marx's theory analyzes the phenomena related to value from qualitative and quantitative points of view. Marx's theory of value is built on two basic foundations: 1) the theory of the *form of value* as a material expression of abstract labor which in turn presupposes the existence of social production relations among autonomous commodity producers, and 2) the theory of the *distribution ofsocial labor* and the dependence of the *magnitude* of value on the quantity of abstract labor which, in turn, depends on the level of *productivity of labor*. These are two sides of the same process: the theory of value analyzes the social form of value, the form in which the process of distribution of labor is performed in the commodity capitalist economy. "The form in which this proportional distribution of labor operates, in a state of society where the interconnection of social labor is manifested in the private exchange of the individual products of labor, is precisely the exchange value of these products." Thus, value appears, qualitatively and quantitatively, as an expression of abstract labor. Through abstract labor, value is at the same time connected with the social *form* of the social process of production and with its material-technical *content*. This is obvious if we remember that value, as well as other economic categories, does not express *human relations* in general, but particularly *production relations* among people. When Marx treats value as the social form of the product of labor, conditioned by a determined social form of labor, he puts the *qualitative, sociological* side of value in the foreground. When the process of distribution of labor and the development of productivity of labor is carried out in a given social form, when the "quantitatively determined masses of the total labor of society" (subsumed under the law of proportional distribution of labor) are examined, then the quantitative (one may say, mathematical) side of the phenomena which are expressed through value, becomes important. The basic error of the majority of Marx's critics consists of: 1) their complete failure to grasp the qualitative, sociological side of Marx's theory of value, and 2) their confining the quantitative side to the examination of exchange ratios, i.e., quantitative relations of value among things; they ignored the quantitative interrelations among the quantities of social labor distributed among the different branches of production and different enterprises, interrelations which lie at the basis of the quantitative determination of value.

We have briefly examined two aspects of value: qualitative and quantitative (i.e., value as a social form and the magnitude of value). Each of these analytical paths leads us to the concept of *abstract labor* which in turn (like the concept of value) appeared before us either primarily in terms of its qualitative side (social form of labor), or in terms of its quantitative side (socially-necessary labor). Thus, we had to recognize value as the expression of abstract labor in terms of its qualitative and its quantitative sides. Abstract labor is the *"content"* or *"substance"* which is expressed in the value of a product of labor. Our task is also to examine value from this standpoint, namely from the standpoint of its connection with abstract labor as the "substance" of value."

Rubin I.I, *Essays on Marx's theory of value,* Black Rose Books, New York, P-74

লিখনে কি ঘটে

লিখনের উদ্বৃত্তের পাশাপাশি উদ্বৃত্তমূল্যের তত্ত্ব আলোচনার প্রয়াস সূত্রে আমরা এসেছিলাম উপরোক্ত আলোচনার পরিসরে। মানিকের ও রবীন্দ্রনাথের তর্ক থেকে আমরা বুঝতে পারছিলাম, সাহিত্যের মধ্যে সংযোগের ধারণা থাকে। লেখক সংযুক্ত হতে চায় পাঠকের সঙ্গে, পাঠকও চায় এবং সেটাই লেখকের নিজেকে প্রকাশ করার প্রধান কারণ। পুরনো প্রশ্নটিতেই তাহলে আমরা ফিরে যাচ্ছি যে লেখকের অভিজ্ঞতা আর লেখার মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে কিছু একটা উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে – হিসেবটা ঠিক তুল্য-মূল্য হচ্ছেনা। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই আমরা লেখার কাজটিকে বুঝতে চাইছি। অপরিমেয় যা কিছু থাকছে লেখার প্রক্রিয়ায় – সেটাই তাহলে এক অর্থে লেখার কাজটির প্রাণ। তাহলে লিখন আসলে অভিজ্ঞতার বিষয় বলে এক-পাক্ষিক কোনো অধিবিদ্যক সিদ্ধান্তে আসাটা কাজের কথা নয়। আলোচনার এই অংশ থেকে মূলত আরও দুটি পথ বেরিয়ে আসছে –

এক। উদ্বৃত্তের এই তর্কটিকে কেবল মানিক বা রবীন্দ্রনাথই নন, আরও অনেক লেখক, আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মত করে বলার চেষ্টা করেছেন – তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার।

দুই। লেখকের অভিজ্ঞতা এবং লেখা এই দুয়ের মধ্যে উপস্থিতের অধিবিদ্যা-সূচক কোন বিজ্ঞান কার্যশীল নয় – একথা আমরা বারং বার বলেছি এর আগে আলগোছে – জাক দেরিদার লিখনের দর্শনকে পুনরায় স্মরণ করে আমরা সেই বক্তব্যকে আবার ফিরে দেখব এবং তার সঙ্গে আমাদের আলোচনার যোগ চিহ্নিত করব। মানিক যেখানে বলবেন যে -

"জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না(জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।"[৫৭]

সেই বক্তব্যকে যদি আমরা প্রাথমিক ভাবে চিহ্নতত্ত্বের সন্দর্ভ থেকে বোঝার চেষ্টা করি এবং তার মধ্যে দিয়ে দেরিদার দর্শনে পৌঁছাই তাহলে আলোচনাটি ঠিক কেমন রূপ নেয়? এর মধ্যে দিয়ে আমরা সেই সমস্যাটির একেবারে নিকটে গিয়ে দাঁড়াতে পারি যার জন্য আমরা আলোচনায় রত হয়েছি। স্যসুরের চিহ্নতত্ত্ব কেন প্রয়োজনীয় – কারণ স্যসুর ভাষাতত্ত্বের পরিভাষায় শব্দ ও অর্থের সংযোগ এবং সেই একই তত্ত্বে ভাষা ও বাস্তবতার সংযোগ, বলা চলে কথক ও শ্রাবকের মধ্যেকার সংযোগকে তাঁর আবিষ্কৃত আনুমানিক একটি বিজ্ঞান (চিহ্নতত্ত্ব) দিয়ে আক্রমণ করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। স্যসুরের অনেকগুলি মৌলিক অবদানের মধ্যে এটি অন্যতম অবদান।

---

[৫৭] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স, ১৯৫৭, পৃ - ১২

মূলত এই দুটি দিকেই পরবর্তী আলোচনায় এগিয়ে যাব। লিখন বিষয়ে অমিয়ভূষণ মজুমদারের একটি গ্রন্থ আমাদের মতে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ও বিরল একটি গ্রন্থ, যার নাম 'লিখনে কি ঘটে'। আমাদের মনে রাখা উচিৎ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ হচ্ছে ১৯৯৭ খ্রীঃ, লেখাটি নিশ্চিত ভাবে পূর্বে কোনো একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম একটি গ্রন্থনামের জন্য, একটি বিশেষ কালপর্বের ভূমিকা – খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় আনন্দ পাবলিশার্স থেকে – এই গ্রন্থের মূল্য – স্বভাবতই স্পষ্ট। এখানে লিখন বিষয়ে, সংস্কৃতি বিষয়ে, লেখকের জীবনদর্শন বিষয়ে এবং প্রাগাধুনিক সাহিত্যের ঐতিহ্য নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক কতগুলি প্রবন্ধ আছে। এই গ্রন্থটির কাঠামো অনেকটাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লেখকের কথা' গ্রন্থের কাঠামো নির্ভর। মানিক লেখকের কথায় মার্ক্সবাদী রাজনীতির প্রেক্ষিতে সংস্কৃতি, সাহিত্যের বাজার, পাঠক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন আর অমিয়ভূষণ অন্যদিকে মূলত মনঃসমীক্ষণ, অস্তিস্ত্ববাদ এবং বৃহৎ-অর্থে আঙ্গিকবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে লেখার প্রক্রিয়াটাকে বুঝবার চেষ্টা করছিল। উভয়ের ক্ষেত্রেই অবস্থানের এপাশ ওপাশ থাকলেও গ্রন্থের ধাঁচাটা প্রধানত একই, অমিয়ভূষণ মজুমদার অন্যান্য অনেক সাহিত্য ও লেখকের পাশাপাশি কমলকুমার মজুমদারের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত ছিলেন এবং অমিয়ভূষণ ও কমলকুমার এক অর্থে মার্ক্সবাদ বিরোধী। আপাতত অমিয়ভূষণের প্রবন্ধ আলোচনার পূর্বে একটি কথা স্পষ্ট করে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে নব্বইয়ের ঐ দশকে যখন অমিয়ভূষণ লিখছেন, ততদিনে মানিকের কাল গত, কমলমজুমদারের কিংবদন্তী এবং কৃত্তিবাসও খানিকটা প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, হাংরি আন্দোলন ইত্যাদিরও রমরমা কমে এসেছে, নকশাল আন্দোলন থেকে গড়িয়ে ক্রমে বন্দী-মুক্তি আন্দোলনের দিনগুলো নিভে আসছে, ভারতবর্ষের উদারীকরণের এক নয়া জমানা খুলে যাচ্ছে যেন। এরকম সময় অমিয়ভূষণ তাঁর নিজের অনেকটা বয়সকালে, প্রধানত কোচবিহার কেন্দ্রিক একটি সাহিত্য বলয় থেকে তাঁর আলোচনাগুলি লিখছেন। বলা বাহুল্য তাঁর সাহিত্য তথাকথিত প্রাগাধুনিক ও অনাধুনিক কৌম চেতনায় সমৃদ্ধ কিন্তু তিনি আদৌ গ্রামীণ লেখক ছিলেন না। আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের ধারায় গ্রাম এবং লৌকিক গোষ্ঠীজীবন, তাদের ইতিহাস যেমন অস্তিত্বকে বুঝবার এবং তার সংকটকে প্রকাশ করবার অন্যতম সফল রসদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় – ঠিক সেরকম সচেতন ভাবেই অমিয়ভূষণের সাহিত্য প্রাগাধুনিকতার দিকে ঝুঁকেছিল। কিন্তু সেই সচেতনতা আদতে একটা লেখককে আদৌ তথাকথিত যৌক্তিক চিন্তার অভ্যাসের মধ্যে ধরে রাখে, নাকি রক্ষণশীলতার মর্মে অন্যকোন চিন্তা-বিশ্বে নিয়ে যায় সে বিষয়ে আমরা এখানে কথা বলতে চাইনা, কিন্তু প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে মানিক ও অমিয়ভূষণের গ্রন্থ নামের তফাৎটুকু লক্ষণীয় – লেখালিখি নিয়ে আলোচনা ক্রমে 'লেখকের কথা' থেকে 'লিখনে কি ঘটে'-তে পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ লেখকের কর্তৃত্ব থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ক্রমে লিখন-কে একটি ঘটনা হিসেবে দেখবার উত্তর-গঠণবাদী চোখ বাঙালির তৈরি হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

অমিয়ভূষণ তাঁর অবস্থান এবং বিশ্লেষণ সম্পর্কে অসম্ভব সচেতন ছিলেন। তিনি 'লিখন' কে ঠিক ঠিক উৎপাদনের শর্তে দেখছেন না, দেখছেন ব্যক্তি লেখকের জীবনের একটি ঘটনা হিসেবে। তাই ওনার ক্ষেত্রে ঘটে

শব্দটা খুব জরুরি। 'ঘটনা'-র ধারণাটিতে আমরা গবেষণার পরবর্তী অংশে ফিরব আবার। এককথায় বলা যায়, অমিয়ভূষণের লেখায় , লেখার প্রক্রিয়ায় লেখকের মণঃসমীক্ষণগত আলোচনার গুরুত্ব স্পষ্ট। আগেই লিখেছি অমিয়ভূষণ প্রধানত আঙ্গিকবাদের ঐতিহ্যেই দীক্ষিত ছিলেন এবং প্রাগাধুনিক, সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের ঐতিহ্যে আগ্রহী ছিলেন – তাই তাঁর বিশ্লেষণে সেই উপাদানগুলি স্পষ্ট।

'লিখনে কি ঘটে' গ্রন্থের শিরোনামের লেখাটিতে অমিয়ভূষণ প্রথমেই লিখছেন,

"ইংরেজি 'এসকেপ' শব্দটায় নিন্দাবাচক একটা অর্থ জড়িয়ে গেলেও ও কাজটা না করে আমাদের উপায় নেই। আমরা যে ঘুমাই সেটা জীবন থেকে পালানো। যোগীরা জীবন থেকে পলায়নপর। ভোগীরাও তাই। নাচ, গান, অভিনয়, দেশভ্রমণ সবই এই পলায়নের পর্যায়ে পড়ে।"

এখানে মূলত অমিয়ভূষণ পলায়নের কথা বলছেন। পলায়ন একরকমের নয় বিভিন্ন রকমের এবং পলায়নের তত্ত্ব দিয়েই অমিয়ভূষণ লিখনের চাহিদাকে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন। প্রসঙ্গত মনঃসমীক্ষণের ঈদ বা শোপেনহাওয়ারের উইলের কথা বলছেন। এখান থেকেই তিনি আনন্দের প্রসঙ্গে যাবেন, যে আনন্দ রসতত্ত্বের মূল কথা। কাব্যের আনন্দ, যা প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রের ভাষায় 'ব্রহ্মস্বাদের সহোদর'। সাহিত্যের এই আনন্দকে আরও খানিকটা মিস্টিকভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অমিয়ভূষণ বলবেন,

"সাহিত্যেও আমাদের অনুভূতি, আমরা কি এবং কেনই বা এই রহস্যকে আত্মস্থ করতে চায়।"[৫৮]

অর্থাৎ পলায়ন শব্দের যে আধুনিক ব্যাখ্যা এবং আনন্দের যে প্রাচীন অনাবিষ্কৃত অভিধা, যা সত্ত্বার প্রশ্ন – অমিয়ভূষণের তর্কে সেই প্রশ্নের, এক ধারণা থেকে অন্য ধারণায় বিচরণ লক্ষণীয়। তিনি আরও লিখছেন যে,

"সোশ্যাল মিল্যু-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও, সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তা বলা যায় না। সাহিত্যে এমন কিছু থাকে যা সমাজে থাকেনা...আসলে সাহিত্যের সহিতভাব একটা লক্ষণ মাত্র। সবটুকু নয়। সহিতত্ব আছে বললেই সাহিত্যকে বোঝায় না।"[৫৯]

একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, 'সাহিত্য সমাজের দর্পণ' এই বাস্তববাদী প্রবাদটির বিরুদ্ধে অমিয়ভূষণ একটি অন্য মত রাখার চেষ্টা করছেন। কারণ ওটা হলেই সমাজ ও সাহিত্যের একটা তুল্য মূল্য বিচার হয়, লেখকের নিজের মত যা খুশি লিখবার স্বাধীনতা সামাজিক মিল্যু-র তর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, সেই সূত্রে নিশ্চয়ই তাহলে, "আমরা কি ও কেন"-র খবরগুলিও একইভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সাধারণ অর্থে সাহিত্য মানে সহিতভাব এই তর্কটি থেকে তিনি কিভাবে বেরিয়ে আসছেন?

---

[৫৮] অমিয়ভূষণ মজুমদার, *লিখনে কী ঘটে*, আনন্দ পাব্লিসার্স, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ-৮

[৫৯] তদেব, পৃ-৯

“সাহিত্যকে সার্থক হতে গেলে, আনন্দকে নিশ্চিত করতে গেলে, সমাজই হবে তার স্বপ্নের বিষয়। এবং সমাজ যেমন ঠিক তেমনিভাবে সেই স্বপ্নে থাকবেনা।”[৬০]

মানে সহিতত্ব বা সম্বন্ধের বিষয়টিকে মেনে নিতে অমিয়ভূষণের আপত্তি নেই, কিন্তু সেটা যে আদ্যোপান্ত সামাজিক এটা মেনে নিতে অসুবিধা। তাহলে বাদবাকি মাত্রাগুলি কি অর্থহীন? এই প্রসঙ্গেই, অমিয়ভূষণ স্বপ্নের কথা বলছেন, বলতে চাইছেন, যে সহিতত্বের মধ্যে যে সম্বন্ধের কথা আমরা বুঝতে চাইছি, তার মধ্যে সমাজ ঠিক নৈমিত্তিক হয়েই থাকবে এর কোন মানে নেই, সমাজ যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে বিমূর্ত হয়ে, সাহিত্যের সহিতত্বের পরিসরে প্রবেশ করবে বা নির্মিত হবে – এটাই অমিয়ভূষণের বক্তব্য। ঠিক এই প্রসঙ্গেই মার্গারেট হার্কনেস কে লেখা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস -এর একটি বিখ্যাত চিঠির কথা আমাদের মনে পড়তে পারে, যেখানে এঙ্গেলস লিখছেন যে, একটি সাহিত্য কেবল এই কারণে মহৎ সাহিত্য নয় যে সেটা গরীব মানুষের হয়ে কথা বলছে, বরং সেটা এই কারণেই মহৎ যে সেটা সমাজের যথাযথ রূপটিকে তুলে ধরছে। অর্থাৎ যথাযথ সমাজ নিশ্চিতরূপে নৈমিত্তিক সমাজ হবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং অমিয়ভূষণের চোখ দিয়ে পড়লে, সমাজের যাথার্থ্য অনেক বেশি স্বপ্নিল অন্তত সাহিত্যের পরিসরে তো নিশ্চিতরূপে তেমনটাই হওয়া উচিত। যদি তেমনটা হয় তবেই আমরা তাকে আদত সাহিত্য, যথার্থ সাহিত্য বলতে পারি। ১৮৮৮ খ্রীঃ ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, মার্গারেট হার্কনেসকে যে চিঠিটি লেখেন, সেখানে তিনি লিখছেন –

“I am far from finding fault with your not having written a point-blank socialist novel, a “*Tendenzroman*” [social-problem novel. DM], as we Germans call it, to glorify the social and political views of the authors. This is not at all what I mean - the more the opinions of the author remain hidden, the better for the work of art.”[৬১]

এই প্রসঙ্গ থেকে এঙ্গেলস চলে যান বাস্তববাদের প্রসঙ্গে, যদিও অমিয়ভূষণের সাহিত্যের সংরূপ সেই অর্থে বাস্তববাদী নয় কিন্তু অমিয়ভূষণ ও এঙ্গেলস দুজনেই আসলে সাহিত্যের যাথার্থ্য (সত্য) নিয়ে কথা বলছেন ওনাদের বক্তব্যে, ঠিক সাহিত্যের বাস্তববাদী বা অ-বাস্তববাদী ইত্যাদি সংরূপ নিয়ে কথা বলছেন না। বাস্তববাদী সাহিত্য বাস্তবের কথা লেখে বলেই আসলে সেটা অনেক বেশি সমাজের সত্যকারের, ‘যথার্থ’ চিত্রটা তুলে ধরে। কথা-প্রসঙ্গে বালজাকের সাহিত্যের কথা আসে। সেখানে এঙ্গেলসের প্রধান বক্তব্য হল লেখকের (‘অথর’[৬২] – এর) যা

---

[৬০] তদেব, ১০

[৬১] Fredric Engels and Karl Marx 2010, Lawrence & Wishart Electric Book, Marx and Engels Collected Works : vol 48 - P- 167

[৬২] শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, তার *আলিবাবার গুপ্তভান্ডার* গ্রন্থে কৃতৃত্বশীল লেখকের ধারণাকে নিশ্চল, অনড়, নিথরের ধারণার সঙ্গে সমার্থক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, ইংরেজি Author শব্দের তর্জমা হিসেবে বাংলায়, বাংলা অর্থে ‘অথর’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যার বিপরীত হল কর্তৃত্বহীন লেখক যে কেবল লেখে, সেই লেখকের অর্থ নিয়ে তেমন কোন জুলুম খাটেনা, সে মৃত। এই গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে প্রবেশ করব।

মতাদর্শ সেটাকে ধারণ করা লেখার কাজ নয়, আসলে সমাজবাস্তবতাকে যথাযথ তুলে ধরা – সেটা ধনী শ্রেণীর বাস্তবতাই হোক অথবা গরিব শ্রেণীর বাস্তবতা - সাহিত্যের উদ্দেশ্যই যেন সমাজবাস্তবতার প্রকাশ। অন্যভাবে বললে যাথার্থ সাধন করা (যেটা এঙ্গেলসের মতে সমাজবাস্তবতা, মার্ক্সবাদীদের মতে ওখানেই জগতের সত্য নিহিত)। তাহলে এই মতের সঙ্গে অমিয়ভূষণের মতের যে সূক্ষ্ম তফাৎ তা নিশ্চয়ই স্পষ্ট আমাদের কাছে। অমিয়ভূষণ ও এঙ্গেলস দুজনেই যথার্থ সাহিত্য বিষয়ে তর্ক করছেন কিন্তু অমিয়ভূষণ তথাকথিত সমাজবাস্তবতার সাহিত্য থেকে সরে এসে, আর এঙ্গেলস বলছেন বাস্তবতার দিকে আরও বেশি ঝুঁকে পড়ে (এঙ্গেল ওখানে তর্ক করছেন অত্যধিক মতাদর্শ নির্ভর সাহিত্যের বিরুদ্ধে)। এদের দুজনের তফাৎ ও মিলের অংশটি বড় অদ্ভুত ও সূক্ষ্ম, আমরা আবার আমাদের গবেষণার পরবর্তী অংশে সাহিত্যের এই সত্য বা যাথার্থ্যের প্রসঙ্গে ফিরে আসবো। এই তফাৎটা কেন উঠে এলো তা নিয়ে বিদেশে নানাবিধ তর্ক আছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কয়েকজনের প্রবন্ধেই প্রধানত এই বিষয়টি উঠে এসেছে তার মধ্যে অমিয়ভূষণ মজুমদার অন্যতম (সাহিত্যের ভাষার বোধগম্যতা এবং Communication অর্থে - অমিয়ভূষণ তাঁর গ্রন্থে সংবেদন, সংবিত্তি উভয় শব্দের সঙ্গেই Communication – এর সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন এবং উভয়ের মধ্যেই একইরকমের ধারণা ক্রিয়াশীল সেকথা উল্লেখ করেছেন)। এই বিষয়ে অমিয়ভূষণ লিখেছেন - সংবাদ বহন করা সাহিত্যের কাজ নয় - সংবাদের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু বোঝাতে – তাই তিনি সংবিত্তি বা সংবেদন শব্দগুলিতে তিনি জোর দিয়েছেন। সংবেদনের মধ্যে বেদনার খানিকটা ইঙ্গিতও উপস্থিত। এভাবে অমিয়ভূষণ এই শব্দের খেলার মধ্যে দিয়ে আসলে Communication- এর মূল ধারণাটিকে ধরার চেষ্টা করছিলেন (কারণ অ-জনপ্রিয় একান্তের লেখক হিসেবে অমিয়ভূষণের ক্ষেত্রে Communication-ই সবচেয়ে বড় বিপত্তির কারণ ছিল) এরই সঙ্গে সাহিত্যিকের সামাজিক দায়ের একরকমের সম্পর্ক আছে, তাই সমাজ বিষয়েও অমিয়ভূষণ খুব পরিচিত মত পোষণ করেননি। মূলত যারা কট্টর মার্ক্সবাদী তাদের ক্ষেত্রে এই সংবিত্তির শর্তটি প্রধান হয়ে থাকে - সে বিষয়ে আমরা অবগত। যারা আঙ্গিকবাদী তারা অনেকেই আঙ্গিকের পরীক্ষানিরীক্ষার সূত্রে জনসংযোগহীণ সাহিত্য রচনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে বাধ্য হয় – এটার কারণের সম্ভবত সংবিত্তির তর্কটি আরও প্রবল হয়ে ওঠে এবং অবশ্যই এর মূলে একধরণের ভাববাদী কাব্য-স্বাদের তত্ত্ব অবশ্যই ছিল, অনুমান করে নেওয়া যায়। আমাদের গবেষণায়, সংবিত্তি আলোচনার সূত্রে এই প্রসঙ্গে আমরা পরে ফিরব।

তাহলে যে তফাতের কথা বলছিলাম, সেই তফাৎটিকে গড়ে নেওয়ার জন্য অমিয়ভূষণ মনঃসমীক্ষণের সহায়তা নেন। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের বিখ্যাত একটি লেখা, "Creative writers and daydreaming[৬৩]" –এ ফ্রয়েড লেখকের লেখার প্রক্রিয়া ও দিবাস্বপ্নের প্রসঙ্গে কথা বলেন। লেখক দিবাস্বপ্নের আশ্রয় নেন এবং সেটা বলতে গিয়ে অমিয়ভূষণ নিজের ছবি আঁকার অভিজ্ঞতা, কমল মজুমদারের দু-একটা বৈঠকি তর্কের কথা-প্রসঙ্গ তুলে আনেন এবং পরিশেষে লেখকের সংকটকে ট্রমার একটি তর্কে টেনে নিয়ে যান। যেটা সবিশেষ ভাবে মনঃসমীক্ষণেরই

[৬৩]https://static1.squarespace.com/static/5441df7ee4b02f59465d2869/t/588e9620e6f2e152d3ebcffc/1485739554918/Freud+-+Creative+Writers+and+Day+Dreaming%281%29.pdf

বিষয় (ফ্রয়েডের সঙ্গে সঙ্গে ইয়ুং-এর 'collective unconscious'-এর প্রসঙ্গেও আলোচনা করেন, বাংলা বিদ্যাচর্চা মহলে অনেকক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য তত্ত্বগুলি টুকরো টুকরো ভাবে উড়ে এসে জুড়ে জুড়ে গেছে, নতুন বিশ্লেষণ নির্মাণ করেছে – তার অর্থ এটা নয় যে বাঙালি লেখকেরা সর্বদাই পাশ্চাত্য দর্শন ও তত্ত্ব বিষয়ে ভীষণ সচেতন ছিলেন, বলা যায় এও যেন সেই ধরণেরই আলগোছে ব্যবহৃত দু-একটি তত্ত্ব)। এসবের মধ্যে দিয়ে মূলত তিনি প্রাচ্য আনন্দতত্ত্ব বা কাব্যতত্ত্বের ধারাতেই লিখনকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের যে লেখাটির কথা সদ্য উল্লেখ করলাম, সেই বিখ্যাত লেখাটির বিষয়ে এখানে খানিকটা আলোচনা করা উচিৎ আমাদের –

অনেক কথার মধ্যে ফ্রয়েড যে মূল কয়েকটি কথা বলতে চেয়েছিলেন, তা হল শিশু বয়সের যে খেলার অভিজ্ঞতা থাকে মানুষের (ফ্রয়েডের বক্তব্য অনুসারে মূলত মায়ের দেহের সঙ্গে খেলা) সেই খেলার কোন এক স্মৃতিমেদুরতা থেকেই সৃষ্টিশীল সাহিত্য বা শিল্পের অনুপ্রেরণা আসে। তাই স্মৃতিমেদুরতা বা নস্টালজিয়ার সঙ্গে লেখকের সৃষ্টিশীলতা বা খেলার যে সম্পর্ক তা গভীর। এক অর্থে, লেখক যেন সেই খেলাই খেলে চলে লেখার কাজের মধ্যে দিয়ে। এর সঙ্গে লেখকের নিজেকে প্রকাশের লক্ষ্য বা বাসনা কিভাবে মিলে মিশে যায় তা নির্জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ লেখকের সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে আত্ম-নিমগ্নতার কথা মনে করা হয়, তার মণঃসমীক্ষণগত ব্যাখ্যায় ফ্রয়েডের তত্ত্বে খেলা এবং স্মৃতি বা অভিজ্ঞতার কথা ছিল – এই স্মৃতি এবং লেখার সঙ্গে সত্ত্বা এবং ট্রমা ইত্যাদির সংযোগ আমরা অমিয়ভূষণের লেখায় পাই। এই গ্রন্থেই 'সাহিত্যের ধারণা' বলে একটি লেখায় উনি দর্শনের সঙ্গে সাহিত্যের একটি অদ্ভুত পার্থক্য করেন, জাক দেরিদার 'সাহিত্যিক (literary)'-র আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আবার এই বিষয়ে আলোচনা করব – আপাতত অমিয়ভূষণ লিখেছেন –

'সেজন্যই আত্ম-আবিষ্কার আপাতদৃষ্টিতে দর্শনের "দায়" বলে ভ্রান্তি জন্মালেও মানুষ সাহিত্যের দিকে না ঝুঁকে পারে না...এমন এক বোধ যে, দর্শন ইত্যাদি জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদি দিয়ে তো নিজেকে জানা হল না। সে সব দিয়ে যা জেনেছি তা আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। সাহিত্য সৃষ্টির মূলে হয়তো এ অস্বস্তি থেকে দূরে যাওয়ার চেষ্টা। এবং এটা নিজের মধ্যে যথেষ্ট জটিল একটি প্রক্রিয়া।'[৬৪]

'সাহিত্যিক জীবন মহাশয়' লেখাটিতে দেখা যাবে, অমিয়ভূষণ বলছেন যে, জীবনমহাশয় –

"হয়ত মধু সাধুখাঁর মতোই নিঃসন্দেহে হারামজাদা এবং তা সাতিশয় মাত্রাতেই।" '[৬৫]

---

[৬৪] অমিয়ভূষণ মজুমদার, *লিখনে কী ঘটে,* আনন্দ পাব্লিসার্স, কোলকাতা, ১৯৯৭, পৃ- ৭৫

[৬৫] অমিয়ভূষণ মজুমদার, *লিখনে কী ঘটে,* আনন্দ পাব্লিসার্স, কোলকাতা, ১৯৯৭, পৃ- ৭৪

অর্থাৎ এর মধ্যে রহস্য, প্যাঁচ এবং খেলার হদিশ আছে। এটাই অমিয়ভূষণ বার বার ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। যেমন তাঁর 'মধু সাধুখাঁ' লেখাটির ক্ষেত্রে, তিনি একটা বৈরাগ্য-মিশ্রিত রহস্য ও খেলার চিত্র এঁকেছেন যা 'মধুর দুঃখের গভীরে বিরাজমান - ঠিক তেমনটাই জীবন বিষয়েও তাঁর মত যেন।

তাহলে সাহিত্য লেখা, জীবন থেকে (সামাজিক) সাহিত্যিকের একপ্রকারের পলায়ন – এই বক্তব্যটি থেকে মনঃসমীক্ষণগত ভাবে দিবা-স্বপ্ন এবং ট্রমার প্রসঙ্গ আসে (যে বিষয়ে উনি লাকাঁ-র কথা উল্লেখ করবেন)। এর সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত মিস্টিক তত্ত্ব-প্রসঙ্গের তুলনা – এটাই ছিল অমিয়ভূষণের মূল বিশ্লেষণের পরিধি। কিন্তু যে প্রসঙ্গটি থেকে আমরা অমিয়ভূষণ মজুমদারের আলোচনায় এসেছিলাম তা ছিল উদ্বৃত্তের প্রসঙ্গ। অমিয়ভূষণের এই তর্কের মধ্যেই কি সেই উদ্বৃত্তের প্রশ্ন নিহিত? অমিয়ভূষণ এই প্রসঙ্গে তাঁর "সাহিত্যের ধারণা" নামক লেখাটিতে স্পষ্ট করে লেখেন –

"অন্তরে প্রয়োজনের বেশি বাড়তি খানিকটা কিছু আছে বলেই সাহিত্য করা। সেই বাড়তি কিছুর স্বরূপ নির্ধারণ কঠিন তো বটেই, কিন্তু বাড়তি কিছু থাকলেই তা সাহিত্যের দিকে টানবে বা ঠেলে দেবে এমন নিশ্চয়তা দেখছিনা।"[৬৬]

এখানে এসে অমিয়ভূষণের কথাটা অনেকটাই মানিকের কাছাকাছি চলে আসে - যে বাড়তি কিছু থাকাটা বৈজ্ঞানিক বা অন্য যে কোনো দিকেই নিয়ে যেতে পারে। ওনার মতে, এই বাড়তি কিছুই পথে চলার শক্তি যোগায়। তাহলে যদিও মনঃসমীক্ষণের এবং মিস্টিক যোগবাদের দুয়েকটি তর্কের মধ্যে দিয়ে অমিয়ভূষণ ওনার যুক্তিগুলিকে সাজিয়েছেন তবু ওনার মূল কথা আসলে উদ্বৃত্ত বিষয়ক। অমিয়ভূষণের 'লিখনে কি ঘটে' গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক আরও দুটি তর্ক আছে – একটি হল সংবিত্তির তর্ক অপরটি হল নীতির তর্ক। এই দুয়ের কিছুটা আমরা প্রসঙ্গক্রমে ছুঁয়ে গেলাম, পরবর্তী অধ্যায়ে অন্য আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত বিষয়গুলিতে আমরা আবার ফিরে আসবো।

দেরিদা ও লিখনের দর্শন

বাংলা ভাষায় যে কয়েকটি গ্রন্থ দেরিদা বা দেরিদার দর্শন নিয়ে সবিস্তারে কাজ করেছে, তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ডঃ অনির্বাণ দাশের সম্পাদিত 'বিনির্মাণ/অবিনির্মান' নামক গ্রন্থটি। এছাড়া শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ''আলিবাবার গুপ্তভান্ডার' গ্রন্থটিতে বাংলা ভাষায় দেরিদা ও উত্তরগঠনবাদ চর্চার একটি পরিচ্ছন্ন মানচিত্র তুলে ধরেছেন। আপাতত সেখান থেকেই কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা যদি তুলে ধরি তাহলে আমাদের আলোচনায় - দেরিদার, লিখনের ধারণা বাংলা ভাষায় পরিস্ফুট করতে সুবিধা হবে। অধ্যায়ের এই অংশে এসে আমাদের সেই চিন্তককে

[৬৬] অমিয়ভূষণ মজুমদার, *লিখনে কী ঘটে,* আনন্দ পাব্লিসার্স, কোলকাতা, ১৯৯৭, পৃ- ৭৫

নিয়ে আলোচনা করা উচিৎ, যার দার্শনিক তত্ত্বের উপরেই আমাদের গবেষণার লিখনতত্ত্বের বেশিরভাগ অংশটুকু নির্ভরশীল। জাক দেরিদা, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রখ্যাত একজন ফরাসী চিন্তাবিদ, তাঁর দর্শনের প্রধান ধারা এনমুন্ড হুসার্ল, মার্টিন হেইডেগার প্রমুখের সূত্রধরে যাকে পাশ্চাত্য দর্শনের পরিভাষায় বলে Phenomenology বা অবভাসবিদ্যা – সেই ধারার দর্শনের অনুগামী ছিল। যদিও দেরিদা, দর্শনকে তার নিজের সীমাবদ্ধতার বাইরে ঠেলে দিয়ে – প্রায় সমস্ত জীবন ধরেই নানাবিধ বিষয় নিয়ে লেখালিখি করেছেন। যে বিষয়গুলির মধ্যে প্রধানতম একটি বিষয় হল লিখন। এক অর্থে দেরিদাকে লিখনের দার্শনিক বললেও অত্যুক্তি করা হয় বলে মনে হয়না। ঠিক সেই কারনেই 'ভাষা' কিংবা 'ভাষাতত্ত্ব' বিষয়ে, নানান গ্রন্থে আরও নানাবিধ দার্শনিক কিংবা অদার্শনিক আলোচনা থাকা সত্ত্বেও(মার্টিন হাইডেগার, ওয়াল্টার বেঞ্জামিন – ইত্যাদি আরও অনেকের) আমরা প্রধাণত জাক দেরিদার লেখা এবং দর্শন নিয়েই আলোচনা করছি। এই ক্ষেত্রে দেরিদার লেখার প্রতি আমাদের সবিশেষ মনযোগী হওয়ার সিদ্ধান্তকে আমরা – নির্দিষ্ট অর্থে লিখনের দর্শনের প্রতি আমাদের যথাযথ কর্তব্যপরায়নতা হিসেবেই বিবেচনা করতে পারি।

দেরিদা, প্লেটো থেকে শুরু করে পাশ্চাত্যের সম্পূর্ণ দর্শনের মধ্যেই 'উপস্থিতের বিজ্ঞান'-কে কর্তৃত্ব করতে দেখেছিলেন এবং লিখনের স্থান, সর্বদাই যেন গৌণ, লিখনের তেমন মর্যাদা যেন কোথাও নেই তেমন একটা তর্ক খুঁজে পেয়েছিলেন। অধিবিদ্যা – যাকে দেরিদা উপস্থিতির বিজ্ঞানের সঙ্গে এক করে দেখবেন তাকে উপস্থিতির যুক্তি-ক্রমে সাজিয়ে দেরিদা নিজের পূর্বপক্ষ হিসেবে দাঁড় করান। দেরিদার পূর্বপক্ষের ক্রমটা কতকটা এরকম ছিল[৬৭] -

এক। স্পিচ বা কথন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনে একটা প্রাধান্যের সংস্কার আছে। কথনের প্রাধান্যই চলে এসেছে এক অর্থে বললে।

দুই। আত্ম-উপস্থিতি বা আত্ম-পরিচিতিও যদি বলি তা সেই সংস্কারের উপরেই দাঁড়িয়ে – মুখের কথাতেই সেই স্বরিত চিহ্নের উপস্থিতি এর মধ্যে যেন একটা মুহূর্তের বোধ আছে। অর্থাৎ কথা যেন – এই মুহূর্তের কিছু একটা।

তিন। 'আত্ম-উপস্থিতি'-র সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলে কথনের বাক সত্তার কেন্দ্রে - সত্ত্বার সঙ্গে লিখনের সম্পর্ক যেন সন্দেহজনক।

চার। কথন শুদ্ধ আর লিখন কেবলমাত্র তার বাহন মাত্র। ঠিক এরকম একটি যুক্তির কথা আমরা মানিকের লেখায় পেয়েছিলাম, যেখানে মানিক বলেছিল লেখা অভিজ্ঞতা নির্ভর। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা মুখ্য, লেখা গৌণ বা তার বাহন। অন্য একজনকে অভিজ্ঞতা পাইয়ে দেওয়া ছাড়া একটা মাধ্যম হয়ে ওঠা ছাড়া যেন লেখার নিজস্ব কোনো অবস্থান নেই। কাজেই একই সংস্কার বসত পাশ্চাত্য দর্শনে কথনের সঙ্গে সত্যকে এক করে দেখা হত আর লিখন ছিল

[৬৭] Spivak Gayatri, (Preface) *Of Grammatology,* John Hopkins Press, London, 1997.

নকল নবিশি, নষ্ট, দুষিত। এই প্রবণতাকেই স্বরকেন্দ্রীকতা বা phono-centrism বা একই অর্থে logocentrism বা বাককেন্দ্রীকতা বলা যায়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর দর্শনে, অ্যারিস্টটলের তর্কে, ইউরোপের আঠারো উনিশ শতকের অন্যতম চিন্তক রুশোর লিখন সম্পর্কে বক্তব্যের মধ্যেও তীব্র বিরূপতা ছিল।

'কথনের প্রতিস্থাপন ভিন্ন আর কিছুই নয় লিখন; অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড যে লোকে মূল বস্তুর চেয়ে মূল বস্তুর নকলের অনুধাবনে বেশি যত্ন নেয়'।[৬৮]

স্যসুর তাঁর শ্রেণীকক্ষেও লিখন বিষয়ে খুব একটা সু-নজর রাখতেন না। লিখন নিয়ে আস্ফালনের কোনো হেতু আছে বলে তিনি মনে করতেন না। লিখনের ফাঁদে ভাষা-তাত্ত্বিকেরা বার বার পড়েন। কিন্তু তারা ভুলে যান যে, লিখতে শেখার আগে মানুষ বলতে শেখে।

কথনের ক্ষেত্রে বক্তা ও শ্রোতার তাৎক্ষণিক উপস্থিতির অবকাশ থাকে কিন্তু লিখনের ক্ষেত্রে সেটা অনুপস্থিত। এই মূল অধিবিদ্যক বিন্যাসেই গঠিত হয় কথন-লিখন যুগ্মপদের পারস্পরিক বৈপরীত্য - অর্থাৎ একটি কথার উৎপত্তি এবং কথার বিলুপ্তি বা গন্তব্যে পৌঁছানো। যেন কথনেই নিখাদ চিন্তার নিঃসরণ সম্ভবপর একমাত্র। ঠিক যেন প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম/সাংস্কৃতিকের একটা বিভাজন। যেমনটা লেভিস্ট্রসের নাম্বিকওয়ারা জনজাতির অনুসন্ধানের মধ্যে ছিল। একধরণের বিশুদ্ধ শিশুত্বের অনুসন্ধান যা নাগরিক কৃত্রিমতার হিংসায় বিকৃত হয়ে পড়েনি, নৃতত্ত্ববিদ্যার সেই শিশুত্ব ও হিংসার বৈপরীত্যকেও দেরিদা অকৃতকার্য করেন তাঁর গ্রামাটোলজি গ্রন্থে।

স্যসুরের আলোচনায় বাচনের বা কথনের প্রাধান্য কেন তার কারণ খ্রিস্টবাদ, প্রাচীন দর্শন বা অধিবিদ্যা এবং মূলত ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসের মধ্যেই আছে। কিন্তু কথনকে সংস্কারবশত প্রাধান্য দিলেও আগেই লিখেছি স্যসুর চিহ্নের স্বরূপ নির্ধারণের প্রসঙ্গে ভেদ এবং আপতিকতাকে এবং উভয়ের সম্পৃক্ততাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বাচন বা পারোল তাঁর আলোচনায় গৌণ ছিল। একটা স্ববিরোধিতার চিহ্ন যেন স্যসুরের কাঠামোবাদের মধ্যেই আছে। এই তর্ক থেকে ফোনিম ও গ্রাফিমের তর্কে নামলে দেখা যায় – এমন কোন ফোনিম নেই যা গ্রাফিমের দ্বারা সংস্কৃত নয় অর্থাৎ উভয়ের সমান উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। তাহলে যে নির্ভেদের কথা কল্পনা করা হয় চিহ্নতত্ত্বে তার মৌলিক তত্ত্বায়ণ আছে লেশ (Trace) –এর তত্ত্বের মধ্যে। লেশ কি? লেশ আসলে অনুপস্থিতের উপস্থিত অভিজ্ঞান। একভাবে যেন লিখনের একটা ব্যাপ্তির মধ্যে দিয়ে আমরা এই সম্পর্ককে বুঝতে পারি। যেন ঐ লেশের মধ্যে দিয়েই ভেদগুলি অসম্ভব এক স্থগন খুঁজে পায়। স্থগন শব্দটি দেরিদার লেখায় দিফেরাঁস (differance) পরিভাষায় উল্লেখিত। এটা দেরিদার নিজস্ব একটি আবিষ্কার যা তিনি চিহ্ন ও চিহ্নকের ভেদ-তত্ত্বের বি-নির্মাণ কার্যের মাধ্যমে উদ্ধার করে আনেন। রুশো এবং স্যসুরের স্বরকেন্দ্রীকতার একটি বড় দিক ছিল উচ্চারণের যথার্থ। সঠিকের দাবি। যার বিরুদ্ধে দেরিদা একটা বেঠিক বানান কে লিখে ফেলে জেহাদ ঘোষণা করেন এবং অধিবিদ্যার

---

[৬৮] শিবাজী বন্দোপাধ্যায়, *আলিবাবার গুপ্তভান্ডার : প্রবন্ধ সংকলন*, গাঙচিল , কোলকাতা , ২০০৮

উপস্থিতি বিজ্ঞানের দাবিকে আঘাত করেন লেশ তত্ত্বের মাধ্যমে। এই লেশের সঙ্গে, সিগমুন্ড ফ্রয়েডের স্মৃতি-লেশের ধারণার সংযোগ গভীর। দেরিদার প্রাসঙ্গিক লেখাটির কথা মনে করা যায় এখানে – 'Freud and then Scene of Writing'. সেই সূত্রে ফ্রয়েডের 'Creative writers and daydreaming' লেখাটিকে ফিরে দেখা সম্ভব। তাহলে এই যে সর্বব্যাপী এক সাধারণ লিখনের ধারণা যাকে দেরিদা নৃতত্ত্বের আলোচনায় সাধারণ প্রত্ন-হিংসার সঙ্গে তুলনীয় মনে করেছিলেন – লিখনের ক্ষেত্রে তা যেন – প্রত্ন-লিখন (arche-writing)। এই লিখনের সঙ্গে উৎসের ধারণার সম্বন্ধ কখনোই একরকমের নয় – সেটা দেরিদার হুসার্ল বা হেইডেগার সংক্রান্ত আলোচনায়ও দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া মার্ক্সের অন্টোলজি সংক্রান্ত আলোচনায় দেরিদা প্রেতের প্রসঙ্গে প্রবেশ করেন – সেখানেও লেশের[৬৯] প্রসঙ্গ উঠে আসে। দেরিদার এই নানাবিধ পরীক্ষা-নীরিক্ষামূলক দার্শনিক ধারনাগুলি যেন একই গোত্রের অনেকগুলি ধারণা-রূপক। আগেই বলেছি দেরিদা দর্শনকে সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে ঠেলে ক্রমাগত নানাবিধ বিষয় নিয়ে ঘোরতর দার্শনিক নিরীক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

রোঁলা বার্থ তাঁর Communications 4 –এ লিখেছিলেন যে স্যসুরের প্রস্তাবকে ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি প্রমাণ করবেন চিহ্নতত্ত্ব আসলে ভাষাতত্ত্বেরই অঙ্গ। কিন্তু দেরিদা এটাকেও ভাষাতত্ত্বের অধিবিদ্যক পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করবেন। দেরিদার মূল প্রকল্প ছিল সেমিওলজির আলোচনা তথা সমালোচনার মধ্যে দিয়ে, সেমিওলজির প্রেক্ষিতে গ্রামাটোলজির তর্ককে দাঁড় করানো। গ্রামাটোলজি সেই অর্থে কোন বিরুদ্ধতা নয়, বিনির্মিতির এক ধরণের সাংকেতিকতা বলা যেতে পারে একে, যদিও লিখনের বিজ্ঞান কথাটিকে একভাবে ভাবতে চেয়েছিলেন তিনি এই বিষয়ে – যাইহোক, এটা আপাতত আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। মানিক যে ব্যপকশব্দার্থক সম-ভিত্তির তর্ক ধরে অভিজ্ঞতা ও লিখনের অধিবিদ্যক বিজ্ঞানের সম্পর্ক-টানার চেষ্টা করছিলেন – তার মধ্যে বিপরীত যুগ্মপদের খেলা ছিল। এটাই উপস্থিতির বিজ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্য যে ওটা আসলে বৈপরীত্য এবং উঁচু-নিচুর ভিত্তিতেই কাজ করে চলে। যে বৈপরীত্য logos এবং script –এর মধ্যে বা phoneme এবং grapheme এর মধ্যে কাজ করে চলেছে। এরকম ভাবে দেখতে গেলে সমস্ত বয়ানই বিপরীত-যুগ্মপদ দ্বারা ভারাক্রান্ত। কিন্তু এই সংস্কার-চালিত বয়ান-বিশ্বে যেখানে সকলই কোনো না কোনো অসামঞ্জস্যের উপর নির্ভরশীল এবং এরই মধ্যে দিয়ে সন্দর্ভের কেন্দ্রে যেন কিছু একটা এবং পরিধিতে অপর-কিছু একটা সর্বদাই খেলা করে চলেছে। এই দ্বৈতের চলন কোথায় গিয়ে প্রতিহত হচ্ছে সেই Aporia খোঁজাই আসলে দেরিদীয় পাঠের নীতি। এই অ্যাপরিয়া আবশ্যিক। কারণ এটাই প্রমাণ করে বারং বার যে অধিবিদ্যা 'উপস্থিতের বিজ্ঞান'-এর মধ্যে দিয়েই বিন্যস্ত। একভাবে বললে যে শর্তে কোনো একটা কিছু সংগঠিত, নির্মিত তার কাঠামো থেকে তার কেন্দ্রী-কৃত ধারণাগুলির বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানোই বিনির্মাণের কাজ।

---

[৬৯] Derrida Jacques, (Trans. By Peggy Kamuf), (Chapter 5) *Specters of Marx: The State of Debt, The work of Mourning and the New International,* Rutledge, London.

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় দেখাবেন যে – মূলত একটা গেরিলা পদ্ধতির পাঠ-প্রক্রিয়া, একটা নেতিবাচক সমালোচনার ভঙ্গী বা সদর্থক কোনো বিশ্ব-ব্যবস্থা উপহার না দিতে পারার ক্লান্তি থেকে সমালোচনাকে বার বার অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে নীটশীও কোনো একটা ধাক্কায় গিয়ে উপনীত হতে হবে। এ প্রসঙ্গে নানাবিধ তর্ক পরবর্তীকালে হয়েছে - যে বি-নির্মানবাদী পাঠ কিরকম হতে পারে ইত্যাদি। কথাটা মূলত পাঠ এবং পাঠকের তর্কের দিকেই সরে গেছে। উত্তরকাঠামোবাদী চিন্তকদের মধ্যে মরিস ব্লাশোঁ এবং আরও দুয়েকজন লেখকের লেখায় সরাসরি অথর (author) সংক্রান্ত আলোচনা উঠে আসে – কিন্তু সংখ্যায় সেগুলি তুলনামূলক ভাবে অনেকটাই কম। আমাদের আলোচনায় মূলত দেরিদার চিন্তাই প্রাধান্য পাবে। কিন্তু দেরিদার লিখনের ধারণা থেকে আমরা খানিকটা পরিচ্ছন্ন - হতে পেরেছি যে লেখা বলতে আমরা ধারণাগত ভাবে ঠিক কি বুঝছি। মানিক, রবীন্দ্রনাথ বা অমিয়ভূষণের আলোচনা থেকে যে তর্কটা উঠে এসেছিল সেই আলোচনার আরও খানিকটা দার্শনিক ভিত্তি অনুসন্ধান করা গেল এই অংশে।

শ্রমের পরিমাপের অক্ষমতা, অপরিমেয় অসম্ভব কোনো সংযোগ, সংযোগের প্রশ্নকে – গ্রামাটোলজির দিকে দিয়ে দেখলে তা যেন একভাবে লেশে-র সম্ভাবনায় উন্মোচিত হওয়ার অবকাশ রাখে - পাঠকের জন্য বি-নির্মাণবাদী পাঠ কেমন হতে পারে তার রূপরেখা আমরা দেরিদার নানা লেখায় পেয়েছি (তাঁর সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনায় বেশি করে পেয়েছি বলা চলে)। তাঁর দর্শনে ব্যাপক ও সামান্যার্থে লিখনের মানে – লেশ, প্রত্ন-লিখন ইত্যাদি। প্রধানত এই ধারণাই উত্তরকাঠামোবাদী চিন্তায় লিখনের ধারণার সূত্র। লিখন যেন একপ্রকারের 'লেশ' - অনুপস্থিতের উপস্থিতি। ঠিক যথাযথরূপে অধিবিদ্যক কিছু নয়। দেরিদার এই লিখনের ধারণা অনেক বিস্তৃত – সেকথা আগেই বলেছি। যেমন উনি একটি সাক্ষাতকারে লিখেছিলেন,

"অবশ্য আপনি যদি পাঠকে একটা বই বা পাতার ওপর লেখা কিছুতে পর্যবসিত করেন, তাহলে ক্রিয়া নিয়ে সমস্যা হতে পারে"[৭০]

তেমনি লিখনকেও দেরিদা কখনই ব্যক্তিগত লেখকের কলম দিয়ে পাতায় অক্ষর লেখা অর্থে ভাবেননি বা স্বভাবে সীমাবদ্ধ করেননি। তাঁর মতে লিখন – শিল্প, সাহিত্য, সিনেমা, প্রযুক্তি সর্বত্রই ব্যাপ্ত এক দার্শনিক সম্ভাবনা। এই ব্যাপ্ত লিখনের ধারণা আসলে আমাদের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি-লেখকের সংকীর্ণ যা যা সমস্যা, একজন তথাকথিত সৃষ্টিশীল লেখকের যে কাজ, প্রকারান্তরে তাকে এবং তার মধ্য দিয়ে কাজের সত্ত্বা-বিজ্ঞানকে অনেকখানি বুঝতে সাহায্য করে।

[৭০] অনির্বাণ দাশ, (সম্পা.) *বাংলায় বিনির্মাণ/অবিনির্মাণ*, অবভাস, কোলকাতা, ২০০৭, পৃ - ৪৫৩

চিহ্ন ও মূল্যের তর্ক

সাহিত্যিক ও পাঠকের সম্পর্ককে, শব্দ-অর্থের সম্বন্ধকে – রবীন্দ্রনাথ, মানিক, অমিয়ভূষণ থেকে ক্রমে আমরা চিহ্নতত্ত্ব ও গ্রামাটোলজির তর্ক দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম। এখানে প্রসঙ্গক্রমে আমরা মার্ক্সের মূল্যের তর্ককে ছুঁয়ে গেছি – যেটা ছিল মূলত শ্রমের দিক থেকে মূল্যের বিচার। কিন্তু এই তর্কের আরেকটি দিক - যা কিনা, ভাষার দিক - স্যসুরীয় তত্ত্বের মধ্যেও সেখানে মূল্যের প্রসঙ্গ উপস্থিত। বাংলায় যে গ্রন্থগুলি চিহ্নতত্ত্ব বা স্যসুর বিষয়ে আলোচনা করেছে – তাদের ক্ষেত্রে মূল্যের প্রসঙ্গ ততখানি প্রাধান্য পায়নি বলেই আমার ধারণা। আমরা এখানে সে বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে কিছুটা আলোচনার প্রচেষ্টা করব -

Vicki Kirby তাঁর 'Telling Flesh: The Substance of the Corporeal' – গ্রন্থের 'Corporeal Complexity' – অংশে, স্যসুরের 'value' – বিষয়ে আলোচনা করেছেন। উনি লিখছেন –

' Saussure opens his discussion of value by distinguishing it from what is commonly called "signification". Explaining why the two terms should not be regarded as synonyms, Saussure argues that although the French *mouton* has the same signification as the English "sheep", they do not share the same value. In part, their difference derived from that fact that English has a second word, 'mutton', to describe the meat in its culinary state. Consequently, use of the word "sheep" will be limited by the existence of this other word "beside it", whereas the French word *mutton* will not be similarly qualified.

Signification describes the internal workings of the sign that conjure its semantic or denotational sense "when we look upon the word as independent and self-contained"(Saussure 1974: 114). We might think of it as a sort of use value that is distilled from the general exchange of language. But, the heuristic necessity that posits the sign's integrity is, paradoxically, dependent upon "a system of independent terms in which the value of each term results solely from the simultaneous presence of the others" (114).'[৭১]

Vicki Kirby – আরও লিখছেন,

'For Saussure, signification is both distinct from value and determined or comprehended by it… After all, although we may forfeit the comfortable fact of the sign's identifiable integrity, the larger abstraction of "the system" surely recuperates the notions of unity and identity. Consequently, the radical import of the Saussurian project is to understand these concepts of reference, signification and identity and assumptions that ordinarily derive from them, in another way. If "in language there are only *differences without positive terms*" (Saussure 1974 : 120), if "differences carry signification" and "sign function… not through their intrinsic value but

[৭১] Kirby Vicki, *Telling Flesh : The Substance of the Corporeal*, Rutledge, New York, 1997, P - 27

through their relative position" (118), then it may be granted that language involves something more than the concept "representation" normally implies'[৭২]

এখান থেকে ভিকি তাঁর নিজস্ব আলোচনার দিকে চলে যাবেন, চিহ্নের শারীরিক বাস্তবতা ওনার গ্রন্থের লক্ষ এবং তার জটিলতা বিষয়ে তিনি পাঠককে বার বার সচেতন করেছেন ওনার আলোচনায়। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উনি স্যসুরের মূল্য বিষয়ে প্রধান বক্তব্যগুলিকে গুছিয়ে লিখছেন উপরের অংশটিতে। উপরের অংশটির মধ্যে একভাবে - পরিচিতি, চিহ্নায়ন এবং একাত্মতার কথা আলোচিত হল – আমাদের মনে পড়তে পারে আমাদেরই আলোচনার তিনটি ধারণা – প্রকাশ, লেখার বোধগম্যতা/আস্বাদন এবং সংযোগ। এই তিনটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। একটা নির্দিষ্ট প্রকাশ - নির্দিষ্ট কিছুকে নির্দেশ করতে চায় ভাষার মাধ্যমে কিন্তু ভাষা এমন একটা আধার যা নিজেই নিজেতে একটা খেলাস্বরূপ , ফলত সেই প্রকাশের নির্দিষ্ট আস্বাদন ততোধিক জটিল এবং অসম্ভব – আর এই লীলার উন্মোচনেই সম্বন্ধের বা সংযোগের অবস্থান। রবীন্দ্রনাথ যে যোগকে দৈবিক বলতে চাইবেন এবং মানিক যে শ্রমকে অপরিমেয় বলতে চাইবেন প্রকারান্তরে অমিয়ভূষণের, উদ্বৃত্তের ধারণার বিশ্লেষণাত্মক ব্যঞ্জনা যা হয়ে দাঁড়ায় । সেরকমই যেন শ্রমের অপরিমেয়তার প্রসঙ্গ - আবার সেটা স্যসুরের মূল্যের তর্কেও একইভাবে যেন উঠে আসছে।

যেন পাশাপাশি আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের একভাবে মনে হচ্ছে - বিরোধ, বিতর্ক দ্বন্দ্ব আবশ্যিক ভাবেই থাকবে এবং আছে, তথাপি উল্লেখিত প্রতিটি প্রতর্কে একই প্রকারের ইশারা বিষয়ে আমরা কৌতূহলী না হয়ে পারিনা। তর্কের চরিত্রটি যে একই রকম তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না। স্যসুর নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে "Signification"- কথাটি আমরা বারং বার দেখতে পাই, ভিকি যেভাবে তাকে তুলে ধরছেন, তাতে করে শব্দার্থতত্ত্বের শব্দ ও অর্থ এই বিভাজনে "Signification" বা চিহ্নায়নকে বোঝা যাবেনা – সেটাই স্যসুরের প্রধান বক্তব্য, অর্থাৎ শব্দ আসলে অর্থের উপস্থাপনা বা "Representation" – এভাবে বললে বিষয়টি বুঝতে আমাদের সমস্যা হবে। হয়ত এখান থেকেই বলা যায় যে, "Signification" এবং "Resonance"-এর ধারণা মূলত একই – এই অর্থে এটা তথাকথিত "Reflection"-এর ধারণা থেকে আলাদা। শুরুতেই আমরা যে "Reflection" ও "Resonance"-এর তফাৎ বিষয়ে চিন্তা করছিলাম – সেটারও একরকমের ব্যাখ্যা এখানে এসে আমরা হয়ত পেতে পারি। একই সঙ্গে "Signification"-এর মধ্যে দিয়েই যে মূল্যকে নিশ্চিত করে ফেলা যাবে এটা ভিকি বলতে চাননা, বরং তার উল্টোটাই বলতে চান – যে স্যসুর "Signification" বা চিহ্নায়নকে চিহ্নের টুকরো টুকরো একক ও পৃথক পৃথক মূল্যগুলির সঙ্গে এক-গোত্রে পাঠ করতে রাজী ছিলেন না। যেন ঐ মূল্যগুলির পাশাপাশি সমান্তরাল অবস্থান আছে এবং মূল্যের প্রশ্নটিকে আবার একইভাবে দেরিদার ভাষায় 'উপস্থিতের অধিবিদ্যক বিজ্ঞান' দিয়ে বুঝে ফেলা সম্ভব নয়, বরং মূল্যের এই টুকরো ও সাধারণীকরণের প্রক্রিয়ার মাঝেই সম্বন্ধের অনাবিষ্কৃত

[৭২] Ibid - 29

বিজ্ঞান ক্রিয়াশীল বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু এই সম্বন্ধের বিষয়টি স্যসুরের তর্ক অনুসারেই নেতির শর্তে ঘটে চলে, সেই অর্থে মূল্যের সাধারণীকরণ বা সর্বোচ্চ কিছুর ক্ষেত্রে এই নেতির সক্রিয়তা তথা নিষ্ক্রিয়ের প্রতি কোন এক প্রক্রিয়ার বহমানতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। কিন্তু সে অনেক বেশি গভীর প্রশ্ন এবং আমাদের তর্কের ক্ষেত্রে ততখানি প্রয়োজনীয় নয় আপাতত। স্যসুর ও দেরিদার মধ্যবর্তী আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা বরং সাধারণ ভাবে সাহিত্য বা ভাষার ক্ষেত্রে শব্দ ও অর্থের যে সম্পর্ক তার মধ্যে দিয়ে আমাদের মূল্যের তর্ককে তার নিজস্ব জটিলতায় খানিকটা বুঝবার চেষ্টা করলাম। এও বুঝতে পারলাম যে প্রাচ্য-কাব্যতত্ত্ব, বাস্তববাদী বা সমাজবাস্তবতাবাদের 'যথার্থে'র তর্ক, মনঃসমীক্ষণ এবং যোগসাধনার মিস্টিক তত্ত্বের মধ্যেও যেন মূল্যের তর্কের প্রায় একই রকমের বিন্যাস লক্ষণীয়। মূল্যের তর্ক বিষয়ে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আবার ফিরে আসব – আপাতত কেবল, নেতির প্রসঙ্গটি উল্লেখিত থাকলো, দেরিদার দর্শনে তথাকথিত শব্দার্থের ধারণার সঙ্গে মূল্যের সম্বন্ধকে বোঝার ক্ষেত্রে এই আলোচনাটি ভীষণই প্রয়োজনীয়।

এছাড়া যদি আমরা আলোচনা করি সাহিত্যিকদের 'লেখা' বিষয়ক ধারণা নিয়ে (তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে আমরা এই বিষয়ে বিষদে আলোচনা করব – কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ কিংবা মানিক বা অমিয়ভূষণ দিয়েই নয়, আমরা চেষ্টা করব আমাদের গবেষণার আলোচনাটিকে 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য মুখ্য লেখকদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সংলাপে নেমে বিচার করার) তাহলে দেখতে পাই - প্রায়শই তাঁদের কাছে 'লেখা' আসলে, 'সাহিত্যে'র অনুরূপ কোন একটা বোধ বহনকারী শব্দ। আবার লিখনের যে বৃহৎ সম্ভাবনার কথা জাক দেরিদা তাঁর দর্শনে চিহ্ন-বিদ্যার প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন, সেখানে লিখন বহু-ব্যাপক কোন সম্ভাবনা, কেবলমাত্র সাহিত্যিক কিছু নয়[৭৩]। তাহলে এই তুচ্ছ অর্থে লেখা এবং বৃহৎ অর্থে লিখনের ভিতর বা সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদির অবস্থান। লেখা অথবা কেরানির খাতা লেখা এবং ব্যাপক অর্থে লিখনের মধ্যে কি তফাৎ আছে কোন? এই প্রশ্নটা বাধ্যতামূলক ভাবে আসে যখন আমরা দেরিদার আলোচনার দিকে তাকাই। উনি বরং প্রশ্ন করতে চান – লেখা অনেককিছুই - তাহলে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, কোনো লেখার মধ্যে সাহিত্যিক এমন কি থাকে যাতে করে ঐ বিশেষ লেখাকে আমরা সাহিত্য বলি আর অন্যগুলিকে বলিনা ? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পরিসর এখানে নেই, এটুকু মনে রাখা প্রয়োজন যে দেরিদার দুটি ধারণা - এখানে জরুরি – একটি হল লেখার সংকীর্ণ অর্থনীতি থেকে সাধারণ অর্থনীতিতে উন্মোচিত হওয়ার ধারনা যেটা উনি ওনার 'রাইটিং এন্ড ডিফারেন্স' গ্রন্থের জর্জ বাতাই

---

[৭৩] "Now we tend to say "writing" for all that and more: to designate not only the physical gestures of literal pictographic or ideographic inscription, but also the totality of what makes it possible; and also, beyond the signifying face, the signified face itself. And thus, we say "writing" for all that gives rise to an inscription in general, whether it is literal or not and even if what it distributes in space is alien to the order of the voice : cinematography, Choreography, of course, but also pictorial, musical, sculptural writing. One might also speak of athletic writing, and with even greater certainty of military or political writing in view of the techniques that govern those domains today."

- Spivak Gayatri, (trans.), Jacques Derrida, *Of Grammatology, John Hopkins Press, London, 1997*. P-9

নিয়ে একটি লেখা, 'ফ্রম রেস্ট্রিকটেড টু জেনারেল ইকোনমি' নামক প্রবন্ধটিতে বলছেন[৭৪]। অপরটি অবশ্যই 'অ্যাক্টস অফ লিটারেচার' – যেখানে সার্বিকভাবে সাহিত্য নিয়েই আলোচনা করছেন তিনি এবং একভাবে বলতে গেলে দেরিদা বলছেন সাহিত্য 'Singularity'-র দ্যোতক। এককের ছাপ, তার স্বাক্ষর কে সাহিত্য গেঁথে নিতে চায়, এই একক বা অনন্য কেমনতর তা নিয়ে অ্যাট্রিজের নিজের আলোচনা আছে[৭৫], আমরা সেখানে আপাতত যাব না, কিন্তু মোটা দাগে বললে প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাহিত্য এককের কথা বলতে চায়, আর দর্শন ঠিক উল্টো সাধারণের কথা বলতে চায়, বিশ্বজনীনের কথা বলতে চায়। অবশ্যই এ-দুয়ের ভাগ করা খুব কঠিন কখন যে এক অপর হয়ে ওঠে তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। ফলত একথা সবসময়েই বলা যায় যে, সাহিত্যের মধ্যেও আসলে এককের মধ্যে দিয়ে সার্বজনীন হওয়ার লীলা চলে, অপরের সহিত উন্মোচিত হওয়ার (অ)সম্ভাব্যতা খেলা করে। যদিও এখানে আরও একটুখানি তর্ক বাকী থাকে - সাহিত্য যখন সত্যিই সাহিত্য হয়ে ওঠে তখন তার সঙ্গে দর্শনের তফাতটা নেহাতই প্রাতিষ্ঠানিক কি? আসলে লেখারই একটা রকমফের নয় কি তখন বিষয়টি, যা সম্পূর্ণ বিপরীত এক উপায়ে সার্বজনীনে উন্মোচিত হতে চায় ? তাহলে এমন কোন লেখা কি হতে পারে যা একইসঙ্গে সাহিত্যও এবং দর্শনও বা উভয়ের সীমানাকেই অতিক্রম করেছে অন্তর্লীন ভাবেন! 'অ্যাক্টস অফ লিটারেচার' গ্রন্থটি ডেরেক অ্যাট্রিজ সম্পাদনা করেছিলেন এবং গ্রন্থের শুরুর দিকেই, 'আ স্ট্রেঞ্জ ইন্সটিটিউশন কল্ড লিটারেচার' নামক সাক্ষাতকারে দেরিদা এই বিষয়ে বলছেন – "Still now, and more desperately than ever, I dream of a writing that would be neither philosophy nor literature, nor even contaminated by one or the other, while still keeping – I have no desire to abandon this – the memory of literature and philosophy"[৭৬]

এটাই দেরিদার দর্শনের প্রধান লক্ষণ, উনি দুটি দিককেই ধরে রাখতে চান আবার তার মধ্যে দিয়েই উভয়ের সীমানাকে ছাড়িয়ে যেতে চান। এটা নিয়ে বিস্তর কথা বলা যায়, কেন বাতাই-এর দর্শন আলোচনার সঙ্গে এর যোগ আছে, এর সঙ্গে 'উৎস' ও 'বিকল্পের' ধারণার কি যোগ, দেরিদার 'ইউলিসিস' পাঠের সঙ্গে দেরিদার স্বপ্নের সে লেখার কি সম্বন্ধ ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির কোনটাই আমরা এখানে লিখতে চাইনা – বাংলা বিদ্যাচর্চা মহলে না হলেও বি-নির্মানবাদীরা এগুলি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন।

যে সূত্রটি এখান থেকে আমরা পেতে চাই সেটা হল, দেরিদা নিজে একধরণের লেখার স্বপ্ন দেখছেন, এটা কিন্তু ঠিক প্রত্ন-লিখন বা লেশ এর তত্ত্বের ধারণা-রূপক বলে মনে করলে পুরোটা বোঝা যাবেনা। এটার মধ্যে দেরিদার

---

৭৪ Derrida Jacques, (From Restricted to General Economy: A Hegelianism without Reserve), Writing *and Difference*, Routledge, London, 2002.

৭৫ জাক দেরিদার সহচিন্তক, ডেরেক অ্যাট্রিজ – তাঁর 'সিঙ্গুল্যারিটি অফ লিটেরেচার' গ্রন্থে অনন্যতার ধারণা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, এককতা মানে কি ব্যক্তিগত নাকি অন্যকিছু এরকম নানাবিধ আলোচনা অ্যাট্রিজের লেখায় আছে। আমরা মূলত দ্বিতীয় অধ্যায়ে অ্যাট্রিজের সাহিত্যচিন্তা নিয়ে আলোচনা করব।

৭৬ Derrida Jacques, (Ed. Derek Attrite), *Acts of Literature*, Routledge, New York, 1992, P - 73

ভবিষ্যৎ দর্শনের কথা লুকিয়ে আছে। 'সাইকি : দ্য ইনভেনশন অফ দি আদার' গ্রন্থে, যে ইনভেনশন বা আবিষ্কারের ধারণা, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই আবিষ্কার এবং অপরের আগমনের ধারণা-রূপক, 'পলিটিক্স অফ ফ্রেন্ডশিপ'- গ্রন্থেও সেই বন্ধু-বেশী আগন্তুকের আগমনের আবিষ্কার। 'গিভন টাইম : কাউন্টার ফিট মানি' গ্রন্থেও, 'গিফট অফ ডেথ' গ্রন্থেও উপহার ধারণা-রূপকে (এই উপহারের ধারণার ভিত্তিতেই আমরা পূর্বে বলেছিলাম, কিভাবে দান এবং দান-বিক্রয় আলাদা হতে পারে। আপাতত সে আলোচনা স্থগিত রইল।) আবিষ্কারের ধারণা ফিরে ফিরে আসছে। এমন একটা কিছু যেটা আগমনরত, যেটা আসছে। দেরিদা তাঁর ১৯৯৯-এ প্রকাশিত একটি সাক্ষাতকারে বলবেন, আগমনরত ভবিষ্যতের কথা, এই ভবিষ্যৎ ঠিক নির্দেশিত, ছক কেটে পরিগণিত ভবিষ্যতের অপেক্ষা নয়, এটা যেন অপরের আগমনের অপেক্ষা, তার উন্মোচনের জন্যই যেন সমস্ত রাজনৈতিকতা – তার প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা, অতিথিপরায়ণতা, যেন এক নিবেদন, আত্মকে মেলে ধরার দায়বদ্ধতা[৭৭]। সেই সাক্ষাত বা আবিষ্কারে অন্য এক পরিভাষা বলতে গেলে উৎক্রমণ। এই ভবিষ্যৎ কি কেমন তা বলা অসম্ভব কারণ এ এক (অ)সম্ভাব্যতা। সুতরাং নীতি-রাজনীতির মূলে যেন আত্মকে মেলে ধরার এক দ্বায় আবশ্যিক ভাবে রয়ে যায়। এক কথায় এটাই হয়ত লেখার কাজের একমাত্র নীতি-রাজনৈতিকতা, কাজের নীতি-রাজনৈতিকতা। দেরিদার দর্শনের সঙ্গে মার্ক্সের ভবিষ্যৎবাদের দর্শনকে অনেকদিন ধরেই নানা ভাবে সম্পর্কিতরূপে পাঠ করার চেষ্টা হয়েছে। আসলে মার্ক্সবাদী চিন্তার মধ্যে পুঁজিবাদকে গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করার প্রকল্প ছিল, সেই গাণিতিক সন্দর্ভ পরবর্তীকালে গণিতের দার্শনিকরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ইদানীং কালের মধ্যে Joseph Dauben – এর এই বিষয়ক একটি বক্তৃতা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি চর্চার মধ্যে 'Infinitesimals' ধারণাটি বেশ পরিচিত পরিভাষা হয়ে উঠেছে, উনি সেই তর্কের ভিত্তিতে মার্ক্সের গণিতকে ভাববার চেষ্টা করেছেন। মার্ক্সবাদী বিপ্লবের ধারণারও নানাবিধ আলোচনার ঘরানা আছে – কিন্তু দেরিদার দর্শনে ভবিষ্যৎ চিন্তার মধ্যে যে অনাগত, আগন্তুক, অপরিচিতের দ্যোতনাময়তা আছে সেই দ্যোতনা মার্ক্সের চিন্তার মধ্যেও অনেকখানি বিদ্যমান। দেরিদা মার্ক্সকে পড়েছেন, মূলত অবভাসবিদ্যা ও বিনির্মাণের পরিভাষা ও দর্শনকে কেন্দ্রকরে - তাই ওনার আলোচনায় মার্ক্স ও ইহুদীবাদী ভবিষ্যতচিন্তন অনেকখানি মিলেমিশে গেছে বলে আমার ধারণা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খানিকটা কাকতালীয় হয়ত, দেরিদা তাঁর যে লেখাকে অগাধ সম্ভাবনাময়তার দিকে যাত্রা বলে কল্পনা করতে চেয়েছিলেন, সেই 'দ্য পোস্ট কার্ড' নিগূঢ় অর্থে 'চিঠি' বিষয়ক এবং কাকতালীয়-ভাবে আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনাও নেহাতই ছিন্ন একটুকরো চিঠি দিয়েই শুরু হয়েছিল।

[৭৭] অ্যাট্রিজের সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব।

উপসংহার

খুব সংক্ষেপে সমগ্র আলোচনাটিকে গুটিয়ে এনে বলা চলে - এই অধ্যায়ে আমাদের তর্কের কেন্দ্রে ছিল লেখকের একটি সমস্যা, সমস্যাটি হল - তার শ্রম অপরিমেয় এবং লেখকের প্রকাশ পাঠকের সহিত কি উপায়ে সংযুক্ত হয় তাও অপরিমেয়, অজানা। লেখকের অভিজ্ঞতা ও তার লেখার শ্রমের তুল্যমূল্য বিচারে, লেখকের এই কাজের পরিমাপ সম্ভবপর নয়। তাই লেখার কাজ আসলে লেখকের শ্রমসময়ের (অ)নভিজ্ঞতা, অন্তত লেখার কাজ নিয়ে এই অধ্যায়ের আলোচনার শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে পারি। অর্থাৎ একাধারে তা অভিজ্ঞতা প্রসূত আবার সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ নয় যেন। অনভিজ্ঞতার শ্রমের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া, সংযোগের তরে নিজেকে ঠেলে দেওয়া, মেলে ধরা - লেখকের অপরিহার্য একটি দায়িত্ব। স্বপ্নের লেখার দিকে ক্রমাগত এগিয়ে চলাই লেখকের রাজনীতি। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি কথাটি বেশ কিছুটা ভুল কথা – বরং এই অধ্যায়ের শেষে আমরা আমাদের গবেষণার মৌলিক প্রশ্নটিতে পাকাপাকি ভাবে উপনীত হলাম, এই অংশে গবেষণা পত্রের নামটুকু যদি পুনর্লিখন করি তাহলে, সেই প্রশ্নটিতে উপনীত হওয়ার কার্য সুসম্পন্ন হয় – প্রশ্নটি তাহলে লেখার কাজ আসলে কি? এবং এই প্রশ্নটিকে যদি আমরা শ্রম সময়ের অ(ন)ভিজ্ঞতা ও লেখকের আঁতের কথার প্রেক্ষিত থেকে পাঠ করতে চাই, তাহলে কোন ধরণের উত্তর বা সিদ্ধান্ত সমুচ্চয় আমরা পেতে পারি? এই ধারণাগুলিকে স্মরণে রেখেই আমাদের গবেষণার নাম – 'লেখার কাজ : শ্রম সময়ের অ(ন)ভিজ্ঞতা ও লেখকের কথা'। ঠিক কোন কোন প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে আমরা আলোচনার এই অংশ অবধি পৌঁছলাম – সেই বিষয়ে আমরা অনেকখানি আলোচনা ইতিমধ্যে করে ফেলেছি।

কিন্তু মার্ক্সবাদী তত্ত্বের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের ছিন্ন-পত্রাবলী কি খুব সহজেই পাঠ করে ফেলা সম্ভব? তার জন্য আমাদের আরও নিগূঢ় ভাবে খুঁজে দেখতে হবে বাংলা সংস্কৃতিতে 'সাহিত্য' বিষয়ক আধুনিক তর্কগুলির যাত্রা কেমনতর – তাই নয় কি? কিভাবে সেই ইতিহাসের নিরিখে আমরা এই তর্কের ভিতর পরতে নামতে পারি ? যে তর্কের কেবলমাত্র অবতারণা করলাম এখানে তার আরও গভীরে প্রবেশ করতে পারি, আরও ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে পড়তে পারি কি করে ? পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আবার সেই পথ দিয়ে আলোচনা করতে করতে এই তর্কে ফিরে আসব। মূলত ফরাসি তাত্ত্বিকদের চোখ দিয়ে বাংলা ভাষার চিন্তকদের পাঠ করার যে প্রবণতা আমাদের গবেষণায় প্রতিফলিত হচ্ছে – সে বিষয়ে দুটি কথা বলার আছে আমাদের, প্রথমত – যে বিষয়ে আলোচনা করছি তার সঙ্গে ফরাসি-চিন্তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, দ্বিতীয়ত - জাক দেরিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতির কথা আমরা স্মরণ করে নিতে পারি এখানে –

"If I apply myself, I am applying myself to anything, to deconstruction for instance, or to deconstructive gestures, it is in a double sense of trying to perform singular events, singular gestures, singular performatives, which cannot be reproduced or imitated, and

which occur just once , being singular and unique, events and performatives which only I am able to sign"[৭৮]

বোঝাই যাচ্ছে এখানে দেরিদা নিজের তত্ত্বের প্রয়োগ বিষয়ে মন্তব্য করছেন। নিজের তত্ত্বের প্রয়োগ যদি নিজেই তিনি করেন – তাহলেও সেটা প্রয়োগকে তিনি যেভাবে দেখছেন তার থেকে খুব একটা আলাদা হয়না। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তত্ত্বের প্রয়োগ যখন কোথাও হয়, তখন সেই প্রয়োগের (যদি সেটা যথাযথ অর্থে প্রয়োগ হয়) নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য থাকে। আমরা ভাবতেই পারি হয়ত কোন একটা প্রয়োগ, যা প্রয়োগ করছি তাকেই মৌলিক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতে পারে। একজন গবেষকের সর্বদাই সেই আশ্চর্য সম্ভাবনার প্রতি নিজেকে উন্মুক্ত রাখা উচিৎ। আমরাও সেভাবেই আলোচনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আগামী অধ্যায়ে আমাদের মূল প্রশ্নটিকে নিয়ে আরো অন্যান্য মাত্রা উন্মোচনে এগিয়ে যাবো।

[৭৮] Derrida Jacques, (Ed. John Branigan, Ruth Robbins and Julian Woulfreys), *Applying: To Derrida,* Macmillan Press LTD, 1996. P- 218

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমিকা

'মার্ক্সবাদী' পত্রিকার ৪ নং সংখ্যায় প্রকাশ রায় 'প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' লেখার পরে, পঞ্চম সংখ্যায় রবীন্দ্র গুপ্ত ওই বিষয়ে লেখেন। এরপর একই বিষয়ে কলম ধরেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রবন্ধের বক্তব্য – ১। আগের লেখা-দুটি মূলত দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ নিয়েই কথা বলছে। বামপন্থি সংস্কারবাদকে এড়িয়ে যাচ্ছে[৭৯]। ২। ১৯৩০ প্রগতি সাহিত্যের ঐতিহ্য খুঁজতে গিয়ে কিছু সাহিত্যকে প্রগতিশীল চিহ্নিত করে, বাকিটা অ-প্রগতিশীল বলা ঠিক হচ্ছেনা। অর্থাৎ হুতোম প্যাঁচার নকশা বা নীলদর্পণ-কে আলাদা করে প্রগতিশীল চিহ্নিত করার সমস্যা আছে কিছু। তার চেয়ে বরং - রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের লেখার প্রগতিশীলতা নিয়ে আলোচনা করা বেশি প্রয়োজনীয়[৮০]। ৩। বুর্জোয়া লেখকের শ্রেণীচ্যুত হওয়ার ধারণাটাকে মানিক অস্বীকার করছেন। বরং উল্টো দিক দিয়ে লেখার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর জীবন দর্শনকে ছুঁতে পারার ভাবনাটা বেশি প্রয়োজনীয় মনে করছেন এবং মার্ক্সবাদী ও লেনিনবাদী দর্শনের প্রেক্ষিতে তর্কটিকে সরাসরি বুঝতে চাইছেন[৮১] ৪। আর অবশেষে তর্ক করছেন, প্রগতি সাহিত্য কি হবে সেই জটিল প্রশ্নটা নিয়ে। ৪ নং মার্ক্সবাদীতে লোকনাট্যের মত সহজ লেখাকেই প্রগতি সাহিত্যের আদর্শ হিসেবে স্থির করতে চাওয়া হয়েছিল। সেটা খণ্ডন করে মানিক বলছেন –

"কথাটা হল আঙ্গিকের। আমার মতে, প্রগতি সাহিত্যের আঙ্গিক এখনো জন্মায়নি, জন্মাচ্ছে – নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রচেষ্টার মধ্যেই জন্মাচ্ছে। বাঙলার শ্রমিকশ্রেনীর সংস্কৃতির প্রাণবস্তু যেমন হবে সম্পূর্ণ নতুন, আঙ্গিকও হবে তেমনি নতুন – কারো সাধ্য নেই আজ বলে দেয় সে আঙ্গিক কি হবে। বলতে গেলেই বরং ক্ষতি হবে..."[৮২]

এই বক্তব্য আপাত অর্থে প্রগতিশীল মার্ক্সবাদের কতগুলি স্বতঃসিদ্ধের পুনরুক্তি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে এটা আপাতত একটা চাবিকাঠি, যেটা দিয়ে আমরা আমাদের মূল বক্তব্যে পৌঁছতে চাই। গত অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করছিলাম লেখার কাজ বিষয়ে - সেই সূত্রেই লেখার শ্রমের ধারণা বিষয়ে এবং সেই সূত্রে লেখার শ্রমের পরিমাপের প্রশ্ন এবং যাবতীয় অনির্বচনিয়তা ও অপরিমেয়তার বিষয়ে। যদিও মানিকরা এখানে তর্ক করছেন, কোন সাহিত্য প্রগতিশীল এবং কোন সাহিত্য প্রগতিশীল নয় সেটা নিয়ে তথাপি তার মধ্যেই রয়ে

[৭৯] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, (সম্পা- ধনঞ্জয় দাশ), করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ- ২০৬

[৮০] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, (সম্পা- ধনঞ্জয় দাশ), করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ- ২১৩

[৮১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, (সম্পা- ধনঞ্জয় দাশ), করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ- ২১৫

[৮২] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, (সম্পা- ধনঞ্জয় দাশ), করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ- ২২২

গেছে লিখন কী এবং লিখন কী নয় তার প্রশ্ন। প্রগতিশীলতা কি কেবল সামাজিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত, সামাজিক শ্রেণীবিভাজন থেকে মুক্ত লিখনের সন্ধান নাকি লিখনের নিজস্ব যে দর্শন তার সঙ্গে সাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্য তথা প্রগতির প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের মতে অবশ্যই তা সম্পর্কিত। গত অধ্যায়ে মূলত লেখকের দৃষ্টি থেকে সাহিত্যের বিচারের প্রসঙ্গে আমরা লিখনের দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবেশ করেছিলাম। এই অধ্যায়ে আমরা চেষ্টা করব সমালোচনা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে কিভাবে লেখার কাজের প্রসঙ্গটিকে বোঝা যায়। সমালোচনা সাহিত্যের কেন্দ্রে আছে একটি মূল প্রশ্ন – সাহিত্য কী এবং সাহিত্যকে যদি সাধারণ অর্থে সৃজনশীল লেখা বলি তাহলে সৃজনশীলতা বলতে কি বুঝি, কোনটা সৃজনশীলতার মানদণ্ডে সফল হয় কোনটা অসফল হয়। অর্থাৎ অন্যভাবে বললে, লেখকের চাওয়া পাওয়ার দৃষ্টি দিয়ে নয়, সাহিত্য বিচারের প্রেক্ষিতে লেখার কাজের প্রশ্নটিকে কিভাবে দেখতে পারি। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমরা মার্ক্সবাদী সমালোচনা সাহিত্যের প্রগতিশীলতার বিতর্ক দিয়ে আলোচনাটা শুরু করছি। আলোচনার এই বিশেষ প্রবেশপথ আমাদের গবেষণার মূল তর্কটিকে আরও বেশি পরিস্ফুট করতে সাহায্য করবে। লিখনের শ্রমের প্রসঙ্গটিকে আমরা মার্ক্সবাদী তর্ক দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম এবং লিখনকে কিভাবে বুঝতে পারি। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদার লিখনের দর্শন বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। ওনার জীবনের প্রধান কাজগুলির মধ্যে লিখন-এর দর্শন অন্যতম স্থান অধিকার করে আছে – একথা সর্বজন বিদিত এবং যে কোন লিখন বিষয়ক তর্কই দেরিদা ছাড়া হয়ত অসম্পূর্ণও বটে। দেরিদার প্রধানতম দার্শনিক অভিঘাতই যেন লিখন – একথা বললেও অত্যুক্তি হয় বলে মনে হয়না। জাক দেরিদার সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা-ক্ষেত্রের অন্যতম সহ-চিন্তক ডেরেক অ্যাট্রিজের সাহিত্য চিন্তাও সেহেতু এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয়। তাঁর 'সিঙ্গুলারিটি অফ লিটারেচার' এবং 'ওয়ার্ক অফ লিটারেচার' গ্রন্থ-দুটিতে তিনি তাঁর সাহিত্য বিষয়ক তর্কের প্রধান বক্তব্যগুলি তুলে ধরেছেন। আমাদের আলোচনার দার্শনিক ভিত্তি সেই চিন্তাগুলিকে কেন্দ্র করেই, দেরিদার সাহিত্য-দর্শনের ধারণাগুলিকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হবে। সরাসরি এই অধ্যায়ের আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে আমরা এই অধ্যায়ের মূল তর্কগুলিকে পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

(অধ্যায় সার)

১। আমরা মার্ক্সবাদী সমালোচনা সাহিত্যের মূল আলোচিত বিষয়গুলিকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব। এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে বাংলায় মার্ক্সবাদীদের সাহিত্য বিষয়ক চিন্তার প্রাথমিক মানচিত্রটি স্পষ্ট হবে। যেহেতু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-চিন্তা আমাদের গবেষণার অন্যতম অঙ্গ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশের দশকের মার্ক্সবাদী সাহিত্যিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের সরাসরি যোগাযোগ ছিল ফলত আগের অধ্যায়েও আমরা খেয়াল করেছি এবং এই অধ্যায়েও আমরা খেয়াল করব যে, আমাদের আলোচনা মার্ক্সবাদী সাহিত্য চিন্তা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়। মার্ক্সবাদ নিজে একটি বিরাট বিশ্বব্যাপী ঘটনা। ইউরোপ সহ নানা দেশে

মার্ক্সবাদের সাহিত্য ও শিল্প সংক্রান্ত চিন্তা বিষয়ে নানাবিধ তর্ক আছে। যেহেতু আমাদের গবেষণা প্রধানত 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে সংগঠিত সেই হেতু আমরা প্রসঙ্গক্রমে বিদেশী যুক্তি-তর্কগুলিতে প্রবেশ করলেও মূলত বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলের মধ্যেই আমরা আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখবো।

২। উপরোক্ত আলোচনা-প্রসঙ্গ থেকে মূলত সৃজনের তর্কটি আশ্রয় করে গুরুত্বপূর্ণ দেরিদীয় সাহিত্য চিন্তক ডেরেক অ্যাট্রিজের সাহিত্য বিষয়ক তর্কে প্রবেশ করব আমরা। গত অধ্যায়েই উল্লেখ করেছি আমাদের গবেষণার অন্যতম অঙ্গ ফরাসী চিন্তাবিদ জাক দেরিদার লিখনের দর্শন। ডেরেক অ্যাট্রিজের সাহিত্য-চিন্তা মূলগত ভাবে দেরিদীয় দর্শনের অনুসারী। অ্যাট্রিজকে সাহিত্য বিষয়ে দেরিদার সহ-চিন্তক বলা যেতে পারে। অন্য অর্থে অ্যাট্রিজের মাধ্যমে আমরা যেন দেরিদীয় সাহিত্য-চিন্তার ধারাকেই আরও নির্দিষ্ট রূপে সংগঠিত হতে দেখি। মূলত সেই কারণেই অ্যাট্রিজের সাহিত্য-চিন্তা বিষয়ক মৌলিক একটি আলোচনা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে প্রয়োজনীয়। একই সঙ্গে অ্যাট্রিজের সাহিত্য-চিন্তায় সৃজনের ধারণা কিভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেই বিষয়েও আমরা এখানে আলোচনা করব – পাশাপাশি দেখব বাংলা সাহিত্যে এবং ফরাসি চিন্তায় তথাকথিত মার্ক্সবাদী ঘরানায় বা বিনির্মাণ বিরোধী মার্ক্সবাদী ঘরানায় কিভাবে সৃজনের ধারণাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যেকার তফাৎ ইত্যাদি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তার মধ্যে দিয়ে আমাদের গবেষণায় সৃজনের ধারণাটি কেমনতর তার প্রাথমিক একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

৩। এর পরবর্তী অংশে বাংলা সমালোচনা সাহিত্য – অর্থাৎ বঙ্গদেশে সাহিত্যের ইতিহাসের যে অংশে সাহিত্য কাকে বলব, সাহিত্যিক গুণ বলতে ঠিক কী বুঝি - এই নিয়ে নিরন্তর মতান্তর ও মনান্তর চলে এসেছে – সেই অংশের প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের গবেষণার মূল আলোচনাগুলিকে কিভাবে বুঝে নিতে পারি? সেই ইতিহাসের নিরিখে আমাদের গবেষণার প্রশ্নটির অবস্থান কোথায়? এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করবার তাগিদে আমরা সাহিত্য-সমালোচনার দীর্ঘ একটা সময়ের ইতিহাস ক্রমান্বয়ে আলোচনার চেষ্টা করব। যদিও এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য ঐ দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সব তথ্য ও তর্ক সমেত তুলে ধরা নয়, বলা চলে পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক পদ্ধতি ও মতাদর্শগত দিকগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে, সময়ক্রম অনুসারে তাদের পারস্পরিক আলোচনার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে, আমাদের নিজেদের গবেষণার বিষয়টির তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা, গভীরতাকে অনুসন্ধান করা – এটাই এই অংশের আলোচনার প্রধানতম উদ্দেশ্য।

৪। অধ্যায়ের অন্তিম অংশে আমরা পূর্বোক্ত আলোচনাগুলি থেকে একটি সাধারণ সূত্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করব।

বিষয়গত দিক দিয়ে মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনার প্রধান চারটি দিক

প্রথমত, মার্ক্সবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য বিচার আসলে কি? মূলত কোন কোন শর্তের উপর ভিত্তি করে সেই সাহিত্যবিচার হয় ? (এ নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন, উদাহরণ হিসেবে বীরেন পালের লেখার কথা বলা যায়[৮৩])। বাঁধাধরা মার্ক্সবাদী সমালোচনার ছক মেনেই, এই প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে বুর্জোয়া মতাদর্শকে চিহ্নিত করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের গোরা, শেষের কবিতা থেকে শুরু করে বনফুলের লেখাকে, সেই মতাদর্শের আওতায় ফেলতে থাকে, তারাশঙ্করের হাঁসুলি বাঁকের উপকথাকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিতে থাকে। তারাশঙ্কর ও রবীন্দ্রনাথ উভয়কেই ভাববাদী বলা হয়। বিষ্ণু দে - কে কলাকৌশলবাদী বলে তার সাহিত্যে মার্ক্সবাদের প্রভাবকে ভ্রান্ত বলা হয়। একমাত্র মানিকের পুতুল নাচের ইতিকথাকেই যথাযথ বলেন তিনি। কিন্তু সেখানেও মানিকের লেখাকে নৈরাশ্যের দোষে দুষ্ট বলা হয়। বীরেন তাঁর প্রবন্ধে লিখছেন –

"সাহিত্যে আগে জনগণের অস্তিত্ব দেখা যেত না, বিগত মহাযুদ্ধের পর তারা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, সাহিত্যিকের দৃষ্টি পড়েছে তাদের দিকে। কিন্তু শুধু মাত্র এই কারণেই সাহিত্যকে প্রগতি সাহিত্য বলা চলেনা, জনগণের দিকে যিনিই তাকান তিনিই প্রগতিশীল নন, কী দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালেন তার উপর নির্ভর করে তিনি প্রগতিশীল কি না। সজনীকান্তের দল তাদের দিকে তাকাচ্ছেন উদীয়মান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক প্রগতিকে বাধা দেবার উপকরণ সংগ্রহের জন্য, তারাশঙ্করবাবু গান্ধিবাদী দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে তাদের শুধু অতীতটা দেখছেন, দেখেন না তাদের সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎ, মানিকবাবু ও ননী ভৌমিক প্রমুখ লোকেরা তাদের ভবিষ্যৎ দেখতে আরম্ভ করেছেন।

কিন্তু মানিকবাবুর দৃষ্টি এখনো সীমাবদ্ধ, এখনো সাহস করে সত্য উৎঘাটনের পথে বেশিদূর পা বাড়াতে পারেননি।"[৮৪]

কোন সত্যের কথা বলতে চাওয়া হচ্ছে এখানে ? এই সত্যকে উনি বলবেন শ্রেণী সংগ্রামের সত্য এবং সাহিত্যিক হিসেবে সেই সত্যের উৎঘাটনই প্রধান কর্তব্য। এই প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল, প্রগতি সাহিত্যের কতগুলি নির্দিষ্ট তথাকথিত বিশ্লেষণ-যোগ্য শর্ত থাকা উচিৎ। তিনি এই প্রবন্ধে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের জন্য নির্দিষ্ট কতগুলি শর্তও দিয়েছিলেন –

---

[৮৩] মার্ক্সের জার্মান আইডিওলজি ও ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি থেকে যথাক্রমে দুটি উদ্বৃতি দিয়ে লেখা শুরু হচ্ছে –

১। "যে কোন যুগে শাসকশ্রেনীর ভাবসম্পদই হয় সেই যুগের ভাবরাজ্যের বিধানকর্তা।

২।বাস্তব জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক জীবনের গতি নির্দেশ করে। চৈতন্য দ্বারা মানুষের বাস্তব জীবন নির্ধারিত হয় না, বরং সামাজিক বাস্তব জীবন দ্বারাই চৈতন্য নির্ধারিত হয়।"

- বীরেন পাল, *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, (সম্পা- ধনঞ্জয় দাশ), করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৫৭

[৮৪] বীরেন পাল, *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, (সম্পা- ধনঞ্জয় দাশ), করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা , ২০১৩, পৃ- ৬৫

১। শ্রেণীসংগ্রামকে অবলম্বন করতে হবে, শ্রেণী নিরপেক্ষ জাতির কথা ছাড়তে হবে, শ্রেণীসংগ্রামে মজুর শ্রেণীর পক্ষ নিতে হবে।

২। সাহিত্য সৃষ্টিতে নিজের কথা না বলে গণসমাজের কথা দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে হবে।

৩। সমাজকে যারা পিছনের দিকে টানছে তাদের অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখোশ খুলে দিতে হবে।

৪। সহজ সরল উদ্দীপনাময় কলাকৌশলের সাহায্যে সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যবধান ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে।

৫। অধ্যাত্মবাদ ছেড়ে মার্ক্সবাদের পথে আসতে হবে।

উর্মিলাগুহ, সাহিত্য বিচারের মার্ক্সীয় পদ্ধতি প্রবন্ধেও একই কথা বলছেন, আরও একধাপ এগিয়ে, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে -কে তৃতীয় পক্ষ বলে চিহ্নিত করছেন। কলা-কৈবল্যের কথা বলছেন। বিষ্ণু দে -কে ট্রটস্কি পন্থী বলেও চিহ্নিত করছেন। প্রকাশ রায় লিখেছেন,

"জনতাকে নিয়ে লিখলেই বিপ্লবী নাটক বা বিপ্লবী উপন্যাস হয়না। জনতাকে নিয়ে কি লেখা হল, সে জনতার শ্রেণিচরিত্র যথার্থ ভাবে ফুটছে কিনা, শত্রুর বিরুদ্ধে সে নাটক হাতিয়ার হয়ে ওঠে কিনা – এটাই বিপ্লবী নাটকের মূল কথা।"[৮৫]

রবীন্দ্র গুপ্ত একই ভাবে একাধারে রবীন্দ্রনাথ কে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার জন্য সমালোচনা করছেন এমনকি বলছেন – "রবীন্দ্র সাহিত্য হল প্রগতির শিবির থেকে মানুষ ভুলিয়ে বের করে নিয়ে যাবার মোহিনী মায়া।"[৮৬] পরিচয়ের সম্পাদককে খানিকটা বাঁকা সূরে প্রতিবৈপ্লবীক বলছেন। নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঊনবিংশ শতকের বাংলায় বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা লেখায় বঙ্কিমকে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি বলছেন এবং দীনবন্ধু মিত্রকে বাস্তববাদী আখ্যা দিচ্ছেন। প্রকাশ রায় লিখছেন "গণ-সংস্কৃতি রচনা নিভৃত সাধনা নয় – সে সংস্কৃতি রচিত হবে লড়াইয়ের ময়দানে, বুর্জোয়া-শ্রেণীর ধ্বংসস্তূপের উপর। এই চেতনাই দিয়েছে লোকনাট্যকে ইস্পাতের তীক্ষ্নতা। রবীন্দ্র গুপ্ত লিখছেন 'বঙ্কিমের সাহিত্যের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর আবেদন শুধু গোঁড়া হিন্দুর কাছে, মানুষের মনে তা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করেছে' কিন্তু তিনি আবার রামমোহন বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে প্রগতিশীল বলতে রাজি এবং রজনী পাম দত্ত-ও যে তা অস্বীকার করতে পারেননি সেকথা জানাচ্ছেন।[৮৭] মার্ক্সবাদী বিতর্কের এই অংশে

[৮৫] প্রকাশ রায়, *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, (সম্পা- ধনঞ্জয় দাশ), কোলকাতা, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৯৫

[৮৬] রবীন্দ্র গুপ্ত, *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, (সম্পা- ধনঞ্জয় দাশ), কোলকাতা, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ- ১১৭

[৮৭] নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকায় লিখছেন – "অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদীরা ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে এই ধর্মের গোলামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই সূত্রপাত করেছিলেন সামন্ত-তন্ত্রের উচ্ছেদের সংগ্রাম। ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণা ছিল এই

আরও অনেকে লিখেছেন তাদের মধ্যে সনৎকুমার বসু আছেন শান্তি বসু আছেন। পরবর্তীকালে অনেক মার্ক্সবাদীদের লেখাতেই উনিশ-শতকের সাহিত্য নিয়ে বিতর্ক উঠতে দেখা গেছে – রবীন্দ্রনাথ-কে মার্ক্সবাদীরা তার ঔপনিষদিক দর্শনের প্রতি অতি-বিশ্বাসের জন্য আক্রমণ করেন – এই বিষয়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের দার্শনিক ঐতিহ্য নামক রচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন – যেটা একেবারেই নৈতিক একটি প্রসঙ্গ - "খুনি ও খুন হওয়া লোক আমার কাছে অন্তত খুবই কুৎসিত রকমের বাস্তব, বিতর্কের অতীত বাস্তব বলে মনে হয়েছিল। যে দর্শন এই সব কিছুকে অজ্ঞের কল্পনা বলে তার প্রতি আমি কোন শ্রদ্ধা রাখতে পারিনি।"[৮৮]

দ্বিতীয়ত, প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা অর্থাৎ প্রগতি সাহিত্যবাদীদের মধ্যেকার তর্ক, আলোচনা – ইত্যাদির অংশটা দীর্ঘ।[৮৯] প্রকাশ রায় লিখছেন - "ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের আত্মসমালোচনার বিবরণীতে দেখা গেছে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের রূপ ছিল বুর্জোয়া নেতৃত্বের লেজ ধরে চলা, পচা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মার্ক্সবাদকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা। এই সংস্কারবাদ এত দীর্ঘকাল ধরে সংগোপনে তার ধ্বংসাত্মক কাজ করে গেছে যে তার প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সংস্কৃতি আন্দোলনও এর গভীরতর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।"[৯০] এই আত্মসমালোচনার বিতর্কটি মানিকের লেখায় একটা স্পষ্ট রূপ নিয়েছে – সেখানে তিনি রবীন্দ্র গুপ্তের অনেকগুলি গোঁড়া মতকেই খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন যে বুর্জোয়া লেখকের শ্রেণীচ্যুত হওয়ার ঘটনাটা অবাস্তব। উনি লিখছেন – "আসল কথা হল জীবন-দর্শন : বুর্জোয়া জীবন দর্শন সাহিত্যকে বুর্জোয়া-স্বার্থের অনুকূল করে, শ্রমিক-শ্রেণীর জীবন দর্শনই সাহিত্যকে শ্রমিক শ্রেণীর অনুকূল করতে পারে"[৯১]। অর্থাৎ শ্রেণীচ্যুত হওয়া নয় বরং শ্রমিক শ্রেণীর জীবনদর্শনের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, এটাই মানিকের বক্তব্য। কথাটা পরোক্ষভাবে মার্গারেট হার্কনেস নিয়ে এঙ্গেলসের লেখা চিঠির সঙ্গে সাযুজ্য-পূর্ণ, (প্রসঙ্গটি গত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, আলোচনার সুবিধার জন্য আবারও উল্লেখ করছি) যেখানে এঙ্গেলস বলছেন, বালজাক গুরুত্বপূর্ণ লেখক কারণ তিনি যে শ্রেণী নিয়ে লিখছেন, তার বাস্তবতাটা দেখাচ্ছেন, এটাই সাহিত্যের লক্ষ্য। অর্থাৎ সমাজের বাস্তবতার প্রতি ন্যায্যতা দেওয়াই একরকমের প্রগতিবাদ, কেবল গরিবদের নিয়ে লেখাটা প্রগতিবাদ নয়। কিন্তু ঠিক এই যুক্তিতেই শীতাংশু মৈত্র, মানিক কে প্রশ্ন করছেন – "শ্রেণী সংগ্রামের চরম পর্যায়ে প্রগতি সাহিত্য মূলত সমাজবাদী চেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের সাহিত্য বলে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে বসে থাকলে তিনি শ্রেণী মিলনের ভাঁওতায় পড়বেন। ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজমের বুলিও তাকে

বস্তুবাদের মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে বিপ্লবের ভয়ে ভীত সংস্কারপন্থী বঙ্কিম নতুন করে অধ্যাত্মবাদ আর ধর্মের কুসংস্কার প্রচারে করলেন মনোনিবেশ।"

- নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, (সম্পা- ধনঞ্জয় দাশ), কোলকাতা, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ-১২৩

[৮৮] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,(সম্পা, মলয়েন্দু দিন্দা), অগ্রন্থিত রচনা : শিল্প ও সাহিত্য, অবভাস, জুন ২০১৪

[৮৯] এখানে প্রধাণত লিখছেন প্রকাশ রায়, স্বদেশ বসু ছদ্মনামে শান্তি বসু, শীতাংশু মৈত্র, নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

[৯০] প্রকাশ রায়, *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, (সম্পা- ধনঞ্জয় দাশ), কোলকাতা, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৮০

[৯১] প্রকাশ রায়, *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, (সম্পা- ধনঞ্জয় দাশ), কোলকাতা, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৮৩

বাঁচাতে পারবেনা...আজকের পাঠক আর ক্লেদের সমালোচনা চায় না, চায় ক্লেদ দূরীকরণের সংগ্রামী চিত্র।”[৯২] সেক্ষেত্রে এই তর্ক আরও খানিকটা জটিল হয়ে উঠছে। এই আলোচনার সঙ্গেই জড়িয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতের অনুষঙ্গ।

তৃতীয়ত, মার্ক্সবাদীরা যাকে ‘তৃতীয় পক্ষ’, প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করেছিলেন তাদের বক্তব্য। কট্টর মার্ক্সবাদীরা - বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু এমনকি এদের সঙ্গেই বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর-এদের সকলকে সামন্ততান্ত্রিকতার অন্ধকার দোষে দুষ্ট বলছে, এরা সকলেই সেই একই বিরোধিতার রোষের মুখে পড়ছে যাদের প্রগতিবাদীরা তৃতীয়পক্ষ বলে চিহ্নিত করছেন। বিষ্ণু দে’র বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে, “বিষ্ণু দে একজন দক্ষ কলাকৌশল বিদ, কিন্তু মার্ক্সিস্ট নন। তাঁর কলা কৌশল মার্ক্সবাদকেই হত্যা করে।” এদের কলাকৈবল্যবাদ বলেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কখনো বা ট্রটস্কিবাদীও বলা হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ নিয়ে বিনয় ঘোষের মন্তব্য ছিল - উনি সাহিত্যকে “দৈবপ্রতিভার কবল থেকে মুক্ত করে পার্থিব আসনেই উপবেশন করিয়েছেন। ...দুঃখের বিষয় তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও বলিষ্ঠ পৌরুষপূর্ণ ভাষাকে সুধীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিবাদের নির্জন গোরস্থানেই কবরিত করেছেন”[৯৩]। কিন্তু সাহিত্য সমালোচক মাত্রেই জানেন - কাব্যের মুক্তি-র মত লেখায় সুধীন্দ্রনাথ স্পষ্টাক্ষরেই ওনার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর বিরুদ্ধেও একই ধরণের শ্লেষ মার্ক্সবাদীরা করেছেন। অনেকানেক প্রবন্ধের মধ্যে, বুদ্ধদেব বসুর ‘যে আঁধার আলোর অধিক’ লেখাটির ভিতর হয়ত, আমরা তাঁর মতটা একভাবে পেতে পারি। যাইহোক, মোট কথা যদিও এই বিবাদের ইতিহাস বিরাট, তথাপি শেষ পর্যন্ত এই তথাকথিত তৃতীয় পক্ষেরা নিজেদের মত করেই প্রগতির ধারণাকে সাহিত্যে খুঁজেছিলেন।

চতুর্থত, যে জরুরি তর্কটিতে আমরা এই অধ্যায়ে নয় বরং তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করব, তা হল - সাহিত্যের মূল্যের তর্ক। যে তর্কগুলি একসময় ‘বস্তুবাদী সাহিত্য বিচার ও অন্যমত’ নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অংশের তর্কটা মূলত আবু সৈয়দ আইয়ুবের সঙ্গে, অমরেন্দ্র প্রসাদ ও শীতাংশু মৈত্রের। আইয়ুবের মূল বক্তব্য ছিল, সমকালের মার্ক্সবাদীরা সাহিত্যের ঘারে যে মতাদর্শের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে, তাতে করে সাহিত্যের একটা উপকরণ মূল্য বা Utilitarian Value তৈরি হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে সাহিত্যের চরম মূল্যের ধারণাকে তিনি নিয়ে আসেন, যাকে এক বাক্যে সত্য শিব সুন্দরের - সাহিত্যিক লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সেই শর্তেই আইয়ুব বলেছেন - মার্ক্সবাদী বিপ্লবের আদত লক্ষ্য কি? কেবল অর্থনৈতিক সমতাই কি সমস্ত সমাধান আনবে? - ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তবে মার্ক্সবাদীরা বিশুদ্ধ সাহিত্যের ধারণাকে বিপ্লবের পথে কর্ম-বিমুখ অনর্থক প্রতিক্রিয়াশীল বাধা বলে চিহ্নিত করেন এবং মোদ্দা কথায় পাত্তা দেননা। কিন্তু আইয়ুব তার জবাব ফিরিয়ে দেন বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য নামক লেখায়। একটাই কথা বলার আছে, আইয়ুব তার নিজস্ব রাজনীতি থেকেই সৃজনশীলতার প্রশ্নকে তুলে ধরেন, যেটা প্রায় সমস্ত মার্ক্সবাদী সমালোচকদের লেখায় অনুপস্থিত – “শিল্পের প্রগতি সৃজনীপ্রতিভাসম্পন্ন

---

[৯২] শীতাংশু মৈত্র, *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, (সম্পা- ধনঞ্জয় দাশ), কোলকাতা, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ- ২৩১

[৯৩] বিনয় ঘোষ, *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, (সম্পা- ধনঞ্জয় দাশ), কোলকাতা, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৪০৯

শিল্পীরাই আনবেন, রাষ্ট্রনেতারা তার পথ নির্দেশ করতে গিয়ে শিল্পীর সৃজনীশক্তিকে ব্যাহত করছেন, উন্মুক্ত নয়।"[৯৪] নির্দ্বিধায় বলা যায়, এই বাক্য, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার তত্ত্বের ফাঁদেই পড়ে আছে, দক্ষিণপন্থীও বলেছেন অনেকে কিন্তু সৃজনের প্রশ্নটা এখানে সব থেকে বেশি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। সৃজনের প্রশ্নেই আমরা যাব আপাতত। আইয়ুবের তর্কে আপাতত প্রবেশ করব না (সেই তর্ক পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য মুলতুবি থাক)।

ডেরেক অ্যাট্রিজের সাহিত্য-চিন্তা ও সৃজনের প্রসঙ্গ

ডেরেক অ্যাট্রিজ তাঁর সিঙ্গুলারিটি অফ লিটারেচার গ্রন্থে প্রশ্ন করেছেন -

"... why is it (creation) so often described by creators not as an experience of doing something but of letting something happen?"[৯৫]

রবীন্দ্রনাথও যখন সাহিত্যের কথা বলবেন বা গত অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করছিলাম – তাঁর বক্তব্যে সৃষ্টিশীলতা যেন আপনা থেকে ঘটে যাওয়া এক আশ্চর্য ঘটনা বিশেষ। এই সূত্র ধরেই যেহেতু ব্যক্তি লেখকের মহিমার অতিলৌকিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যায়, তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই মহিমাবাদের কড়া সমালোচনা করেছেন তাঁর 'লেখকের কথা' গ্রন্থে, সে বিষয়েও আমরা আলোচনা করেছিলাম। অর্থাৎ এক অর্থে নিশ্চয়ই সৃষ্টির আপনা আপনি ঘটে যাওয়া অলৌকিকতারও সমালোচনা করেছেন মানিক, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের অলৌকিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সমালোচনা করছেন যেন। এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের পূর্বের আলোচনার আরও গভীর কিছু অংশ উন্মোচিত করার চেষ্টা করছি। Attridge আরও লিখছেন,

"It is difficult to talk about the activity of linguistic (or any other) creation, which usually remains mysterious to the creator – indeed, some degree of inexplicability is often taken to be definitive of creation, in contrast to the simple act of production in accordance with existing models and rules".[৯৬]

অর্থাৎ, সাহিত্য বা শিল্পকে যেন ঠিক উৎপাদিত পণ্যের যুক্তিতে সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে এবং বুঝে নিতে সমস্যা হয়, ভাষাতাত্ত্বিক সৃজন - উৎপাদনের সেই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী রূপে প্রতিভাত হয়। ভাষা (বিশেষত অসম্ভব রকমের উন্নত ভাষা, মানব সভ্যতার ভাষা) আমাদের সমগ্র জ্ঞানকাণ্ড ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত – স্যসুরের চিহ্নতত্ত্ব আলোচনার সূত্রেই ভাষার (ওনার মতে চিহ্নের) এই প্রকাণ্ড ক্ষমতা বিষয়ে আমরা গত অধ্যায়েই

---

[৯৪] আবু সয়ীদ আয়ুব, *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, (সম্পা- ধনঞ্জয় দাশ), কোলকাতা, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৬৪৩

[৯৫] Attridge Derek, The *Singularity of Literature,* Routledge, London, 2004, p - 3

[৯৬] Attridge Derek, The *Singularity of Literature,* Routledge, London, 2004, p -18

পরিচিত হয়েছি। যেহেতু Attridge সৃজনকে মনস্তাত্ত্বিক, চেতনামূলক কিংবা নান্দনিক অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে রাজি হন না - ব্যক্তির আপন মানসিক জগতের বাইরে অপরতার সম্ভাবনার ভিত্তিতে তিনি সৃজনকে ভাবতে চান। সেই হেতু সৃজনের এই প্রক্রিয়া যেন এককথায় একপ্রকারের 'না-থাকা'র, থাকার মধ্যে এসে জুটে যাওয়া। তিনি লিখছেন –

"an element of letting them come as much as seeking them out"[৯৭]

যে জুটে যাওয়া বা জুড়ে যাওয়ার কথা বললাম, তার যুক্তিটা কতকটা এরকম - যেন লেখক লিখতে লিখতে লেখাকে অজানার অনুসন্ধানে উন্মুক্ত করতে চান আর একই সঙ্গে যেন অজানাও জুটে যাওয়ার উপক্রমে ছুটে আসে, এ যেন এক আহ্বানের, এক নিমন্ত্রণের প্রক্রিয়া। এর সঙ্গেই সাহিত্যের নতুনত্বের তত্ত্বও জড়িয়ে আছে। নতুন যেন এই নিমন্ত্রণের শর্তের ভিত্তিতেই যৌক্তিক পরাকাষ্ঠায় নির্মাণযোগ্য বা বিশ্লেষণাত্মক সংজ্ঞার অধিকারী। তাহলে লেখকের প্রকাশ যেন একরকমের আহ্বান এবং একই সঙ্গে অনুসন্ধান। যৌক্তিক ক্রমকে সাজিয়ে সাজিয়ে বুঝে নিতে পারলে, সৃষ্টির আপাত অলৌকিক এবং মহিমান্বিত প্রক্রিয়া যেন ততটাও দুর্ভেদ্য নয়, যতটা দুর্ভেদ্য বা মোহিনীমায়া হিসেবে প্রগতিশীল বা মার্ক্সবাদীরা তাকে নিন্দা করার চেষ্টা করেন। যে অপরের বিষয়ে Attridge কথা বলতে চাইছিলেন, তার বিষয়ে তিনি নির্দিষ্ট ভাবে লিখছেন –

"there is no absolute other if this means a wholly transcended other, unrelated to any empirical particularity – or if there is it is a matter of religious faith alone".[৯৮]

এই পর্যন্ত আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না। অতএব 'সাহিত্যের মূল্য' (অর্থাৎ সাহিত্য কী এবং সাহিত্য কেন?) ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে সাহিত্য যদি সৃজনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় অর্থাৎ যাকে সাহিত্য বলছি তার প্রধানতম শর্তগুলির একটা যদি সৃজন হয় এবং সৃজন বিষয়ে এতক্ষণ যে কথাগুলি বললাম সেভাবে যদি সৃজনকে বুঝে নেওয়া যায় - সেক্ষেত্রেও Attridge-এর গুরুত্বপূর্ণ মতামত আছে,

"...If value is to be accorded to the welcoming of the other, it has to be in terms of the benefits of change itself"[৯৯] .

দেরিদার নতুনত্ব এবং iterability-র দর্শন কিভাবে Attridge-এর এই তর্কের সঙ্গে সংযুক্ত, সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যাবে, দেরিদার সাইকি-র ধারণা সম্পূর্ণরূপে Attridge-এর সাহিত্য-চিন্তার গভীরে বিচরণ করছে। সাহিত্যের মূল্য প্রসঙ্গেই সৃজনের আবশ্যিকতার দিকে নজর ফিরিয়ে

---

[৯৭] Attridge Derek, *The Singularity of Literature,* Routledge, London, 2004, p -23

[৯৮] Attridge Derek*, The Singularity of Literature,* Routledge, London, 2004, p – 29

[৯৯] Attridge Derek*, The Singularity of Literature,* Routledge, London, 2004, p -31

Attridge বলছেন – “...the other is that which knowable until by a creative act it is brought into the field of the same”[১০০]. নতুনত্ব, অপরত্ব ও সৃজনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিকে অ্যাট্রিজ ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছেন। পরে, তিনি তাঁর বইয়ের সিঙ্গুলারিটি আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন কিভাবে সাহিত্যের এককতার প্রশ্নে সংস্কৃতির গুরুত্বকে তিনি দেখছেন। তাঁর এই সংস্কৃতি তত্ত্বও দেরিদা দ্বারা প্রভাবিত সন্দেহ নেই। সাহিত্যের এককতা বা অনন্যতা আসলে একধরণের ‘Ideoculture’ (এই ধারণা Attridge-এর নিজস্ব। ‘মতাদর্শ’ ও ‘সংস্কৃতি’র মিলমিশে এই ধারণার জন্ম)। লেখক বা পাঠক যাই হোক না কেন, সাহিত্যে অপরের সঙ্গে Encounter বা সাক্ষাত - দেরিদীয় দর্শনের ভাষায় আসলে Invention, যে ধারণাতে Attridge বার বার ফিরে এসেছেন। আবিষ্কারের ধারণাটি ঠিক কেমন, দেরিদা সে বিষয়ে তাঁর ‘Psyche: Invention of the Other’ - লেখায় গভীর ভাবে আলোচনা করেছেন। দেরিদার মতে এই আবিষ্কার আসলে আত্ম ও অপর উভয়েরই আবিষ্কার এবং এই আবিষ্কার কিভাবে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত কিংবা ভৌগোলিক আবিষ্কারের থেকে ভিন্ন, সেকথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। Attridge তাঁর গ্রন্থের ‘Originality and Invention’ – অংশে লিখেছেন,

“...an advantage of the word invention for our purpose is that like creation the same term is used for both an event and its result – so that our name for the object brought into being, when perceived as an invention, does not entirely divorced it from the process of making”[১০১].

সৃজন এবং উদ্ভাবন বা আবিষ্কার যেন একইসঙ্গে প্রক্রিয়া এবং ফলাফল - এই দুটি অর্থেই একত্রে বুঝতে চাইছেন Attridge. গত অধ্যায়ে আমরা যখন একই সঙ্গে ছিন্নপত্রের সেই আবছায়া লিখণতত্ব এবং মানিকের অভিজ্ঞতা ও লেখার প্রক্রিয়াকে, অমিয়ভূষণের মনঃসমীক্ষণের ও প্রক্রিয়াবাদের তর্কের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করার চেষ্টা করছিলাম, তখনও আমরা সৃজনের এই নির্দিষ্ট দ্বিবিধ দ্যোতনার মধ্যেই যেন বার বার আলোচনাটিকে খুঁজে পাচ্ছিলাম। এই গ্রন্থে তিনি সৃজন নিয়ে আরও অনেক কথা বলেছেন কিন্তু মূল যে উদাহরণটা তিনি টেনেছেন সেটা কোয়েটজির ‘ডাবলিং দ্য পয়েন্ট’ লেখার অংশ থেকে এবং সেটাই ওনার তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে আমার মনে হয়। কোয়েটজি লিখছেন,

“As you write – I am speaking of any kind of writing – you have a feel of whether you are getting closer to “it” or not...It is naïve to think that writing is a simple two stage process : first you decide what you want to say then you say it. On the contrary, as all of us know, you write because you do not know what you want to say. Writing reveals to

[১০০] Attridge Derek, *The Singularity of Literature,* Routledge, London, 2004, p - 31

[১০১] Attridge Derek, *The Singularity of Literature,* Routledge, London, 2004, p - 42

you what you wanted to say in the first place. In fact, it sometimes constructs what you want or wanted to say. What it reveals or assert may be quite different from what you thought (or half thought) you wanted to say in the first place. That is the sense in which one can say that writing writes us. Writing shows or creates (and we are not always sure we can tell one from the other) what our desire was, a moment ago."[১০২]

আমাদের পূর্বের আলোচনাই যেন আবার ফিরে আসছে এখানে, একপ্রকারের না-থাকা যেন, থাকার মধ্যে এসে জুটছে। তাহলে সৃজনের সঙ্গে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার যে অবধারিত সম্বন্ধ ছিল আইয়ুবের লেখায় (তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা আবার ফিরে আসব এই প্রসঙ্গে) কিংবা মার্ক্সবাদী সমালোচনায় বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যেও যে প্রবণতা ছিল, তার থেকে এই সৃজনের ধারণা আলাদা। অ্যাট্রিজের চিন্তার পিছনে একটা বড় অংশে দেরিদা ও বি-নির্মাণবাদী দর্শন আছে সেকথা আগেই লিখেছি। 'সাইকি : দ্য ইনভেনশন অফ দি আদার' প্রবন্ধে, দেরিদা অপরের সঙ্গে সাক্ষাত ও ইনভেনশনের কথা বলেছিলেন। এই আবিষ্কারের পদ্ধতিটা কেবল এরকম নয় যে, আমি সেলফ বসে লিখছি, নিজেকে মেলে ধরছি আর অজানা, অপরের সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাত হচ্ছে, দৈবিক ভাবে। হয়ত কিছুটা সেরকমই কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিষয়টা সেরকম নয়। কোয়েটজি লিখনের ক্ষেত্রে বিষয়টাকে আরেকভাবে ভাবার চেষ্টা করেছেন। সাক্ষাত আসলে একই সঙ্গে আত্ম এবং পর উভয়ের আবিষ্কারের প্রশ্ন (আগেই উল্লেখ করেছি), যেন আবিষ্কারকেই আবিষ্কারের প্রশ্ন, জগত আবিষ্কারের প্রশ্ন - অর্থাৎ অপর এমন কিছু না যাকে সচেতন ভাবে আজকে আবিষ্কার করতে বসলাম বলে আবিষ্কার 'করা' হবে। দেরিদার ভাষায় –

"The other is indeed what is not inventible and it is then the only invention in the world, the only invention of the world, our invention, the invention that invents us... For the other is always another origin of the world and we are always still to be invented and the being of we and Being itself. Beyond being"[১০৩]

এই আবিষ্কার যেন বা একটা ভাগ বাটোয়ারা করে নেওয়া অস্তিত্বের কথা বলে, আমাদের কথা বলে, এই আমরার মধ্যে নিশ্চিত রূপে বহুর অবকাশ আছে; কিন্তু এই আবিষ্কার প্রকারান্তরে, এক ভাবে দেখলে Transcendental বা উৎক্রান্তি মূলক। Acts of Literature –এ অ্যাট্রিজ দেরিদাকে এই বিষয়ে একটা প্রশ্ন করেছেন,

---

[১০২] Attridge Derek, *The Singularity of Literature,* Routledge, London, 2004, p - 23

[১০৩] Derrida Jacques, *Acts of Literature*, Routledge, London, 1992, P- 42

"For Certain literary theorists and critics who associate themselves with deconstruction, a text is "literary" or "poetic" when it resists a transcendental reading ..."[১০৪]

দেরিদা উত্তরে বলেছিলেন,

"I believe no text resists it absolutely..." [১০৫]

দেরিদা, তাঁর 'সাইকি : ইনভেশন অফ দি আদার' লেখাটিতে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন - তাঁর ইনভেনশনের ধারণা কখনই Onto-theological নয়, অর্থাৎ এখানে দেরিদার উত্তরণ-ধর্মীতা অন্য একরকমের অর্থে ব্যবহৃত যেন। তথাকথিত ধার্মিক যা কিছু, দেরিদার দর্শন সেইসব কিছুর সোজাসাপটা কোন অনুরণন নয়। যাইহোক, এই আলোচনা থেকে আমরা যদি আপাতত, সৃজনের একটা অর্থ এভাবে করি যে - সৃজন আসলে আর কিছু নয় লেখার মধ্যে দিয়ে, নতুনত্বের, অজানার, আবিষ্কারের পথকে খুলে দেওয়া। সেক্ষেত্রে সৃজন কিছুতেই ব্যক্তি লেখকের প্রতিভায় এসে লঘূকৃত হয়না বলেই আমার ধারণা। মানিকের প্রবন্ধ ঘিরে যে আলোচনা আমরা করছিলাম, তাতে সাহিত্যে সৃজনের যে ভূমিকা – তার আরেকরকমের একটা ব্যাখ্যা করা যায়, এই প্রসঙ্গে পরে আরেকবার, ফিরব।

আপাতত আলোচনার সূত্রে, Derek Attridge –এর সাহিত্য-চিন্তা নিয়ে খানিকটা আলোচনা করে নেব আমরা। যেহেতু এই বি-নির্মাণবাদী সাহিত্য-দর্শনই প্রধানত আমাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাই এখানে সে বিষয়ে কিছুটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে নেওয়া প্রয়োজন। এরপর আমরা আবার সৃজনের আরেকরকম বিশ্লেষণের দিকে মুখ ফেরাব।

Attridge-এর বি-নির্মাণবাদী সাহিত্য-চিন্তার উপর ভিত্তি করে লিখিত প্রধান দুটি গ্রন্থ হল – 'Singularity of literature' এবং *The work of literature.* Attridge-এর মতে,

'Literature doesn't name an object, but an experience that involves a particular type of engagement between a mind and a text; and its necessary feature of that experience that it challenges fixed boundaries and firm predictions.'[১০৬]

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টত দুটি দিক আমরা বুঝে নিতে পারি, একাধারে সাহিত্যের ঐতিহাসিক ভাবে প্রকরণগত কতগুলি শর্ত আছে, যে শর্তগুলিকে লঙ্ঘন করে করে বিভিন্নরূপে ফুটে ওঠাই সাহিত্যের লক্ষণ। যে কারণে সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ণয় যথেষ্ট শক্ত। অন্য দিকে কোন একটি লেখার সাহিত্য হয়ে ওঠার মধ্যে সিংহভাগ কর্তব্য থেকে যায় পাঠকের, সমালোচকের। কোন একটা লেখার সাহিত্য হয়ে ওঠার বা বলা বাহুল্য সাহিত্যের একটি

---

[১০৪] Attridge Derek*, Acts of Literature*, Routledge, London, 1992, P- 47

[১০৫] Derrida Jacques*, Acts of Literature*, Routledge, London, 1992, P- 47

[১০৬] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017, p- 24

প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার কর্মকাণ্ডে, আসলে সিংহভাগ দ্বায় আছে পাঠককুলের| পাঠ্যের সঙ্গে পাঠকের সংযুক্তিতে, বিচারে, বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে সাহিত্য নামক প্রতিষ্ঠানটি এবং এই দিক থেকে দেখলে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের কাঠামোগত বিন্যাস। এই বিষয়টি সর্বত্রই মূলত একই রকম। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে Attridge পঠনকে বলবেন এক ধরণের কাজ (act), আবার পাঠ যে একাধারে অবিস্মরণীয় এক অভিজ্ঞতা, ঘটনা সে নিয়ে কোন সন্দেহ নেই –

'…the experience of a powerful literary work does feel like an event, something that happens to the reader, it also of course an act'[১০৭]

Attridge- এর সাহিত্য-চিন্তা অনুসারে যখন আমরা সৃজনশীল লিখনের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম, তখনও 'act-event' –এর ধারণা একইরকম ভাবে উঠে এসেছিল। সৃজন যেন কেবলমাত্র কাজই নয়, এমন কিছুও যা ঘটে যায়, যা অনুমানের অতীত। একইভাবে উনি পঠনকেও বর্ণনা করবেন,

"The mode of reading that allows the literary work to be experienced as literature is not easy to describe. As well as an act of interpreting the visual or aural signifiers, as in all reading, there is, in a literary response, an act that I can only describe as willed passivity: an opening-up , a loosing of constraining frameworks, a readiness to be surprised and changed…I've found myself usuing the awkward term 'act-event' to refer to the reader's engagement with the text, an engagement in which the work comes into being as a work of literature. "[১০৮]

এই চিন্তাই ওনার তত্ত্বে ঘুরে ফিরে আসে। কিন্তু Author অর্থে সাহিত্য-লেখকের যে কর্তৃত্ববাদী ধারণা সে বিষয়ে Attridge বলবেন,

"I may not know who the author is, or have nothing more than a name to go on, but the words have the quality of what I've called *authoredness*. (Kant's notion of 'purposiveness without purpose' bears some relation to this idea, though Kant finds this quality in nature as well as – and more importantly than - in art.) And when its literature that, I'm reading this dimension is particularly important, because my awareness is of the author's inventive activity. So, in referring to literary usage of language I like the word *work*, with its implications that that creative labor is not something left behind but something sensed in the reading. The other important implication of the term *work* is, as I've said, that the work's existence – its ontological status, if you like – is not as an object but as an event; *work* can be a verb after all. If I wanted to

[১০৭] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017, p- 2

[১০৮] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017, p- 2

be pedantic, I would use working instead; and it might be helpful to hear this behind my use of the shorter word."[১০৯]

তাহলে লেখকত্ব এবং কাজের ধারণার গভীরতা আরও স্পষ্ট হচ্ছে এখানে, Attridge পঠনের ক্ষেত্রে এবং লিখনের ক্ষেত্রে যাকে 'Act-event' বলবেন, দেখা যাচ্ছে, ওনার 'work' বা কাজের ধারণার মধ্যেও সেই দ্যোতনা বর্তমান। একাধারে যেন কর্তৃত্ববাদী লেখক-ত্ব থেকে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রয়োজন, অন্যদিকে সৃজনশীল লেখকত্বকে বজায় রাখার তাগিদ। ফরাসি সাহিত্য-চিন্তক মরিস ব্লাশোঁর চিন্তায় - কাজ এবং শিল্পের মধ্যে তফাৎ ছিল, সেই তফাৎ কেই যেন Attridge – তাঁর আলোচনায় তুলে ধরছেন। Passivity-র শর্তেই কাজ এবং শিল্পের সংযোগেই Attridge –এর 'Work'- এর ধারণা সংগঠিত হচ্ছে। উনি আরও বলবেন যে, ফরাসি ভাষায় 'Experience' এবং 'Experiment' শব্দ দুটি একই ধরণের অর্থ উৎপাদনে সক্ষম। Attridge দেখিয়েছেন, জার্মান দার্শনিক থিওডোর অ্যাডর্ণো, তাঁর নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় বলেছিলেন –

"Aesthetic experience first of all places the observer at distance from the object"[১১০]

এখানেও নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে কি আমরা মুহূর্তের বা তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে এক করে দেখতে পারি? সেই প্রশ্ন নিয়েও অ্যাট্রিজ আলোচনা করেছেন। উনি দেখাচ্ছেন, অ্যাডর্নোর ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বা হাতের কাছের অভিজ্ঞতার থেকেও বেশি জরুরি তার ঐতিহাসিক বিচার। Krzysztof Ziarek –এর লেখার উদাহরণ টেনে দেখাচ্ছেন, নান্দনিক অভিজ্ঞতা আসলে, মনঃসমীক্ষণ বা তথ্য-নিষ্ঠ অভিজ্ঞতার সঙ্গে এক ভাবে বিচার করা চলেনা বরং কাব্যিক অভিজ্ঞতা বলা চলে হয়ত। অর্থাৎ এটা একটা আলাদা শাখা, আলাদা অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হই এখানে। লেখক-ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে অ্যাট্রিজ সৃজনশীল শ্রমের কথা লিখেছিলেন। এরপর জন ডানের সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, ভালোবাসার শ্রমের কথা। প্রকারান্তরে এসকলই নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে বুঝবার নানাবিধ প্রচেষ্টা। প্রসঙ্গত তিনি Margaret Boden –এর 'Historical creativity' এবং 'Psychological creativity' – বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আবারও বলি, গত অধ্যায়ে লিখনের যে অপরিমেয় শ্রম বিষয়ে আমরা তর্ক তুলেছিলাম। যে অভিজ্ঞতা – পরিমাপের সছিদ্র কাঠামোর দিকে আঙুল তোলে, তাকে বুঝবার, তার পরিভাষা খুঁজে নেওয়ার তাগিদেই চিন্তকেরা লিখেছেন এবং অ্যাট্রিজ সেগুলিকে, ওনার তাত্ত্বিক কাঠামোয় নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছেন। এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে দেরিদীয় নতুনত্ব বা 'Novelty'-র ধারণা। কিন্তু কেন উনি নতুনত্ব বিষয়ে আলোচনা করতে চাননা, সে বিষয়ে মিশেল নর্থ-এর প্রসঙ্গ টেনে লিখেছেন –

[১০৯] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford Unversity Press, UK, 2017

[১১০] Attridge Derek, *The Work of Literature,* Oxford University Press, UK, 2017, p-95

"The logical problem north identifies in any concept of the 'new' – nothing can be new in itself…what is regarded as new is often a repetition of something old; 'invention' with its previous meaning of 'finding' and its links with words like 'advent' and 'event' – from the Latin *venire* 'to come'- is truer to the phenomenon I'm describing. (Readers of Derrida will recognize my indebtedness to his essay 'Psyche'.)" [১১১]

আবারও দেরিদার সেই 'সাইকি' লেখাটির উল্লেখ ফিরে এলো। প্রধানত অ্যাট্রিজের মূল তত্ত্বায়ণের গভীরে এই লেখারই রণন কার্যকরী। কিন্তু নতুনত্বকে আলাদা করে একেবারেই চিন্তা করা অসম্ভব কিনা সেবিষয়ে তর্ক আছে এবং থাকাই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যেহেতু আবারও দেরিদার 'সাইকি' নামক লেখাটির প্রসঙ্গ ফিরে এলো - দেরিদার 'To come'-এর ধারণা তাহলে অ্যাট্রিজের নান্দনিক অভিজ্ঞতার অন্তরে কাজ করে চলেছে, 'To come' – আসলে দেরিদার উল্লেখিত লেখাটির মধ্যেকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এই প্রসঙ্গে আমরা পরবর্তী কালে আবার অন্যভাবে ফিরে আসবো। এমনকি যখন অ্যাট্রিজকে প্রশ্ন করা হয় - উনি কি ওনার এই সাহিত্যতত্ত্বের কোন বাস্তবিক উদাহরণ দিতে পারবেন – তার উত্তরে উনি তাঁর 'Work of Literature' –এ সাহিত্য আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। অ্যাট্রিজের নিজস্ব চিন্তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দুটি চিন্তা – প্রথমত, 'Singularity' এবং দ্বিতীয়ত, 'Ideoculture'। অ্যাট্রিজের কাছে অনন্যতা('Singularity'), বিশিষ্ট এবং ব্যক্তিগতের থেকে ভিন্ন। তাঁর কাছে এককত্বের মধ্যে বহুর সম্ভাবনা নিহিত, নিমজ্জিত। সাহিত্যের একক হয়ে ওঠা একটা আবিষ্কার-ধর্মীতার প্রশ্ন। যে তর্ক এতক্ষণ ধরে আমরা করছিলাম, সেই তর্কের উপর ভিত্তি করেই অ্যাট্রিজ সাহিত্যের এককত্বকে প্রতিষ্ঠা করবেন। অর্থাৎ লিখনের উন্মোচন ও আবিষ্কার-ধর্মীতা, অপরের প্রতি আহ্বানের প্রক্রিয়া এবং এই অর্থে লেখার মুক্তি – ইত্যাদির ধারণার মধ্যেই সাহিত্যের এককত্বের প্রসঙ্গের কথা লিখবেন অ্যাট্রিজ।

'Ideoculture' –এর ধারণা প্রধানত মতাদর্শ বা Ideology এবং Culture বা সংস্কৃতির সংমিশ্রণে রচিত এক ধারণা। ওনার মতে পাঠক কিংবা লেখকের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকেই সাহিত্যের আবিষ্কারবৃত্তি প্রভাবিত হয়। সেই পরিমণ্ডল না পেলে, সাহিত্য নিজেকে অতিক্রম করে যেতে পারেনা। এই দর্শনের মধ্যে যে Cultural turn-এর প্রভাব লুকিয়ে আছে, তা দেরিদার দর্শনে অবশ্যই প্রচ্ছন্নরূপে উপস্থিত ছিল। অপরের প্রতি যে কর্তব্যপরায়ণতা বা সচেতন এক সঙ্গীমনস্কতা যাকে দেরিদীয় দর্শনে Responsibility – বলা হবে, সেটাই অ্যাট্রিজের সাহিত্য চিন্তার প্রধান রাজনৈতিক অভিঘাত। এই কর্তব্যবোধ তথাকথিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক উত্তরণধর্মীতাকে (যেটা কান্টের ভাবনায় অল্পবিস্তর উপস্থিত ছিল) পুনঃ-পাঠের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠা। ইহুদি দার্শনিক ইমানুয়েল লেভিনাসের 'অপর'তত্ত্ব –এর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে দেরিদা অপরের প্রতি কর্তব্যপরায়নতার কথা বারং বার

---

[১১১] Attridge Derek, *The Work of Literature,* Oxford, UK, 2017,p-24

বলেছেন তাঁর লেখায়[১১২]। এই সূত্রেই অ্যাট্রিজ বলবেন, অপরের প্রসঙ্গের সঙ্গেই সংযুক্ত একধরণের নৈতিকতার কথা। এই নৈতিকতা প্রথাগত ভালো-মন্দের বোধকে ছিন্নভিন্ন করে, তথাপি 'ন্যায়'-এর বোধকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেনা। এই ধরণের নৈতিকতা জটিল এবং তীব্র অর্থে রাজনৈতিক।

কিন্তু এই আলোচনার মধ্যেই অ্যাট্রিজ, শৈল্পিক কাজ এবং নান্দনিক বস্তুর তফাত বিষয়েও কথা বলেছেন – 'Mike Dufreme'-এর প্রসঙ্গ টেনেছেন। একই সঙ্গে উনি উত্তর-উপনিবেশবাদ এবং বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষিতে, Franco Moretti- র 'Distant reading'- এর কথা লিখেছেন এবং পাশাপাশি রঁসিয়ের রাজনীতি এবং নান্দনিকের ধারণার কথাও লিখছেন[১১৩]। অর্থাৎ আমাদের গবেষণায় এতখানি আলোচনার সুযোগ না থাকলেও, কেবল ইঙ্গিতটুকু দিয়ে রাখতে চাই, যে অ্যাট্রিজ তাঁর সমসাময়িক জরুরী সাহিত্য-চিন্তকদের পাঠ করে, তবেই নিজের যুক্তিগুলিকে সাজাচ্ছেন। অ্যাট্রিজকে দেরিদার অনুসারী সাহিত্য-চিন্তক বললে অনেকটাই কম বলা হয়ে যায়, অ্যাট্রিজ এই শতকের একজন অনন্য সাহিত্য-দার্শনিক।

অপরের প্রতি 'উন্মুক্ত' হওয়া 'কর্তব্যপরায়নতা'র অন্য আরেকটি দিক। এই দুটির একত্র অবস্থান ভিন্ন আবিষ্কার অকেজ হয়ে যায়। একটি পাঠ্যকে বার বার পড়ার মধ্যে দিয়ে আসলে সমালোচক নিজেই বদলে বদলে যেতে থাকেন, যেমন পাঠক বহুদিন পর একই পাঠের অন্য অর্থ খুঁজে পান। পাঠের ও পাঠকের দীর্ঘ বিশ্লেষণ ওনার কাজের মূলধন। কিভাবে পাঠ ন্যায্যতা দিতে পারে সাহিত্যকে, কিভাবে অপরের প্রতি উন্মুক্ত হতে পারে পাঠ, সে বিষয়ে – দেরিদা'র 'Force of the Law'- লেখা থেকে ন্যায়ের ধারণা উদ্ধার করে এনেছেন অ্যাট্রিজ। যে ধারণাও প্রধানত অপরের প্রতি কর্তব্যপরায়নতাকেই ন্যায়ের সমর্পণ-শর্ত রূপে প্রতিষ্ঠা করে[১১৪]।

এছাড়াও আরও দুটি বিষয়ে ওনার আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ – এক। সাহিত্য ও জ্ঞানের সম্বন্ধ (এখানে ওনার আলোচনায় জরুরি চিন্তক মার্টিন হেইডেগার) এবং সাহিত্য ও 'Affect' বা অনুভূতির সম্বন্ধ। উনি 'Affect'-কে বলবেন, জটিল ইন্দ্রিয়ানুভুতির সমাহার, যা বাস্তবতা বোধকে আঘাত করে। ঘটনা অথবা ওনার ভাষায় 'কার্য-ঘটনা'-র[115] সঙ্গে অনুভূতি নাছোড় জোড়ে সংযুক্ত। অ্যাট্রিজের 'সিঙ্গুলারিটি অফ লিটারেচার' গ্রন্থের প্রধান জোর ছিল, কর্তব্যপরায়ণতা এবং নীতির উপর। ন্যায় ও ন্যায্যতার প্রসঙ্গ সেখানেও ছিল কিন্তু ওনার 'Work of Literature'- গ্রন্থটি, আসলে জোর দিয়েছে - অপরের প্রতি আহ্বান, নিমন্ত্রণ ও ন্যায়ের মধ্যেকার সম্বন্ধের উপর, যাকে বি-নির্মাণবাদীরা বলেন – 'Hospitality'। এখানে অ্যাট্রিজ 'Hospitality' বিষয়ে অনেক বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করেছেন। বিশেষত দেরিদার শেষ জীবনের লেখালিখিগুলি তাঁর আলোচনায় ফিরে ফিরে এসেছে।

[১১২] Attridge Derek, The *Singularity of Literature,* Routledge, London, 2004, p – 28-34.

[১১৩] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017, p-100.

[১১৪] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017,p-114

[১১৫] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017,p-1-3

আমরা বিশেষত এই তর্কটিকে তৃতীয় অধ্যায়ের জন্য মুলতুবি রাখলাম। আপাতত আবার ফিরে যাই মার্ক্সবাদ ও সৃজনের তর্কে।

ভুলে গেলে চলবে না যে, 'সৃজন' শব্দের ব্যবহার মার্ক্সবাদীরা প্রত্যাহার করেছিলেন প্রায়' - কারণ উৎপাদনের বস্তুবাদী দর্শনের প্রেক্ষিতে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সৃজন একটি ভাববাদী ভাঁওতা হিসেবে প্রতিপন্ন হয় বলে তাদের ধারণা ছিল। এ প্রসঙ্গে মানিকের 'লেখকের কথা' গ্রন্থের 'প্রতিভা' নিবন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ কটাক্ষ আছে। মানিক লিখছেন (এ বিষয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি),

"বড় বৈজ্ঞানিকের 'বৈজ্ঞানিক প্রতিভা' থাকে কিন্তু বড় কবি নিজেই প্রতিভা। বৈজ্ঞানিকের বেলা প্রতিভার অর্থ বিশেষ ক্ষমতা, কবির বেলা প্রতিভার অর্থ দুর্বোধ্য একটা গুণ।"[১১৬]

মানিক বলতে চাইবেন কবি হোক কিংবা বৈজ্ঞানিক, উভয়ের ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ এবং তথাকথিত জটিল কাজের পারঙ্গমতা আছে, সেই হেতু উভয়েই প্রতিভাবান। প্রতিভা কোন অলৌকিক মহিমাদ্ভুত কিছু নয়। এই তর্কেই আরও একটি স্তর আমরা খুঁজে পাই যখন তাকে দেরিদীয় চিন্তার প্রেক্ষিতে পাঠ করি। সেদিক থেকে দেখলে বিজ্ঞান এবং শিল্প-সাহিত্যের প্রতিভা একরকমের নয়। কারণ দুটো বিষয় প্রকরণগত ভাবে আলাদা এবং শর্তগত ভাবে একে অন্যের বিরোধী। যদিও মানিক ব্যক্তিগত ভাবে এটা স্বীকার করবেন না, উনি মনে করতে চাইবেন, ওনার বিজ্ঞানের প্রতি কৌতূহল এবং সাহিত্যের প্রতি কৌতূহল– একই প্রতিভার ফলাফল।

কিন্তু যখন দেরিদা দর্শন ও সাহিত্যের তফাতের প্রসঙ্গে কথা বলেন, তখন আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিভার এত রমরমা কিসের জন্য, তা খানিকটা বুঝতে পারি। দর্শন এবং বিজ্ঞান উভয়ের যে সন্দর্ভগত এবং বিশ্লেষণাত্মক চৌহদ্দি, সত্য যেন বার বার সেই চৌহদ্দির ফাঁক গলে পিছলে যেতে থাকে, কিছুতেই তার নাগাল পাওয়া যায়না, ফলত শিল্প কিংবা সাহিত্যকে যেন এই চৌহদ্দির অতিরিক্ত কিছু একটার হদিশ বলে মনে করা যায়, কারণ যে এই সীমানা লঙ্ঘন করে সত্যের গহ্বরে সরাসরি ঢুকে পড়তে চায়, সে পূর্বাপর কোন পরম্পরার তোয়াক্কা করতে নারাজ যেন। এই সরাটত্ব, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব যেন সাহিত্যের এক তুমুল সম্ভাবনা বিশেষ। এই শর্তেই সাহিত্য সেই প্রতিভাময়তার দাবি জানিয়ে থাকে। কিন্তু পূর্ববর্তী যাদের নিয়ে আলোচনা করেছি এবং পরবর্তীতে যাদের নিয়ে আলোচনা করব, সকলের ক্ষেত্রেই আমরা দেখব, সাহিত্যের সংজ্ঞা কিছুতেই বেঁধে দেওয়া সম্ভবপর নয়। সৃজনশীল লিখনের সত্যকার অভিঘাত নিজেই যেন সাহিত্যের ঘেরাটোপগুলিকে লঙ্ঘন করে দিতে চায় সর্বদাই। এই অর্থে, সে সর্বদাই অন্য কিছু একটা হয়ে উঠতে চায়। সেই সূত্রে লিখন - বচনের উপস্থিতির বা তথাকথিত সত্যের খুব জটিল এক বিকল্প, উন্মুক্ত বিকল্প, যার সংজ্ঞা সে ক্রমাগত ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যই গড়ে তুলতে থাকে যেন। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, সাহিত্যের এত বড় ক্ষেত্র ছেড়ে এসে তিনি সত্যের প্রকাশ খুঁজে পাচ্ছেন,

---

[১১৬] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স, কোলকাতা, ১৯৫৭ পৃ-৪৬

সামান্য এক চিঠির মধ্যে। তখন আমরা লিখনের তীব্র জটিল এক রহস্যের সন্ধান পাই। বুঝতে পারি, সাহিত্য কি, একথা কোনদিনই বুঝে ওঠা যাবেনা, যদি না আমরা 'লেখার কাজ কি? – এই প্রশ্নটিকে সম্যকরূপে কেটে ছিঁড়ে বুঝে নিতে পারি। ফলত যে জটিল দ্বান্দ্বিক ও তার্কিক পরিসরে আমরা উপনীত হলাম, সেখানে একবাক্যে প্রতিভার মহিমাকে মেনেও নেওয়া যায়না আবার সাহিত্যে সৃজনের আবশ্যিকতাকে মার্ক্সবাদীদের মত অস্বীকারও করা যায়না। এ প্রসঙ্গে আরেকটু আলোচনা করা যাক -

বিভিন্ন মার্ক্সবাদীদের মতই রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁর 'উৎপাদন ও নির্মাণ'[১১৭] নামক লেখায় দেখিয়েছেন, কিভাবে নির্মাণের প্রশ্ন আসলে, শ্রমের ব্যবহারিক মূল্যের প্রসঙ্গকে একভাবে নির্দেশ করে এবং সর্বোপরি নন্দনতত্ত্বের প্রসঙ্গকে ফিরিয়ে আনে – আপাতত এই তথ্যের উল্লেখ করলাম কেবল, তথাকথিত সৃজনের ধারণা একভাবে নির্মাণের ধারণা হিসেবে এসেছে যেন তাঁর গ্রন্থে, কিন্তু একভাবে দেখলে সাধারণ মার্ক্সবাদীদের প্রধান নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনেই রামকৃষ্ণ এই লেখাটি লিখেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'থিওরি অফ লিটেরারি প্রোডাকশন' গ্রন্থের, 'ক্রিয়েশন ও প্রোডাকশন' অংশে পিয়েরে মাশেরে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন –

"Anthropology is merely an improvised and inverted theology…according to that inversion, the opposite of man as creator is alienated man : deprived of himself become other"[১১৮]

মাশেরে এখানে দেখাবেন, যে সৃজন আসলে becoming oneself এবং উৎপাদন হচ্ছে becoming other এবং তিনি মার্ক্সবাদের চিরাচরিত শর্তকে মাথায় রেখেই, উৎপাদন দিয়ে সৃজনকে replace করার কথা বলবেন। অর্থাৎ সৃজনের প্রক্রিয়ায় যেন লেখক নিজেকে খুঁজে পান এরকম এক অহংবাদী ভাবতাত্ত্বিক ভাঁওতার বিপরীতে কতকটা মানিকের মত চরাও হয়েই তিনি বলবেন, সাহিত্যকে উৎপাদন হিসেবে দেখার মধ্যেই আসলে অপর হয়ে ওঠার আসল তত্ত্ব নিহিত, অতএব সৃজনের ধারণাকে উৎপাদনের ধারণার দ্বারা উৎপাটন করা উচিত। আমরা বিশেষত এই replacement-এর ধারণার সঙ্গে একেবারেই সহমত নই এবং এখানে আমাদের অসম্মতিও বি-নির্মাণবাদী দর্শনেরই লক্ষণ, দেরিদা কখনোই কোন বিপরীত যুগ্মপদের অসামঞ্জস্যকে রুখে দিতে সেই যুগ্মপদকে উল্টে দেননি বরং বিনির্মাণের শর্তই হল বিপরীত যুগ্মপদের অসামঞ্জস্য বা অসাম্যকে অতিক্রম করে যাওয়া। বরং মাশেরে যেভাবে man creates-এর ধারণাকে আক্রমণ করেছেন,[১১৯] একটা বিশেষ মানবতাবাদী লঘূকরণকে আক্রমণ করছেন, সেটা আমাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ - যদিও মানবতাবাদ বিষয়ক তর্ক আমরা অনেকটাই গত অধ্যায়েই ছেড়ে এসেছি।

---

[১১৭] রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব, অবভাস, সেপ্টেম্বর - ২০১৭

[১১৮] Macherey Pierre, *A Theory of Literary Production*, Routledge, London, 1978, p-66

[১১৯] Macherey Pierre, *A Theory of Literary Production*, Routledge, London, 1978, p-67

তাহলে অপরের ধারণা আমাদের আলোচনায় মাশেরের থেকে একটু খানি আলাদা, সেটা বরং অনেকটাই সৃজনের সঙ্গে যুক্ত (আরও বিশেষ করে বললে লিখনের সাধারণ অর্থনীতির সঙ্গে) এবং যেখানে সৃজন আসলে ‘এক’ ও ‘অপর’-এর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করতে থাকে।

পূর্বের আলোচনায় দেখেছি ব্যক্তি লেখকের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা বা অক্ষমতার ভিত্তিতেই বাংলা সমালোচনা সাহিত্য, প্রধানত সাহিত্যের বিচার করে এসেছে। যদিও মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, বিনয় ঘোষের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা হল “বাংলা সমালোচনা”, যেখানে উনি দেখাচ্ছেন - কিভাবে, কয়েকটি আলগা ব্যতিক্রম ছাড়া। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সন্দর্ভই মার্ক্সবাদ পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যকে বয়ে নিয়ে এসেছে।

Singularity(অনন্যতা), Literary(সাহিত্যিক) এবং Language (ভাষা)

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে – সাহিত্যের ধারণা ঠিক কেমন ভাবে তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে – সেই বিশ্লেষণে প্রবেশ করার পূর্বে আলোচনা এবং বোধগম্যতার স্বার্থে – Singularity (অনন্যতা), Literary (সাহিত্যিক) এবং Language (ভাষা) -র ধারণাগুলিকে মোটের উপর কিভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব এবং এদের পারস্পরিক সম্বন্ধটাই বা কীরকম – সে বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করব। এক্ষেত্রে বিনির্মানবাদী চিন্তাবিদ ডেরেক অ্যাট্রিজের তত্ত্বই আমাদের প্রধান সম্বল।

প্রথমে আমরা অনন্যতার তত্ত্বটিকে কয়েকটি উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি –

‘I have found myself coming back again and again to two issues that have received much acknowledgement in passing but surprisingly little close attention as theoretical questions that extend well beyond the particular histories of artistic movements. The first of this is the roll of innovation in the history of western art; the second is the importance of readers, viewers and listeners of the uniqueness of individual art work and of artist’s oeuvre. I redefine these two widely acknowledged properties of art and about understanding of art under the names “invention” and “singularity”.’[১২০]

এবং এর পাশাপাশি অ্যাট্রিজ লিখেছেন –

“I see invention as inseparable from singularity…”[১২১]

অর্থাৎ - অনন্যতা আসলে আবিষ্কার, উদ্ভাবন, উন্মোচন, উদ্ঘাটনের মতই কিছুটা বিরল এবং মূল্যবান একটি ব্যাপার। প্রকারান্তরে অ্যাট্রিজ বলতে চাইছেন – সাহিত্য ও শিল্পের ইতিহাস যেন অনন্যতাকে যথাযথ ভাবে

[১২০] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017, P-2

[১২১] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017, P-2

আলোচনা করতে বা তত্ত্বালোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে চায়নি। অনন্যতাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা এবং তাকে বিশ্লেষন করার ক্ষেত্রে প্রধাণত যে বাধাটির কথা অ্যাট্রিজ বলবেন – সেটা হল ভাষার instrumentality (কেঠো ভাব)। পূর্বের অধ্যায়ে আমরা অমিয়ভূষণ মজুমদারের সংবাদ ও সংবিত্তির তফাতের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। সংবাদের মধ্যে যে বার্তা-সর্বস্বতা আছে – সেটাই যেন ভাষাকে একেবারে কেঠো, বোকা, স্থূল বানিয়ে রেখে দেয়। অনন্যতা আসলে ভাষার এই বার্তা-সর্বস্বতার মূলে আঘাত হানতে চায়।

"My quarrel with what I am terming instrumentalism is that it judges the literary work according to a pre-existing scheme of values, on a utilitarian model that reflects a primary interest somewhere other than in literature. If literature rests on a certain inaccessibility to rules, as the aesthetic tradition recognizes, there is no way it can serve as an instrument without at the same time challenging the basis of instrumentality itself." [১২২]

ভাষার প্রাত্যহিকী অর্থ-বাচকতার মধ্যে দিয়েই সাহিত্যকে নিজের কাজ চালাতে হয়। তথাপি সাহিত্য নিজেকে কেবলমাত্র বার্তাবাহক কেজো বা কেঠো করে রেখে দেয়না। এমন কিছু উন্মোচনের দিকে ধেয়ে যায় যা অনির্বচনীয় – যা বারং বার হয়ে উঠতে চায় অনন্য। পূর্বের অধ্যায়েই আমরা সাহিত্য এবং লিখনের সূত্রে ঘটনা বা "Event" -এর বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। অ্যাট্রিজ তার লেখায় ঘটনার অনন্যতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ওনার মতে অনন্যতা আসলে একটি ঘটনা বিশেষ। এই ঘটনার সঙ্গেই অপরের সংযোগ। অপরের প্রতি উন্মোচিত হওয়া – আসলে একটি অনন্য ঘটনা - উন্মোচন, উদ্ঘাটন আবিষ্কার বিশেষ –

"The other, the unprecedented, hitherto unimaginable disposition of cultural materials that comes into being in the event of invention, is always singular…"[১২৩]

অ্যাট্রিজ আরও লিখছেন,

" Singularity, that is to say, is generated not by a core of irreducible materiality or vein of sheer contingency to which the cultural frameworks we use cannot penetrate but by a configuration of general properties that, in constituting the entity (as it exists in a particular time and space), go beyond the possibilities pre-programmed by a cultural norm…"[১২৪]

সাহিত্য-বাচক, সাহিত্যিক বা "Literary"-র অনন্যতা বা Singularity- বলতে অ্যাট্রিজ কি বোঝাতে চেয়েছেন – এ প্রসঙ্গে সেটাও উল্লেখ্য –

---

[১২২] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017, P - 13

[১২৩] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017 , P – 63-68

[১২৪] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017, P – 63

" Literary singularity may be said to derive from – though it is much more than – the verbal particularity of the work : specific words in a specific arrangement (which may include spatial arrangement on the page or the use of pauses and other articulating devices in oral delivery)…singularity, to say it again, has to be understood, like alterity and invention, as an event."[125]

অর্থাৎ, সাহিত্যিক অনন্যতা – আসলে কোন বিশেষ ধরণের সাহিত্য বা শব্দের, ছন্দের সজ্জাকে বোঝায় না। সাহিত্যিক অনন্যতা আসলে আবিষ্কার, ঘটনা – উদ্ঘাটন।

"A literary work is singular not just in the sense that it is the only one to use these words in this order, or this syllabic pattern in this stanza – form: that would make singularity very cheap, as well as easy to analyze and to bring within the sphere of the same."[১২৬]

এক্ষেত্রে অ্যাট্রিজ যা লিখেছেন সেই বিষয়েই আমরা আলোচনা করছিলাম পূর্বে। অনন্যতার এই অজানা এবং অপরিমেয়তা-র প্রসঙ্গে Timothy Clark -তার "The Poetics of Singularity" – গ্রন্থে আরও কিছুটা বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন[127]। আমাদের গত অধ্যায়ের অ(ন)ভিজ্ঞতার আলোচনার কিছুটা অংশ অ্যাট্রিজের অনন্যতার আলোচনাতেও আছে –

"The experience of singularity involves an apprehension of otherness, registered in the event of apprehension, that is to say, is produces. Singularity is, as I have stressed, also inescapable from inventiveness…"[১২৮]

অনন্যতার অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গেই অ্যাট্রিজ – অনন্যতার আকস্মিকতার ঘটনায় – সম্বন্ধের প্রকৃতি বিষয়েও মন্তব্য করেছেন –

"Singularity arises from the work's constitution as a set of active relations, put in play in the reading, that never settle into fixed configuration."[১২৯]

---

[১২৫] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017 ,P - 65

[১২৬] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017 ,P - 67

[১২৭] অনন্যতার মধ্যে অজানা, অনির্নেয় বা অপরমেয়তার হদিশের কথা ক্লার্ক আলোচনা করেছেন ।অ্যাট্রিজের লেখায় – সাহিত্যের মধ্যে ভাষার যে 'Instrumentality'-র বিরোধীতার প্রসঙ্গ খুঁজে পাই – ক্লার্কেও যেন একই ভাবে – অনন্যতাকে ছকে নেওয়া বা দেগে দেওয়ার যে "Literary" – রাজনীতি – তার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার প্রসঙ্গ খুঁজে পাই। প্রসঙ্গ ক্রমে উনি আরেন্টের "Natality of everyday"-র ধারণাকেও একি সূত্রে পাঠ করেন। একাধারে উনি সাহিত্য নামক প্রতিষ্টানটিকে – ঠিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি, প্রতিষ্ঠান-বিরোধী-প্রতিষ্ঠান হিসেবেও প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বোপরি, সাহিত্যিক চর্চার, লিখনের চূড়ান্ত সম্ভাবনাগুলির উন্মোচন-চর্চার রাজনীতিকে দেরিদার "Democrecy to come"-এর যে Democracy-র রাজনীতি তার অপরত্ব ও ভবিষ্যবাদের ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করেন ক্লার্ক। স্বাভাবিক ভাবেই – আমরাও যে অ(ন)ভিজ্ঞতার শ্রম ও লিখনের চর্চার প্রসঙ্গে আলোচনা করছি আমাদের গবেষণায় – সেই আলোচনারও নির্ণয়বাদী পরিচিত রাজনীতির থেকে তফাত আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেরিদার গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষেই যেন আমরা আমাদের লিখনের ধারণাকে খুঁজে পাই। এক্ষেত্রে জরুরি বিষয়টি হল – অ্যাট্রিজের অনন্যতা, সাহিত্যিক ও ভাষা-চিন্তার মধ্যেও কিন্তু, Clark -এর এই তর্কগুলি – কখনো প্রকট এবং কখনো প্রচ্ছন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

Clark Timothy, *The Poetics of Singularity* , Edinburgh University Press, Edinburgh, 2005,pp-124,152,130,153,154

[১২৮] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017 ,P-67

[১২৯] Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017 ,P - 68

অর্থাৎ এক্ষেত্রে পূর্বের - ভাষা ও অনন্যতার আলোচনার সাপেক্ষে সাহিত্যিক বা Literary যেন সেই সম্বন্ধ, সম্পর্ক – যাকে আমরা গত অধ্যায়ে সহিতত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছিলাম। গত অধ্যায়েই আমরা আলোচনা করেছিলাম – কিভাবে স্যসুরের চিহ্নের ধারণা আসলে সাধারণ অর্থে ভাষার শব্দ ও অর্থের আবশ্যিক একরৈখীক সম্পর্ককে অবান্তর হিসেবে ভাবতে সাহায্য করে। জাক দেরিদা – তাঁর গ্রামাটোলজি গ্রন্থে – চিহ্নতত্ত্ব বা Semiotics – এর মধ্যেও ভাষাতত্ত্বের মতই এক অর্থে logocentrism -কে চিহ্নিত করেন। স্যসুরের তত্ত্বের মধ্যে থেকেই স্যসুরের দর্শনের অধিবিদ্যক উপস্থিতিবাদকে প্রশ্ন করেন এবং লিখনের ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাগুলির দিকে এগিয়ে যান। দেরিদা ও অ্যাট্রিজের সামগ্রিক আলোচনার মধ্যেই সাহিত্যিক সম্বন্ধ (literary[130]), অনন্যতা (singularity) এবং ভাষা (language) – র আলোচনা মিলে মিশে আছে। এই অংশে আমরা সুস্পষ্ট ভাবে এই ধারণাগুলির এক ধরণের ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এই অংশের আলোচনা শেষ করার পূর্বে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত – অ্যাট্রিজ আসলে ভাষার Instrumentality-কে, একেবারে নাকচ করে দিতে চাইছেন এমন নয়। দেরিদা এবং অ্যাট্রিজের সাহিত্য-দর্শন আসলে ভাষার কেজো চরিত্রের যে অন্তিম মূল্য – তাকে মেনে নিতে চাইছেন না। তাই আমাদের গবেষণায় ভাষাকে একমুখী ভাবে আমরা তার কেজো চরিত্রটিতে কখনই লঘুকৃত করে নিতে চাইবোনা। আমাদের গবেষণা উপরোক্ত অংশে আলোচিত - 'অনন্যতা', 'সাহিত্যিক' এবং 'ভাষা'-র আলোচনা ও ধারণার ভিত্তিতেই এই পর্যন্ত আলোচিত হয়ে এসেছে এবং এভাবেই মূলত – গবেষণার বাকী অংশটুকুতেও আলোচিত হবে। এক্ষেত্রে যদিও পাশাপাশি আমাদের মনে করে নেওয়া উচিৎ 'অনন্যতা' – আসলে একটি দার্শনিক পরিভাষা। সাহিত্যের আলোচনার বাইরেও 'অনন্যতা' নিয়ে দর্শনে নানাবিধ আলোচনা আছে। এমন কি আমরা যে অনন্যতার ধারণা নিয়ে আলোচনা করছি, সেটিও আসলে একটি বৃহৎ দার্শনিক তর্কের অংশ মাত্র – যাকে আমরা আপাতত সাহিত্যের আলোচনার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা জিল দ্যলুজ -এর সৃজণের তর্ক নিয়ে আলোচনা করব এবং তার দর্শনেরও একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে 'অনন্যতা'-র আলোচনা। জাক দেরিদা – যার দর্শন নিয়ে আমরা ক্রমাগত আলোচনা করে চলেছি তার সাহিত্যিক আলোচনার বাইরেও দার্শনিক লেখাগুলির মধ্যেও 'অনন্যতা' প্রধাণতর একটি আলোচনার বিষয়। যেহেতু 'অনন্যতার' বৃহৎ তর্ক-বিতর্ক আমাদের গবেষণার মূল বিষয় নয় সেই হেতু এক্ষেত্রে ডঃ অণির্বান দাশের "Toward a Politics of the (Im)Possible : The Body in The Third World Feminisms" -গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে সেই বৃহৎ "অনন্যতার" বিষয়ে একটি প্রয়োজনীয় বক্তব্য উল্লেখ করা হচ্ছে। এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা সেই বিষয়ে মোটের উপর স্পষ্ট রূপেই একটি ধারণা করে নিতে পারি। অনির্বাণ জিল দ্যলুজ -এর আলোচনা থেকে অনন্যতার ধারণাটি উল্লেখ করেছেন –

"...The singularity belongs to another dimention than that of denotation, manifestation or signification. It is essentially pre-individual, non-personal and a-conceptual. (52)"[১৩১]

অনির্বাণ তার আলোচনায় অনন্যতা, ঘটনা, অভিজ্ঞতা এবং কর্তব্য বিষয়ে আরও লিখেছেন -

[১৩০] "One point that needs to be made clear is that this attempt to understand the "literariness" of certain written texts is not an attempt to state what is most important about such text in our private lives and social existence." – Attridge Derek, *The Work of Literature*, Oxford, UK, 2017 ,P-3

[১৩১] Das Anirban, *Toward a Politics of the (Im)Possible : The Body in The Third World Feminisms*, Anthem Press, London, New York, 2010.P-150.

"I want to point at the radical undecidability that haunts experience, the inherent multiplicity of the immanence of experience, without letting go of the unity and the expectable construction (through discourse, power, history) of the event – to bring in "contingency, unpredictability and chance" into the calculable world of experience. As critiques (Lawlor, Dastur) have eloquently indicated, both Deleuze and Derrida have been aware of the central role of death in the thinking of this unanticipatable as the future anterior. One may also add the name of Freud (as in "Beyond the Pleasure Principle") to this list. Undoubtedly, this is a secular bid to come to terms with the unanticipatable in ways of knowing, being and doing. Other-than-secular modes of thought have other ways to approach the problem. Maybe, too dependent on the lone universal of the secular, we had been too attentive to the secular/non-secular divide…The structures of iterability that construct experience also open it up to responsibilities."[১৩২]

অনির্বাণের আলোচনা থেকেই আমাদের পূর্বোক্ত সেই বক্তব্যটি আরও স্পষ্টতর হয়ে উঠছে যে - 'অনন্যতা' বা 'Singularity' আসলে ভীষণ ব্যপ্ত একটি আলোচনা। যার সঙ্গে নীতি বা Ethics -এর যোগ রয়েছে (আমাদের গবেষণার পরবর্তী অংশে আমরা নীতি-বিষয়ক আলোচনায় ফিরব আবার)। বিভিন্ন বিদ্যাচর্চায় বিভিন্ন ভাবে এই নিয়ে ভাবা হয়েছে। অনির্বাণের মতই আমাদের আলোচনাও একভাবে যেন ধর্মনিরপেক্ষ, আধুনিক দর্শনের চৌহদ্দির মধ্যেই 'অনন্যতা'-র একরকমের বিচার করছে। আবশ্যিক ভাবেই এর বাইরেও আরও নানাবিধ বিচার থেকে যেতে পারে। কিন্তু আধুনিক দর্শনের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা 'অনন্যতার' এই ধারণার সঙ্গে আমাদের গবেষণার আলোচ্য বিষয় – সহিতত্ব, সম্বন্ধ, দায় এবং একই সঙ্গে বহুত্বের ধারণা যে সংযুক্ত সে বিষয়ে একরকমের নিশ্চয়তা আমরা এই অংশে এসে অনুভব করতেই পারি। অপরের প্রতি উন্মোচনের সঙ্গেই দায় বা কর্তব্যের প্রসঙ্গটি যে কেমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে – তা যেন – ব্যপ্ত 'অনন্যতা'-র আলোচনার মধ্যে দিয়ে এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্য ও 'সাহিত্যে'র ধারণা

এই পর্যন্ত আমাদের গবেষণায় সৃজনের ধারণাটি ঠিক কেমন সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম। আপাতত, এই অধ্যায়ের তথা আমাদের গবেষণার এতাবৎ আলোচনার যে মূল তর্ক তাকে আরেকটু বড় কোন পরিসরে বুঝে নিতে গেলে, আমাদের বুঝতে হবে বাংলা সাহিত্য সমালোচনার সার্বিক ইতিহাসে, সাহিত্য বিষয়ক তর্কের রকমফেরগুলি কি কি। আমরা এতক্ষণ বলছিলাম যে, মহিমান্বিত প্রতিভাশালী লেখকের সাহিত্যকে খণ্ডন করে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমাজবাস্তবতার, বাস্তবতার ও পক্ষপাতিত্বের সাহিত্যের কথা বলেছিল। একইসঙ্গে সৃজনশীলতার নন্দন-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণাত্মক পাঠের প্রশ্ন তুলেছিল। এই তর্ক বহুদিনের, বহুবিধ আলোচনা এ বিষয়ে জমা হয়ে আছে ইতিহাসে। যখন এই তর্ককে, বি-নির্মাণবাদী, খানিকটা অবভাসবিদ্যা ও লিখনের দর্শনের প্রেক্ষিত থেকে

[১৩২] Das Anirban, *Toward a Politics of the (Im)Possible : The Body in The Third World Feminisms*, Anthem Press, London, New York, 2010.P-150.

খেয়াল করি, তখন আরেকরকমের সমঝোতায় এসে উপনীত হই যেন। ব্যক্তি প্রতিভা ও সামাজিক বাস্তবতার তর্কে অন্য আরেক পরত এসে জমা হয়। লিখনের দর্শনই আমাদের গবেষণার মূলধন, এই আলোচনার গভীরেই আছে কাজের দর্শনের চাবিকাঠি। এই গবেষণার অনেকগুলি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল এটা – সেকথা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। লেখার কাজ বিষয়ক আমাদের এই আলোচনা হয়ত কাজ বিষয়ে নতুন কোন চিন্তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে। সে প্রসঙ্গে আমরা আবার ফিরব পরবর্তী কালে। আপাতত আমাদের গবেষণার তর্কটিকে বাংলা সমালোচনার সার্বিক ইতিহাসে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। দেখা যাক কীভাবে সেই আলোচনা আমাদের কাছে সাহিত্যের ধারণাকে, বাংলায় তার বিবর্তনকে আরও স্পষ্ট-রূপে বুঝে নিতে সাহায্য করে।

যে ছোট ছোট তর্কগুলি, বাংলা সাহিত্য সমালোচনার তথা বাংলার সাহিত্য-বোধের ইতিহাসকে আরও বেশি বিশ্লেষণাত্মক ভাবে বুঝে নিতে সাহায্য করে - সেই গুটিকয় তর্কে প্রবেশ করবার আগে, আমাদের বুঝে নিতে হবে একটি কাঠামোকে। মোটের উপর যার ভিত্তিতে আমরা সমালোচনা ও সাহিত্য-বিচারের - এই বিপুল ইতিহাসকে যেন কিছুটা অবয়বের মধ্যে এনে বুঝে উঠতে পারি। এবার প্রশ্ন হল, আমাদের গবেষণায় এই ইতিহাসকে টেনে আনার কি প্রয়োজন? এই প্রশ্ন আসলে গবেষণার পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশ্ন (যে বিষয়ে গবেষণাপত্রের ভূমিকায় আলোচনা করেছি)। ঠিক কোন পদ্ধতিকে অনুসরণ করে আমি লিখে চলেছি? এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ‘লেখার কাজ’-কে শ্রমের তর্ক দিয়ে বুঝে উঠবার ক্ষেত্রে, আমাদের কাছে অনেকগুলো পদ্ধতিই প্রযুক্ত হতে পারত। যেমন, প্রথমত - বাংলা আধুনিক সাহিত্যের যে তথাকথিত প্রধান উপাদান – উপন্যাস, গল্প, কবিতা কিংবা নাটক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিক সংরূপের সঙ্গে তাদের লেখকদের ব্যক্তিগত ডায়েরি, প্রবন্ধ কিংবা জবানির পারস্পরিক আলোচনা। যেমন ধরা যাক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস এবং ছোটগল্পের সঙ্গে তাঁর ‘লেখকের কথা’ গ্রন্থের তুল্যমূল্য আলোচনা কিংবা রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য প্রধান লেখকদের ক্ষেত্রে এই একই রকমের বিচার। অতঃপর, সেই বিচার থেকে উঠে আসা কতগুলি প্রশ্ন, যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করতে পারত হয়ত – কিভাবে লেখকদের নিজস্ব বয়ান এবং রচিত সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ থেকে যায় এবং সেই তফাতের ভিত্তিতেই কিভাবে সাহিত্যিকের কাজকে বোঝা উচিৎ। এই আলোচনার সঙ্গে প্রকারান্তরে আমরা শ্রম তত্ত্বের এবং অন্যান্য দর্শনের প্রসঙ্গ জুড়ে নিতে পারতাম। দ্বিতীয়ত বাংলা ভাষায় লিখিত যতগুলি ‘সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত বয়ান’ খুঁজে পাওয়া যায় তাদের জড়ো করে, কিছুটা বিদেশী সাহিত্যে, একই ধরণের লেখা পত্র (যার বেশির ভাগ অংশটুকুই আমরা একত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করব)। যেমন ধরা যাক – রেইন মারিয়া রিলকের চিঠি পত্র কিংবা জর্জ লুইস বোর্হেসের ‘On Writing’ – বিষয়ক লেখা-পত্র, এমনকি তার সঙ্গে এলিয়ট, জাঁ পল সার্ত্র প্রমুখ লেখকদের – যারা প্রধানত সাহিত্য বিষয়ে দার্শনিক চিন্তা করেছেন (সার্ত্রের ‘What is literature’) আবার একই সঙ্গে সাহিত্যিকও। তেমন চিন্তকদের লেখালিখির তুল্যমূল্য আলোচনায়, আমার গবেষণার প্রশ্নটিকে কেন্দ্রীভূত করতে পারতাম। যেমন ১৯৪৪ সালে, ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ‘কেন লিখি’ নামক সংকলন – যেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ধূর্জটিপ্রসাদ প্রমুখের লেখা একত্রে প্রকাশিত হয় এবং

সকলেই একত্রে 'কেন লিখি' বিষয়টি নিয়ে লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সেরকম আরেকটি গ্রন্থ আবার প্রকাশিত হয় এবং ২০০০ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একটি সংকলন, ২০২০ সালে বাংলা দেশ থেকে প্রকাশিত হয় আরেকটি সংকলন যার মধ্যে সেইসব 'কেন লিখি' নামক প্রবন্ধগুলির অনেকগুলি সংকলিত হয়েছে এবং নতুন কিছু লেখাও প্রকাশিত হয়েছে – সেরকম কিছু গ্রন্থ কিংবা পত্র পত্রিকা মিলিয়ে একটা আলোচনা দাঁড় করানো যেতে পারত। তৃতীয়ত এই আলোচনা কেবলমাত্র গূঢ় অর্থে দার্শনিক লেখা পত্রের উপর ভিত্তি করে, কেবলমাত্র লেখার কাজের ধারণাকে বুঝতে চেয়ে, ধারণামূলক সমস্ত লেখাকে বিশ্লেষণ করতে পারত। যেখানে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ দার্শনিক যুক্তির কাটা ছেঁড়ার মধ্যে দিয়েই আমাদের গবেষণা তার পথ খুঁজে নিতে পারত। যেভাবে মূল ধারার বিজ্ঞান তাঁর গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যায়, প্রধানত সেটা বিশ্বজনীন কতগুলি পদ্ধতি নির্ভর (যদিও তার মধ্যে ব্যতিক্রম কার্যকরী) – সেভাবে আমাদের গবেষণা হয়ত এগিয়ে যেতে পারত সম্ভবত। কিন্তু আমার গবেষণার অভিজ্ঞতায় - লেখার কাজ কি? এই প্রশ্নটি আসলে উঠে আসে, সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনার প্রক্রিয়াটিকে বুঝবার তাগিদ থেকে। সেক্ষেত্রে, সাহিত্যিকের মনস্তত্ত্ব থেকে শুরু করে, সাহিত্যের দর্শন, লেখকদের ব্যক্তিগত লেখা, লিখনের দর্শন, শ্রমের দর্শন, সাধারণ অর্থে সাহিত্যের দর্শনের ধারণাগত ইতিহাস এবং একই সঙ্গে সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস – এই সবকিছুই আলোচনার অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে। আমরা জানি সব কিছু নিয়ে আলোচনা করা একটা কাজের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তাই আমি এমন একটি রেখা বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেছি, যেখান থেকে দেখলে, এই সবকটি দিককেই প্রায় যেন - একটি অঞ্চলে গুটিয়ে এনে, গবেষণার প্রশ্নটির ভিতর ছড়িয়ে থাকা অন্য অন্য প্রশ্নগুলির উত্তরও একই সঙ্গে আলোচনা করা যায়। কেননা আমরা আগের অধ্যায়েই দেখলাম, লিখন আলোচনা করতে গিয়ে, উদ্বৃত্তের প্রসঙ্গ, সেই প্রসঙ্গ থেকে শ্রমের মূল্যের প্রসঙ্গ, সেখান থেকে চিহ্নতত্ব এবং ক্রমে সাহিত্যের মূল্যের প্রসঙ্গ ও এই অধ্যায়ে এসে এখনও পর্যন্ত লিখন ও সৃজনের প্রসঙ্গ পরস্পর সংলগ্ন হয়ে আলোচনায় উঠে এলো। আমাদের গবেষণায় তর্ক ও আলোচনার এইরূপ গতি প্রকৃতিই প্রমাণ করে যে, 'লেখার কাজ' নিয়ে আলোচনা করতে বসলে আনুষঙ্গিক ধারণাগুলি অবধারিত ভাবে উঠে আসছে এবং তাদের বিশ্লেষণ ও বিচার গবেষণার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠছে। কোন একটা নির্দিষ্ট দিক বেছে না নিয়ে, মূল প্রশ্নটির মধ্যে জড়িয়ে পেঁচিয়ে থাকা, অন্যান্য প্রশ্নগুলিকে কি এক্ষেত্রে কোথাও একটা জড়ো করে আনা সম্ভব? এইরকম তাগিদ থেকেই একাধারে ঐতিহাসিক এবং অন্যদিকে দার্শনিক দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গিকেই একসঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। তথাপি হয়ত অবশেষে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার বদলে আমরা আরও গভীর কিছু প্রশ্নের দিকে সরে যাব, হয়ত সেটাই সাধারণ অর্থে গবেষণার পরোক্ষ উদ্দেশ্যও বটে। আলোচনার বৃহৎ চিত্রটি ঠিক কেমন হবে তা মাঝপথে মাপতে বসার কোন যৌক্তিকতা নেই বলেই মনে হয়।

বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসের অবয়বটিকে, মূলত দুটি গ্রন্থ থেকে ছকে নেওয়ার চেষ্টা করব আমরা – অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের, 'বাংলা সমালোচনার ইতিহাস' এবং সুদীপ বসুর 'বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা'। এই দুটি গ্রন্থ থেকে আমরা বাংলা সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অবয়বকে সামনে রেখে, তার

মধ্যে থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় সূত্রগুলি বেছে নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করব – তেমন কোন নতুন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা তুলে আনার কোন লক্ষ্য নির্দিষ্ট অর্থে আমাদের নেই, আলোচনার সূত্রে যদি কোন কোন কথা ঐতিহাসিকদের নজর কেড়ে নিতে পারে, সেক্ষেত্রে তা গবেষকের সৌভাগ্য বলেই বিবেচিত হবে। লেখকদ্বয়ের উভয়েই আরও নানান গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক কাজ করেছেন কিন্তু এই কাজ দুটি তার মধ্যে প্রায় শ্রেষ্ঠ বলা চলে। বাংলা সমালোচনা সাহিত্য একটি ক্রমবর্ধমান নদীর মতো, যার কুল পাওয়া প্রায় অসম্ভব একটি সাধনা। যত বেশি সময় এগিয়েছে, ছাপার জগতে সাহিত্য ও তার সমালোচনার নমুনা গুনতির নাগালের বাইরে যেতে শুরু করেছে। এমনকি অরুনকুমার নিজেও লিখেছেন -

"এই দেড়শ বছরের (১৮৫১-২০০০) সমালোচনার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে তিন পর্বে বিভক্ত করেছি...ইতিহাস রচনাকালে এই পর্ব-বিভাজন লেখকের মনের মধ্যে সক্রিয় ছিল। এই বিভাজন সকলের মনঃ-পুত হবেনা, তবু ইতিহাস লেখার সুবিধার্থে প্রেক্ষাপটের এই বিভাজন দরকার ছিল...অনেক ব্যক্তি ও গ্রন্থের অনুল্লেখের জন্যে কোন কোন পাঠক ক্ষুব্ধ হতেই পারেন। আমার নিবেদন : ইহা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস; তার জটিল সমৃদ্ধ বহুপথগামী যাত্রার বিভিন্ন তরঙ্গ ও নব নব সন্ধানের ইতিহাস। এই সত্য মনে রাখলে আর ক্ষোভ থাকবেনা।"[১৩৩]

কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খেয়াল করলে দেখা যায়, ১৯৫০ পরবর্তী বাংলা সাহিত্য সমালোচনা বলতে অরুণকুমার প্রধানত বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে বিচার্য বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার পরিচিত গ্রন্থগুলিকেই তুলে ধরেছেন। তার মধ্যে শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন কিংবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু অধ্যাপকের লেখা অবশ্যই আছে কিন্তু এই চৌহদ্দির বাইরে মূলত ছোট পত্রপত্রিকা, সেটা 'কৃত্তিবাস', 'হাংরি'-ই হোক কিংবা অনুষ্টুপ, এক্ষণ, বারোমাস অথবা চর্চা-র মত পত্রিকা। এই ধরণের আলোচনা যা, প্রধানত বাংলা সাহিত্য কেন্দ্রিক বিদ্যাচর্চার বাইরে থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা করেছে, তাদের আলোচনা অনেকটাই অরুণকুমার কিংবা সুদীপ বসুর আলোচনার পরিধির বাইরে। আর সেটা হওয়াই স্বাভাবিক, ১৯৫০ পরবর্তী সাহিত্য সমালোচনাই শুধু নয়, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সর্বত্রই উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বের অনুপাতে অনেক বিচিত্র ও বিপুল হয়ে উঠল, পঞ্চাশ-ষাটের দশকের এক রকম চরিত্র, সত্তরের দশকের আরেকরকম, আশী কিংবা নব্বইয়ে আমূল পরিবর্তন – আর দুহাজার পরবর্তী সামাজিক ও শ্রেণীগত বাঙালি-চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়। মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে এত বেশি পরিবর্তনের ইতিহাস লিখবার শিক্ষা, সামর্থ্য এবং পুঁজি – সবেরই কম বেশি অভাব আছে আমাদের রাজ্যে। সত্যিই যদি এমন কোন প্রচেষ্টা কেউ কখন নেয়, বাংলায় চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাস যদি কখনো কেউ লিখতে চেষ্টা করেন, তাহলে তা দশ বারো খণ্ডের কমে হবে বলে মনে হয়না। সুতরাং , সেই সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই আমরা আঁক কষার চেষ্টা করছি, এটাই আমাদের পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং যাঁদের

[১৩৩] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দে'জ পাব্লিশিং , কোলকাতা, ২০১৯, (দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা)।

সমালোচনার ইতিহাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম – তাঁরাও এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তাদের শ্রেষ্ঠ কাজ গুলি করে গেছেন।

অরুণকুমারের মতে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের প্রথম পর্ব ১৮৫১ খ্রীঃ থেকে ১৯১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত, অর্থাৎ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' থেকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি পর্যন্ত হওয়া উচিত। দ্বিতীয় পর্ব হওয়া উচিৎ ১৯১৪ খ্রীঃ অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৬৫ খ্রীঃ অর্থাৎ এলিয়টের মৃত্যু পর্যন্ত (টি এস এলিয়ট বাংলা আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সন্দেহ নেই)। তৃতীয় পর্ব হচ্ছে, ১৯৬৫ খ্রীঃ থেকে ২০০০ খ্রীঃ – এই পর্বকে অরুণকুমার বলবেন এতৎকালের সমালোচনা।

আধুনিকতা পূর্ববর্তী, যাকে আমরা বলে থাকি - মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য। সেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমালোচনার তথা নান্দনিক বিচার মূলক গ্রন্থের উজ্জ্বল উদাহরণ হল – 'উজ্জ্বলনীলমণি'। এই গ্রন্থ মূলত ভক্তিবাদের প্রাতিষ্ঠানিক সন্দর্ভকে সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিল। প্রাচীন ভারতীয় বা সংস্কৃত পুঁথি-পাঠ্য ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে, অলংকার শাস্ত্র-কেন্দ্রিক নন্দনতত্ত্বের ভক্তিবাদী পূণর্মূল্যায়ণ ও মতান্তরের মধ্যে থেকেই 'উজ্জ্বলণীলমনি'-র ভক্তিবাদী নন্দনতত্ত্ব লিখিত হয়। এই একটিমাত্র নমুনার কথাই মূলত লেখক উল্লেখ করেছেন। 'নান্দনিকতা', 'প্রাগাধুনিক' এবং 'সমালোচনা' - এই তিনটি ধারণার অর্থ ও ঐতিহাসিকতাকে আরও গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করলে – প্রাগাধুনিক যুগে হয়ত সাহিত্য-বিচারের আরও নানাবিধ রকমফের আমাদের নজরে আসতে পারে কিন্তু এতক্ষণ যে অর্থে সাহিত্য-বিচারের প্রসঙ্গটির প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা উল্লেখ করলাম, তাতে করে আমাদের আলোচনায় আধুনিক ঔপনিবেশিক অর্থে 'সাহিত্য' এবং সাহিত্যের বিচার-এর ধারণাই প্রাধান্য পেয়েছে। বলাবাহুল্য, আমাদের গবেষণার এই ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন। এখানে উল্লেখ্য, যে সমাজ এবং সাহিত্য তথা আত্ম এবং অপর বিষয়ে আধুনিকতা ও প্রাগাধুনিকের মধ্যে এত বিচিত্র ও বিস্তর বোধগত পার্থক্য বিদ্যমান যে - মানব বা মানবীবিদ্যার কোন একটা গবেষণার একটা সুতোয় এই বিচিত্র বোধগুলিকে গাঁথা উচিৎ কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ এবং বিতর্ক যথেষ্টই আছে। কথাটা উদাহরণ দিয়ে এভাবেও বলা চলে, ধর্মপ্রাণ কোন সমাজে, ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রেক্ষিতে , শিল্প ও সাহিত্যকে যেভাবে ভাবা যায়, আধুনিক সমাজে সেই ভাব-উপাদানগুলি দিয়েই আদৌ ভাবা যায় – সেটা বড় একটি প্রশ্ন।

আমাদের চেতনা ঐতিহাসিক অর্থে মৌলিকভাবেই আধুনিক চিন্তার ফসল, মার্ক্সবাদও এই সমস্যাকে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে বুঝবার চেষ্টা করেছে – ফলত মার্ক্সবাদের ক্ষেত্রে যুগ বিচারের উপাদান, যুগের অর্থনৈতিক শর্ত, যাকে সবচেয়ে বেশি নিরপেক্ষভাবে বিচার করা সম্ভব। মতাদর্শের খেলা ঢুকে পড়লে, নিরপেক্ষতার প্রশ্ন অসম্ভব না হলেও চরমতম জটিল পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। তাকে বোঝা সাধ্যের অতীত হয়ে যায়। তাই আধুনিক যে অর্থে সাহিত্য সমালোচনাকে আমরা বুঝি – অর্থাৎ একটা নাটক কিংবা উপন্যাসের বিশ্লেষণ কিংবা মূল্যায়ন – সেই অর্থে ঠিক অলংকার শাস্ত্রকে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। অলংকার শাস্ত্র মূল্যায়নের চেয়ে অনেক বেশি সূত্র নির্ধারক এবং

সিদ্ধান্ত প্রদান করে, যে সিদ্ধান্তের গভীরে আছে ঈশ্বর-তত্ত্ব, আনন্দবাদ ইত্যাদি। সেই ভিত্তিতে পরম্পরা ও তর্কও আছে। কিন্তু সেখানে ব্যক্তি লেখক এবং ব্যক্তি পাঠক কিংবা ব্যক্তিগত সাহিত্যিকের প্রতিভা অথবা আত্মানুসন্ধান গৌণ একটি বিষয় – বরং অনেকটা রাষ্ট্রের আইন-কানুন গড়ার মত করে নন্দনতত্ত্ব লিখিত হয়েছিল সে কালে। সেটা কেবল সংস্কৃত পাঠ্যের ক্ষেত্রেই নয়, অ্যারিস্টটল কিংবা লঞ্জাইনাসের ক্ষেত্রেও সেই ধারা নজরে আসে। হয়ত এই টুকরো টুকরো প্রশ্নগুলোই আমাদের ভাবাতে পারে যে - কেন আধুনিক নন্দনতত্ত্বে লেখক বা শিল্পীর 'প্রতিভা'-বিষয়টি এত বেশি প্রাধান্য পায়? ইতিহাস দিয়েই যেমন এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, আবার অন্যদিকে ইতিহাসের মধ্যেই হয়ত এই ধরণের প্রশ্নগুলির প্রকৃষ্ট উত্তরের সম্ভাবনা নিহিত আছে। উত্তর ঔপনিবেশিক সাহিত্যচর্চার মধ্যে এই ধরণের প্রশ্নগুলি অনেকক্ষেত্রেই উঠে এসেছে, পরবর্তীকালে প্রাচ্য নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে আরও নানাবিধ গবেষণা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে কোন আলোচনার উপক্রমণিকায় ভারতচন্দ্র এসে উপস্থিত হন। তার অন্যতম কারণ – দৈব প্রভাবিত প্রাগাধুনিক মঙ্গলকাব্য তথা বাংলা সাহিত্যের বন্ধন থেকে সাহিত্যকে ভারতচন্দ্র মুক্ত করেন। "নূতন মঙ্গলে"-র অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটা অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য – একথা সর্বজন বিদিত। কিন্তু তাঁর রচনা মূলত কাব্য – তাই সেখানে সাহিত্য বিচার করার কোন অভিপ্রায় চোখে পড়েনা – কেবলমাত্র 'যাবনী' অর্থাৎ বিধর্মী এবং অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে উনি লিখছেন, ইত্যাদি বিষয়ে নিজেই নিজের কাব্যের টিপ্পনী করছেন – এর ভিত্তিতে সমালোচনার উদাহরণ টেনে আনা সঠিক হবে না। সুতরাং সহজ কথায় বাংলা সাহিত্য সমালোচনার গোঁড়া পত্তন করছেন – ঈশ্বর গুপ্ত, তাঁর 'কবি জীবনী' গ্রন্থে। তাঁর পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর'-এর মাধ্যমে, ১৮৫৩ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৫ খ্রীঃ প্রাচীন কবিদের জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। এই কবিদের কাব্যের ধরণ গড়নের মধ্যে প্রাগাধুনিক আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ স্পষ্ট তাদের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ, সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। ঈশ্বর গুপ্ত লেখককে (কবিকে) ওনার পত্রিকার কেন্দ্রে তুলে নিয়ে আসছেন। রোসিঙ্কা চৌধুরী তাঁর 'The Literary Thing' –গ্রন্থে, এই সময়ের সাহিত্য চিন্তা বিষয়ে গভীরে আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ প্রসঙ্গে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব – আপাতত প্রচলিত ধ্যানধারণার চিত্র অঙ্কন সম্পন্ন করে নেওয়াই আমাদের কাজ। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কবি জীবনীতে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে দৈব-প্রভাব-মুক্তির কথা উল্লেখ করেন এবং কাব্য বিচারের মাধ্যমে তাকে সুনিপুণ ভাবে উদ্ঘাটিত করেন। এর পরবর্তীকালে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১ খ্রীঃ) এবং এখানে প্যারিচাঁদ মিত্র, বিদ্যাসাগর প্রমুখ লেখকের সাহিত্যের সমালোচনা প্রকাশিত হত, পরবর্তীকালে জানা যায় সম্ভবত এর সূচনা করেছিলেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ – সেভাবে বিচার করলে কালী সিংহ-ই বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের পথিকৃৎ[১৩৪]। উক্ত পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থকারদের হিত সাধন। ১৮৫২ খ্রীঃ নাগাদ রঙ্গলালের বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ – যেখানে উনি মূলত বলতে চেয়েছিলেন যে স্বাধীন দেশেও কবির জন্ম হয়। এদেশের

[১৩৪] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-৪০

কবিদের সঙ্গে শেকসপিয়র প্রমুখের তুলনা চলে এমন কি ইংরেজি কবিতার সমালোচনাও আমরা পাচ্ছি। রঙ্গলালের লেখা কবিতা বিষয়ক সমালোচনার প্রথম আধুনিক উদাহরণ – এক অর্থে। এই গ্রন্থ নিয়ে ভালোমন্দ সকল সমালোচনাই আছে, রঙ্গলালকে তাঁর অগ্রজ বাঙালি কবি এবং বিদেশী কবিদের সঙ্গে তুলনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনা', এই সমালোচনার ঐতিহাসিক ভূমিকা অতুলনীয় কারণ, সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রকরণে কিভাবে সাহিত্যের ঐতিহ্যকে বিশ্লেষণ করা যায় তা প্রথম বিদ্যাসাগরের রচনায় খুঁজে পাওয়া যায়। এরপর উনিশ-শতকে যে বৃহৎ ঘটনাটির কথা অবিস্মরণীয় তা হল - মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশ। এই ঘটনাকে আমরা মধুসূদন –এর আবির্ভাবও বলতে পারি। মধুসূদন যেভাবে মহাকাব্যের আধুনিক লিখন গড়ে তোলেন – মতাদর্শগত দিক দিয়ে এবং কাব্য-ছন্দের ভাঙচুর উভয়তই – তার ফলে তাঁর সাহিত্য প্রাথমিক ভাবে বিপুল সংখ্যক সমালোচকের কোপের মুখে পড়ে আবার একই সঙ্গে ক্রমশ তিনি 'কাল্ট' হয়ে ওঠেন। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে প্রথম ধাক্কায় – রবীন্দ্রনাথের মত চিন্তকেরাও যে বিচার পোষণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তার পুনর্বিচার করেন। হেমচন্দ্রের কাছে উপমার আতিশয্য দুর্বলতা হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। মধুসূদনের একেবারে বিপরীত প্রান্তে আমরা গড়ে উঠতে দেখি – ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো চিন্তককে। এদের মধ্যবর্তী পন্থায় আমরা রাজনারায়ণ বসু কে পাই। রাজনারায়ণ সর্বদাই মধুসূদনকে সমর্থন করেছেন এবং মহাকবি হিসেবে স্বীকার করেছেন[১৩৫]। এছাড়াও মধুসূদন সমালোচক গোষ্ঠীর মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ সোম, দীননাথ শান্যাল প্রমুখেরা ছিলেন। প্রমথনাথ বিশী তাঁর লেখায় এঁদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। শশাঙ্কমোহন সেনের অনেক পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থে (১৯২৮ খ্রীঃ) – তিনি লিখছেন –

"সুতরাং, আমাদের মূল প্রণালী হইবে, মধুসূদনের শিল্পকার্যের 'উত্তম-অধম' বলিয়া রায় প্রকাশ নহে, উহাকে সম্যক গ্রহণ। কোন Judgment নহে Interpretation ! কোন 'বাঁধা গৎ' বা স্থিরনিশ্চয় শাস্ত্রশাসনের তুলাদণ্ডে তুলিয়া উহার 'ভালমন্দতা'র ধারণা এবং পরিমাপ নহে; উহাকে তাঁহার অন্তর্জীবন এবং প্রতিভার একটা সবিশেষ বিবর্তফলরূপেই ধারণা – উহার স্বরূপ ধারণা।"[১৩৬]

অরুণকুমারের মতে, শশাঙ্কমোহন সেন 'অন্তর্দর্শনের প্রণালী' অবলম্বন করে মধুসূদনের অন্তর্জীবন ও প্রতিভার আলোচনা করেছেন। এই অন্তর্জীবন ধর্মীতার কথা আমরা ছিন্ন-পত্রাবলী সূত্রে লিখেছিলাম, পরবর্তীকালে নানা স্থানে এর উদাহরণ পাবো আমরা। একই প্রসঙ্গে আরও লিখছেন শশাঙ্কমোহন –

"কবিগণ নিজের অন্তরাত্মাকে কাব্যের মধ্যে পরের ভোগ্য করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন; আপনার ভাবনা এবং চিন্তাগুলিকে জগতের খাদ্যরূপে উপস্থিত করিতে পারেন; তাই কাব্য উপাদেয়। কিন্তু কাব্যপাঠের প্রকৃত

[১৩৫] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-৪৮

[১৩৬] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-৬১

রসবোধ বলিয়া যে জিনিস উহার সঙ্গে সঙ্গে কবিকে জানিতে পারলে যেমনটি হয়, তেমন আর কিছুতেই হয়না।”[১৩৭]

বলাবাহুল্য, এই চিন্তার মধ্যে দিয়ে সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক প্রধান একটি প্রবণতার উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা মনে করি সাধারণত, সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে লেখক যা প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে দিয়ে আমরা লেখককে বুঝে নিতে পারি। এই চিন্তা হয়ত, লেখক বা স্রষ্টা (শিল্পী)-র সঙ্গে পাঠকের জুড়তে চাওয়া, তার মনের সঙ্গে পাঠকের মন মেলাতে চাওয়ার ধারণারই একটা ক্রমপরিনাম। অর্থাৎ নন্দনতত্ত্ব নানাবিধ অর্থে স্রষ্টা ও ভোক্তার মিলনের কথা বলেছে, যে প্রসঙ্গে আমরা পূর্বের অধ্যায়ে রসতত্ত্বের প্রসঙ্গ টেনে এনেছিলাম। এখানে তফাৎটা আরও বেশি পরিষ্কার হয়ত। নন্দনতত্ত্বে যে একঘণতার কথা বলা হয়েছিল সেই একঘণতার বিশ্লেষণ এবং বিচারে নানা মতের নানা তফাৎ হতে হতে, ক্রমে সমালোচনার উপরোক্ত ঐতিহাসিক আলোচ্য পরিসরে এরকম একটা চেহারা পরিগ্রহণ করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এই তর্কের নানাবিধ রকমফেরের ইতিহাস বিষয়ে আমরা গত অধ্যায়েই আলোচনা করেছিলাম। মধুসূদনের আলোচনায় মোহিতলাল – কবির সঙ্গে কবি-মানুষটির সম্বন্ধ-বিষয়ে নানা আলোচনা করেছেন, এছাড়াও বুদ্ধদেব বসু, সুবোধচন্দ্র প্রমুখের আলোচনা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কবি কে?’- প্রসঙ্গে আমরা পরবর্তীকালে ফিরে আসবো যখন রোসিঙ্কা চৌধুরীর গ্রন্থের যুক্তিগুলি নিয়ে আলোচনা করব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এখানে আমরা যেন সুবোধচন্দ্রের বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনার কথা যেন না ভুলে যাই[১৩৮]।

মধুসূদনের ক্ষেত্রে যেমন লেখক-সত্ত্বাই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি, সমালোচক সত্ত্বার প্রকাশ সেই অর্থে পাওয়া যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র এদিক থেকে প্রায় সমালোচনার একটি বিরাট স্তম্ভ বলা যেতে পারে। অরুণকুমার দেখাচ্ছেন, কোথায় কোথায় বঙ্কিমের সাহিত্য চিন্তাগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে[১৩৯]। এই ব্যাপ্তি – ‘উত্তরচরিত’, ‘গীতিকাব্য’ থেকে শুরু করে – ‘ধর্ম ও সাহিত্য’, ‘ধর্মতত্ত্ব’ হয়ে – প্যারীচাঁদ মিত্র অথবা ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীর ভূমিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা, বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ স্তম্ভের ভূমিকা পালন করেছিল। বঙ্কিমের ‘বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন’ – নামক নিবন্ধটিকে বাংলার প্রথম সাহিত্য সংক্রান্ত ম্যানিফেস্টো বলা যেতে পারে। এখানে তিনি যে কথাগুলি লিখছেন, তা প্রধানত বিশিষ্ট নীতি সম্বলিত, যাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি সাহিত্যের সাধনা। সাধনা কেন বলছি - কারণ সাধনার কতগুলি শর্ত থাকে, যেমন ধরা যাক সাধনা সাধারণত গৌণ বা স্থূল কোন বিষয়ের হয়না। সাধনায় যশ, ধন প্রভৃতির মোহ না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। সাধনায় ফাঁকিবাজির কোন স্থান নেই। সরলতা সাধনার অন্যতম লক্ষণ কারণ সাধনায় কোন ছলচাতুরীর স্থান নেই, যা সোজাসুজি অনুশীলন সম্ভব তাতেই সাধনা সম্পৃক্ত হয়। সাধনা নিরন্তর অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই কেবলমাত্র সম্পন্ন হওয়া সম্ভব এবং সর্বোপরি সাধনায় বারং বার বিচ্যুতি হওয়াটাই রীতি, সেই সকল বিচ্যুতিকে অতিক্রম

---

[১৩৭] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-৬৯

[১৩৮] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-৮৩

[১৩৯] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-৮৫-৯৯

করে, তবেই সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর। এসকল ছাড়াও আমরা জানি যে কোন সাধনার মধ্যেই মৌলিকত্বের দাবি থাকে অর্থাৎ সাধনা মূলত সত্যানুসন্ধানী, সত্যের ধারণা-কেন্দ্রিক। উপমাস্বরূপ আমরা মহাভারতে পাণ্ডবগণের ধনুর্বিদ্যা-শিক্ষার অংশটুকু মনে করতে পারি। সেখানে অর্জুন বলেছিল সে কেবল পাখির চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, কারণ সেটাই তার লক্ষ্য এবং সেটাকেই তাকে আপাতত ভেদ করতে হবে। অন্তত এইটুকু বলা চলে যে, সাধনার সাধারণ ধারণা মূলত এই রূপকের মধ্যে দিয়েই সর্বোৎকৃষ্ট-রূপে প্রকাশিত হতে পারে। লক্ষ্যভেদ তথা, সত্যভেদ-ই সাধনার সাধারণ উদ্দেশ্য। যেমন বঙ্কিম তাঁর 'ধর্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে লিখছেন –

"সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে, কেননা সাহিত্য সত্যমূলক, যাহা সত্য তাহা ধর্ম। কিন্তু সাহিত্য যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ মাত্র। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চ আরোহণ কর।"[১৪০]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিন্তক হিসেবে একজন আশ্চর্য চরিত্র - তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'কপালকুণ্ডলা', 'রজনী'-র মত উপন্যাস লিখেছেন, 'কমলাকান্তের দপ্তরের' মত অসামান্য রম্যরচনা সৃষ্টি করেছেন আবার 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্রে'-র মত প্রবন্ধও রচনা করেছেন। ধর্মতত্ত্বের প্রতিফলন আমরা উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে খুঁজে পাই। ধর্মতত্ত্বের প্রেক্ষিতে সাহিত্যের প্রধান তর্কই হল –

"কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য – অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি[১৪১]।"

প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হল ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে। সেখানে মানুষের জীবনের বিভিন্ন বৃত্তির কথা বলা হয়েছিল, যার মধ্যে কাব্যের ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনীবৃত্তিকেই প্রধান বলা হয়েছে। এখানে কথাটা চিত্তশুদ্ধি এবং একই অর্থে প্রযুক্ত। মনোরঞ্জন নয়, শুদ্ধিকরণ – চিত্তের শোধন। গত অধ্যায়ে অভিনব গুপ্ত এবং ভরতাচার্য্যের রসতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে, পাঠকের মনমুকুর স্বচ্ছকরণের প্রসঙ্গটি এসেছিল এবং রসতত্ত্ব আলোচনার প্রসঙ্গ এসেছিল। শুদ্ধিকরণের সঙ্গে নানাবিধ সংকীর্ণ ঘরানার চিন্তন ঐতিহাসিকভাবে সংযুক্ত। যাকে আমরা উত্তর-আধুনিকতার ভাষায় কর্তৃত্ববাদী আখ্যান বা 'Grand Narrative[১৪২]' – বলে থাকি, সেই ধরণের আখ্যানের ক্ষেত্রেও এমন শুদ্ধ-অশুদ্ধের ভেদ, বৈষম্য কার্যকরী থাকে। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বও এক অর্থে সেই কর্তৃত্ববাদী আখ্যানের প্রতিফলন।

'দয়া : রামমোহন ও আমাদের আধুনিকতা'- গ্রন্থে রণজিৎ গুহর বক্তব্য ছিল – রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কারমূলক রাজনীতির গভীরে আসলে ছিল, 'দয়া' নামক এক নৈতিকতার উদ্বেগ। রামমোহন রায়, শাস্ত্রকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে করতে একটা সময় এসে সাধারণ নৈতিকতা বা কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে আঘাত করছেন। যে নৈতিকতা

[১৪০] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-৯০

[১৪১] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-৯৭

[১৪২] Lyotard Jean Francois, *The Postmodern Condition : A Report on Knowledge*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1984 , 31-41

- লৌকিক, ব্যতিক্রমী বা আধুনিকতা বিরোধী যৌক্তিক পরম্পরার থেকে খানিকটা পৃথক বলে রণজিৎ গুহ মনে করবেন[১৪৩]। কিছুটা কাছাকাছি যুক্তি আমরা খুঁজে পাই রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বিদ্যাসাগর সংক্রান্ত লেখায় – সেখানে আবার উনি দেখাতে চান যে - বিদ্যাসাগর আসলে রামমোহনের যে শ্রাস্ত্রাশ্রয়ী প্রতিবাদ অর্থাৎ সতীদাহ প্রথা রোধের ক্ষেত্রে সংহিতার অবতারণা করা, সেই প্রতিবাদকে নিন্দা করছেন এবং তার পরিবর্তে শাস্ত্র খণ্ডনের কথা বলছেন বা তার পুনর্বিবেচনা এবং বিভিন্ন বিশ্লেষণের কথা বলছেন কারণ বিধবা বিবাহ রদ করার ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় যৌক্তিক জোরের জায়গা ছিল – এই নানাবিধ বিশ্লেষণ এবং শাস্ত্র-খণ্ডনের যুক্তি। ফলত এক অর্থে এখানেও যেন সেই কাণ্ডজ্ঞান, শাস্ত্র কিংবা লৌকিক জ্ঞানের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে – এ নিয়ে আরও বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু রামমোহনের (কিছুটা বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও) চিন্তন এবং বঙ্কিমের ক্ষেত্রে চিন্তনের বিশেষ তফাৎ রণজিৎ গুহ করতে চাইবেন। তফাৎটা কিছুটা ঐতিহাসিক, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় ‘ধর্মতত্ত্ব’ থেকে ‘কৃষ্ণচরিত্র’ অবধি একটি যাত্রা আছে। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করছিলাম ‘ধর্মতত্ত্বে’ উনি লিখেছিলেন, মানুষের বিভিন্ন বৃত্তির কথা, সাহিত্যের সঙ্গে চিত্তশুদ্ধির সম্বন্ধ ইত্যাদির কথা আগেই লিখেছি - অরুনকুমার তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রে গিয়ে বঙ্কিমের এই ধারণায় এসে লাগে ‘বাহুবলে’-র রঙ। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে – কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম এমন এক জাতিনায়ককে খুঁজছেন, যাকে রক্তমাংসের মানুষরূপে কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। এখানেই রণজিৎ গুহ লিখবেন যে - বঙ্কিমের সেই স্বদেশচিন্তায় বাহুবলের রঙ এসে লাগছে। এই বাহুবলের দর্শন রণজিৎ গুহর মতে রামমোহনের স্বদেশ চিন্তায় ছিলনা এমনকি রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মতে হয়ত বিদ্যাসাগরের স্বদেশ চিন্তাতেও ছিলনা। তাহলে এক অর্থে, ‘ধর্মতত্ত্ব’ থেকে ‘কৃষ্ণচরিত্র’ – বঙ্কিমের নৈতিক যাত্রাটি আসলে কিছুটা ইতিহাসের রকমফেরে আর কিছুটা তার বিচারের প্রেক্ষিতে ক্রমে, বিশ্লেষণী দার্শনিক নীতিবোধ থেকে বাহুবলের দিকে সরে গেছে। যদিও আমাদের মাথায় রাখা উচিত, রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের মতনই বঙ্কিমও ঔপনিবেশিক আধুনিকতার একটি অংশে আবির্ভূত হচ্ছেন এমন এক সময় যখন পূর্ববর্তী সমস্ত ধারণাগুলি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। তাই বঙ্কিম নানারূপে প্রকাশিত ও সিদ্ধ কিন্তু তাঁর স্বদেশ চিন্তায় নৃশংসতা বা বাহুবলের তর্ক যে ছিল – এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সেই সূত্রেই নীতির কথাও উঠে আসে। সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাস আলোচনা করতে করতে হঠাৎ আমরা কেন, নৈতিকতার প্রসঙ্গে চলে এলাম? কারণ, যে সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিন্ন-পত্রাবলী লিখিত হচ্ছে, ততদিনে বঙ্কিমের সাহিত্য-চিন্তা সার্বিক ভাবে বিকশিত এবং প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের সত্য ও সাহিত্যের সম্বন্ধ বিষয়ক চিন্তনের সঙ্গে বঙ্কিমের সত্য ও সাহিত্য বিষয়ক চিন্তনের মধ্যে একটি তার্কিক ক্ষেত্র ঐতিহাসিকভাবেই প্রস্তুত হয়ে গেছে। বঙ্কিমী সাহিত্য চিন্তার মূল ঝোঁক নীতির দিকে এবং রাবীন্দ্রিক সাহিত্য চিন্তা প্রধানত নান্দনিকতা কেন্দ্রিক। এটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মাথায় রাখতে হবে,

---

[১৪৩] রণজিৎ গুহ, *দয়া : রামমোহণ রায় ও আমাদের আধুনিকতা*, তালপাতা , ২০১০

এই বিভাজন তর্কের অতীত কোন সিদ্ধান্ত নয়, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আপাতত আমরা সেই তর্কে প্রবেশ করব -

"সাহিত্য কথাটির বুৎপত্তিতে যে 'সহিত' শব্দটি রয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই নিজের অর্থে সেই 'সহিত'...বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য আদর্শ নৈতিক, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আদর্শ ইস্থেটিক বা নান্দনিক।"[১৪৪]

সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা 'সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ রায় এই ভেদ থেকেই তাঁর তর্ক শুরু করেছেন এবং ক্রমে তর্কটিকে আরও জটিলতায় সম্প্রসারিত করেছেন। সমালোচনা বিষয়টিকেই উনি ভীষণ নীরিক্ষনমূলক দৃষ্টি দিয়ে সংজ্ঞায়িত করার প্রচেষ্টা করছেন। লিখছেন সমালোচনা কোন সংজ্ঞায় বাঁধা কঠিন, ঠিক এমন কথা আমরা সাহিত্য নিয়েও বলছিলাম। এইরূপ বহুত্বের দর্শন একটি সাধারণ আলগা বিচার কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সমালোচনা-সাহিত্যের সংজ্ঞায়ণ বিষয়ে একটি জরুরি তর্কের উত্থাপন করছেন। লিখছেন,

"কী সমালোচনা আর কী সমালোচনা নয় তা বিচার করবার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে, এইটে নির্ধারণ করা যে, কোন আলোচনাতে সাহিত্যের আনন্দকরতাকেই সাহিত্যপাঠের কেন্দ্রস্থ সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে, আর কোন আলোচনাতে বা তা হয়নি। হিসেবটা কিন্তু সহজ নয়। যেহেতু আনন্দ ব্যাপারটার মধ্যেই সমাজ, সংস্কার, সংস্কৃতি সব এসে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেই হেতু নিছক আনন্দ জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেও কাকে যে রাখবো আর কাকে যে বাদ দেবো তা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ।"[১৪৫]

এই বহুবিধ সমালোচনার মধ্যে মূল কোন একটি সূত্র থাকলেও , বিভিন্ন সমালোচনার উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতির মধ্যে তফাৎ চিহ্নিত করে করে চলা – ভীষণ প্রয়োজনীয়। সত্যেন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমালোচনাকে দেখতে চাইবেন। এই তর্কের খানিকটা অংশ আমাদের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনার অনুষঙ্গী। সত্যেন্দ্রনাথের মতে প্লেটো যেমন তাঁর সমাজ থেকে শিল্পীদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিল, তেমনই সাহিত্যের মূল্য বিষয়ে অনেকের অনেকরকমের মত আছে এবং থাকতেই পারে। তবে সাহিত্যের আনন্দ-মূল্য বা চরম-মূল্যের ধারণার প্রাধান্য বেশি – একথা অনেকেই স্বীকার করবেন। এইপ্রকারের মূল্য-বিভাজনের ভিত্তিতে সাহিত্য কিংবা না-সাহিত্যের বিচার করলে আসলে মুখ্য ও গৌণের তফাতে পড়ে যেতে হয়। আনন্দ-মূল্যের হেতু হয়ে যায় বাকি মূল্যগুলি – রসতত্ত্বের ভাষায় যেগুলিকে, বিভাব অনুভাব ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে উনি এই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং এর মধ্যে থেকে সমালোচনার রস বলে সাহিত্যে কিছু একটা খুঁজে পাওয়া সম্ভব কিনা – তার প্রস্তাবনা করেন।

---

[১৪৪] সত্যেন্দ্রনাথ রায়, (প্রস্তাবনা অংশ) *সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

[১৪৫] সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ-৫

এবিষয়ে, সাহিত্য ও ইতিহাসের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধের কথা মনে করা যেতে পারে – একটি 'সাহিত্যের ঐতিহাসিকতা' প্রসঙ্গে, যেটা বুদ্ধদেব বসুর চিঠির প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে লিখিত[১৪৬]। যেখানে উনি সাহিত্যের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যের দায় এবং 'সাহিত্যের ঐতিহাসিকতা'র প্রসঙ্গকে পৃথক করে দেখেন। যে যুক্তির প্রতিফলন আমরা খুঁজে পাই পূর্বোল্লিখিত ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ-র 'History at the Limit of World History' গ্রন্থে। যার প্রতিপাদ্য ছিল - ইতিহাসের মধ্যে তথ্যের যে দায় থাকা উচিৎ, সাহিত্যের ঐতিহাসিকতার তেমন কোন দায় নেই কারণ সাহিত্য আসলে ভাবের ইতিহাস। এটা ভীষণ জটিল প্রশ্ন এক্ষেত্রে, ভাব কাকে বলব কিংবা ভাবের ইতিহাস বলতে কি বুঝব – প্রসঙ্গত রণজিৎ গুহ, জার্মান দার্শনিক মার্টিন হেইডেগারের, 'Historicality of Being' –এর প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন, যা 'Historicity'-অর্থে যে ঐতিহাসিকতা সেই তথ্য-কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধচারী[১৪৭]। এই আলোচনাটি ভাববাদী সাহিত্য তত্ত্বের রকমফের বিষয়ে গভীরে আলোচনার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ – আমাদের আলোচনার অন্যান্য খণ্ডের সঙ্গে হয়ত এই তর্কের সম্বন্ধ যোগ ঘটতেও পারে। বিশেষত সাহিত্যের বিভিন্ন মূল্যের মধ্যেই কিন্তু এই তর্ক একই সঙ্গে ইতিহাসের বিভিন্ন মূল্যের তর্কেও জুড়ে যেতে পারে। আবারও এর মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের ব্যাপ্তি এবং জটিলতার তীব্রতাই প্রমাণিত হয়। এই প্রস্তাব বিতর্কিতও এক দিক থেকে দেখলে, কারণ নব্য-ঐতিহাসিকতাবাদ এবং অন্যান্য প্রেক্ষিতে এর আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ তর্ক আছে, যদিও সেসব তর্ক আমাদের আলোচনার বিষয় নয় তবু এই অনুপুঙ্খ বিষয়ে গবেষকদের নজর খোলা থাকা উচিৎ বলে মনে হয়। যে কথা থেকে এই তর্কের সূত্রপাত হয়েছিল, সমালোচনার রস – সে বিষয়ে আমরা আরেকটি অনুষঙ্গ পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের – 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে[১৪৮] - যেখানে উনি ব্যবহার করবেন একটি সবিশেষ পরিভাষা - 'ঐতিহাসিক রস'। ঐতিহাসিক রস, আসলে ইতিহাসও নয় আবার সাহিত্যও নয়। ইতিহাস পড়লে যেমনতর আনন্দের সঞ্চার হতে পারে ইতিহাসের পাঠকের মধ্যে যেন সেইরূপ আনন্দই কোন সাহিত্য এনে দিচ্ছে, যেন এমন একটা পরিসর নির্মিত করা যাচ্ছে যেখানে ঠিক ঠিক ইতিহাসের মতই একটা পরিসর, বাস্তবিকতা ,রোমাঞ্চ এমনকি ঐরকমই তথ্য-পূর্ণতার স্বাদ ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে উস্কে দেওয়া যাচ্ছে, অথচ সেই সাহিত্য কখনোই তেমন করে ইতিহাসের সঠিক তথ্য ও সত্যের জোয়াল কাঁধে নিয়ে লিখিত হচ্ছেনা। উভয়ের মূল্যের পার্থক্য সূচিত হচ্ছে যেন এখানে। এভাবেই সত্যেন্দ্রনাথ রায় 'সমালোচনার রস' কথাটি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে সমালোচনার পৃথক মূল্যের প্রসঙ্গ উত্থাপনের প্রচেষ্টা করছিলেন। সমালোচনার মূল্য এবং উদ্দেশ্যে নানান পার্থক্য থাকে তাই কেবল নয়, সমালোচনা নিজেও কি সাহিত্য হয়ে ওঠেনা ? লেখার তীব্র সম্ভাবনাগুলির সমস্তটুকুই কি তার মধ্যে নেই ? এই ভিত্তিতেও আমরা সমালোচনাকে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার থেকে পৃথক করতে অপারগ। আবার পৃথকত্বের দাবি থেকে সমালোচনা কোন দিনই বঞ্চিত হতে পারেনা। এই দিক থেকে

[১৪৬] সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা), সাহিত্যচিন্তা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১

[১৪৭] এই বিষয়েও রোসিঙ্কা চৌধুরী এবং রণজিৎ গুহ – র লেখা আছে যদিও আপাতত সেই আলোচনা প্রয়োজনীয় নয়।

[১৪৮] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য,* ঐতিহাসিক উপন্যাস, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড ৮ (বিশ্বভারতী, ১৩৪৮)

দেখলেও সাহিত্য সমালোচনা নিজেও আবশ্যিক ভাবে ‘লেখার কাজ’ আলোচনার অপরিহার্য অঙ্গ। আনন্দ-মূল্যের প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ আরও লিখছেন –

“সত্যিই কি সাহিত্যের আনন্দ-মূল্য মানুষের নৈতিক মূল্য থেকে, জীবনমূল্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক?[১৪৯]”

সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ আলোচনার পরবর্তীকালে আমরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তত্ত্বে আনন্দতত্ত্ব ও আরও বিভিন্ন তত্ত্বের রকমফেরের কথা উল্লেখ করব। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তাকে একসঙ্গে একটি চিত্রে বুঝে নেওয়ার প্রচেষ্টা করব – তখন আমরা দেখব যে রবীন্দ্রনাথের আনন্দতত্ত্ব কতটা বৈচিত্রমন্ডিত এবং বিস্তারিত। আপাতত আমরা সত্যেন্দ্রনাথের আলোচনার অভিমুখটুকু যথেষ্ট পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে বুঝে নিতে পারছি। ওনার মূল বক্তব্য, সাহিত্যের ‘মানদণ্ড অনিশ্চিত’ । সাহিত্যের মূল্য বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আইয়ুবকে কেন্দ্র করে পৃথক একটি আলোচনায় আমরা প্রবেশ করব, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আপাতত আমরা এটুকু বুঝেনি, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, তাঁর গ্রন্থে – যে অর্থে সাহিত্যের বিচার-দণ্ডের অনিশ্চয়তার কথা বলছেন তাঁর পিছনে ওনার যুক্তি হল – সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে, অনেক ভ্রান্ত সমালোচনার উদাহরণ আছে। সুতরাং সাহিত্য-সমালোচনার তথা সাহিত্যের বিচার-দণ্ডের অনিশ্চয়তাও এক অর্থে যেন সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণের পথে অন্তরায় সত্যেন্দ্রনাথের মতে।

এছাড়াও রসবাদের বিপরীতে উনি বলতে চাইবেন, অ্যারিস্টটল রসবাদী ছিলেন না বরং উনি ভোক্তাচিত্তের মধ্যে দিয়েই সাহিত্য-বস্তুর বৈশিষ্ট্যকে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রসঙ্গত লঞ্জাইনাস এবং অন্যান্যদের কথাও লিখবেন। সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতে রসতত্ত্ব আসলে প্লেটোবাদী চিন্তার সঙ্গে দর্শনগত ভাবে একই ঘরানার চিন্তা। ওনার মতে অ্যারিস্টটল এই চিন্তার বিরোধিতা করছেন এবং অ্যারিস্টটলের চিন্তা কোনভাবেই রসবাদী নয়। এমন তত্ত্ব খানিকটা বিতর্কিত হতে পারে। সে প্রসঙ্গে আমরা প্রবেশ করবোনা। সত্যেন্দ্রনাথের অন্যান্য যুক্তিগুলি নিয়ে আরেকটু কথা বলা যাক। ওনার মতে সমালোচক, লেখকের লেখার মূল রসটিকে ধরিয়ে দেন কিন্তু সমালোচনার নিজের রস আলাদা তার সঙ্গে লেখকের লেখার রসের কোন সম্পর্ক নেই। সাহিত্যের যে ব্যর্থতা ও সাফল্যের প্রশ্ন সেটা আসলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিচার্য। এখানে উনি আরেকটি আপাতভাবে বিতর্কিত কথা লিখেছেন যে সাহিত্য সমালোচনা তথ্যের পুনর্বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে বিচ্ছিন্নকে সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত করবে। সমালোচনা বিষয়ে এটি একটি গূঢ় বক্তব্য কারণ এর মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের সম্বন্ধ বা সংযোগ সমালোচনার মুখাপেক্ষী যেমন নয় একদিক থেকে তেমনি অন্যদিকে সমালোচনা পাঠের মধ্যে দিয়ে, পাঠক সমালোচিত সাহিত্যকর্মের পুনরাবিষ্কার করেন এবং এমন ভাবে করেন যেন, সমালোচক আলোচনার মধ্যে দিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলিকে সমগ্রে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই প্রস্তাব দার্শনিক নিঃসন্দেহে, পাশাপাশি অনেক তর্কের সম্ভাবনাও খুলে দিয়ে যায়। ঠিক এই

[১৪৯] সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ,* সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ-৭

অংশেই, বিচ্ছিন্নতাকে সমগ্রে জুড়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে, সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্যিক বস্তুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এতাবৎ আলোচনায় আমরা সাহিত্য-বস্তু বিষয়ে তেমন আলোচনা করিনি, সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন –

"সোজা কথায়, সাহিত্য-বস্তু কী-কবে-কেন-কোথায় ইত্যাদির সহযোগে তাকে তার বস্তুগত ও ভাবগত সমগ্রতায় – দেখা এবং দেখানো।"[১৫০]

সাহিত্য-বস্তু বলতে অবশ্যই এখানে বিষয়বস্তু বা সারাৎসার অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে সাহিত্যের মূল্য হিসেবে 'সাহিত্য-বস্তুব্যঞ্জনাবহুল। রোসিঙ্কা চৌধুরী যখন তাঁর গ্রন্থে 'Literary thing' বিষয়ে আলোচনা করবেন তখনও সেই আলোচনার ক্ষেত্রেও আমরা নানান তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনার সমাহার খুঁজে পাবো। যদিও উনি সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন এরকম কোন কথা ওনার গ্রন্থে লেখেননি। সে বিষয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে, সমালোচনা ও সাহিত্যিক মূল্য বিষয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্তের সুপরিচিত একটি গ্রন্থের আলোচনা এখানে প্রয়োজনীয় – গ্রন্থের নাম 'বাংলা সাহিত্যের একদিক'। খুব বিস্তারিত ভাবে না হলেও মোটের উপর এইটুকু বলা চলে, শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রধানত প্রবন্ধ নামক সাহিত্যিক সংরূপটিকে (যাকে উনি 'রচনা' বলতে চাইবেন) দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য বা নীচু মানের সাহিত্য হিসেবে কখনোই মেনে নিতে রাজী নন। 'রচনা' নামক সাহিত্য সংরূপটি আসলে ওনার মতে অনেক বেশি অনিশ্চিত একটি সংরূপ। কাকে রচনা বলা চলে, কতটা লিখলে তা রচনা এবং আমরা যে কোন কিছুকেই রচনা বলি আবার সবই কি রচনা? যেমন লেখালিখি বা লিখনের ক্ষেত্রেও, শব্দটির নানাবিধ ব্যবহার আছে কিন্তু কোন একটা ব্যবহারে নিশ্চিতরূপে পাওয়া তাকে কঠিন হয়। যদিও 'রচনা' শব্দটি ততখানি ব্যাপক নয়, কিন্তু রচনার এই অনিশ্চয়তা একই সঙ্গে প্রবন্ধ বা সমালোচনা সাহিত্যের যে রসতাত্ত্বিক মাত্রা তার কথা আমাদের পুনরায় মনে করিয়ে দেয়। তাঁর গ্রন্থে আমরা লক্ষ করি, সমালোচনা এবং সাহিত্যের যে উন্মুক্ত পরিসরের প্রসঙ্গে আমরা এই পর্যন্ত আলোচনা করলাম, তাতে করে, বঙ্কিমের নৈতিক সাহিত্য দর্শন এবং রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক সাহিত্য-চিন্তার অদলবদল - ওঁদের নিজেদের রচিত সমালোচনা সাহিত্যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই যে ওলট পালট হয়ে গেছে[১৫১] তা নয়, এই বিভাজন সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবেই ভীষণ জটিল এবং প্রায় অনির্ণেয়। তথাপি, এঁদের সাহিত্য-চিন্তার মৌলিক ভিত্তিগুলির তফাৎ হয়ে যায়, নীতি কিংবা নন্দনের তফাতে। বিশ শতকের প্রেক্ষিতেও বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘিরে 'বঙ্কিম প্রতিভা', 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' (১৯৪০ খ্রীঃ) –প্রমুখ গ্রন্থ লিখিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গটিকে ধরে, রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে, ললিতকুমার লিখেছেন(বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে) -

' " বাস্তব জীবনের যথাযথ চিত্র অংকিত করা, যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং করা, তাঁহার প্রতিভার প্রিয় পদার্থ ছিল না। 'গার্হস্থ্য উপন্যাস' লেখাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিলনা। তাঁহার লক্ষ্য Idealism,- Realism নহে। সুতরাং 'আলালের

[১৫০] সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ-২২

[১৫১] শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের একদিক*, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

ঘরের দুলাল' এ বা 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় বা 'সধবার একাদশী'তে বা 'স্বর্ণলতা'য় বা 'মেজবউ' এ গার্হস্থ্য জীবনের যে কঠোর বাস্তবতা আছে, এই শ্রেণীর আখ্যায়িকায় তাহার স্থান হইতে পারেনা। পারিবারিক জীবনের সকল দিক সম্পূর্ণভাবে অঙ্কিত হইবে, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, সন্তানস্নেহ, সৌভাত্র প্রভৃতি সম্পর্কে পূর্ণায়তন চিত্র থাকিবে, ইহা কখনও এই শ্রেণীর কাব্যে আশা করা যাইতে পারে না। প্রেমকাহিনীই এই শ্রেণীর কাব্যে অধিক স্থান জুড়িয়া থাকিবে, অন্য অবান্তর বিষয় সংক্ষেপে থাকিবে। এ অবস্থায় যে কবি ননদ-ভাজ, দুই ভগিনী, শাশুড়ি-বৌ প্রভৃতি সম্পর্কের সুন্দর চিত্র স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায়। (কাব্যসুধা)"[১৫২]

এই ধরণের সমালোচনা ছাড়াও বঙ্কিমকে ঘিরে, সমালোচনার আঙ্গিক নিয়ে তর্ক হচ্ছে সমালোচনার ইতিহাসে। কেউ কেউ বলছেন বঙ্কিমচন্দ্র জীবনশিল্পী, মানব জীবনের চিত্রকর ইত্যাদি। এছাড়াও অরুণকুমার 'বঙ্কিম গোষ্ঠীর সমালোচক' নামে একটি বিভাগ করেছেন। সেখানে মূলত বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ও অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত বঙ্কিমী মতাদর্শের নানান লেখা পত্র এবং সর্বোপরি বঙ্কিমী সাহিত্য-বাদ – এই সম্পূর্ণ বিষয়ের বিরোধী যারা, তাদের লেখা-পত্রগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনাগুলি যে যে গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে, সেগুলি হল – 'সমালোচনা' (১৮৮৮খ্রীঃ), 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭খ্রীঃ), 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭খ্রীঃ), 'সাহিত্য'(১৯০৭খ্রীঃ, প্রথম প্রকাশ), 'সাহিত্যের স্বরূপ'(১৯৪৩খ্রীঃ), 'সাহিত্য' নামক প্রবন্ধ সংগ্রহে উনি লিখছেন,

"'...সাহিত্যের এই ফলগুলি তেমনি প্রত্যক্ষগোচর নয় বলে অনেকে একে শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন দিয়ে থাকেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সাধারণত দেখলে বিজ্ঞান-দর্শন ব্যতীতও কেবল সাহিত্যে একজন মানুষ তৈরি হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-ব্যতিরেকে কেবল বিজ্ঞানদর্শনে মানুষ গঠিত হতে পারেনা।"...এই মানবসঙ্গব্যাকুলতাই রবীন্দ্রসাহিত্যের মৌল প্রেরণা'[১৫৩]

অরুণকুমারের এই পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহে প্রসংশাসূচক। প্রশ্নটা আসলে এটা নয়, যে রবীন্দ্রনাথ কি কেবলই মানবতাবাদী ছিলেন? আর কি কোন আধুনিকতার চিহ্ন ওনার সাহিত্যে নেই? এটা আসলে একধরণের বিদ্যাচর্চা ও দর্শনচর্চার পঠনভঙ্গী। আগের থেকে একটা সিদ্ধান্তকে ধরে নিয়ে আমরা পুরাতন পাঠ্যে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে নামার ধরণ। তখন যে সব বড় দাগের কথাবার্তা তা গৌণ হয়ে যায়, এক দুটো পংক্তি নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করি। আমার মনে হয়, এই পদ্ধতির মধ্যে সাধারণ ভাবে ভুল বা ঠিক কিছু নেই। বিশেষত দেরিদার পঠন পদ্ধতির মধ্যে এরকম প্রান্তিক স্তর থেকে কোন একটা পাঠকে খুঁজে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া অসংখ্য ছিল। বলা বাহুল্য, ওনার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া একটা আবিষ্কারের মাত্রা পেত। কিন্তু ইদানিং ক্রমে তা আমাদের অভ্যাসে কেবল,

---

[১৫২] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-১১৪

[১৫৩] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-১৬৩

অন্য লেখকের মুখ দিয়ে নিজের কথা বলিয়ে নেওয়ার ছলচাতুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে হয়ত। কোন লেখার মূল যে তর্ক, সেই তর্কের সঙ্গে ঐ নির্দিষ্ট প্রান্তিক পাঠটির বনিবনা হতে হবে, একধরণের সম্পর্ক নির্মিত হতে হবে তবেই সে আলোচনা সার্থক হয়। এই সম্পর্ক অসংখ্য-ভাবে নির্মাণ করা যায়, যেমন এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ থেকে না-মানুষিক দর্শনের অনেক উদাহরণ টানা সম্ভব, সেটা বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষিতেই হোক কিংবা দার্শনিক প্রেক্ষিতে, বিজ্ঞান নিয়ে ওনার উৎসাহ বা জ্ঞান কম ছিল -একথা ভাবার কোন কারণ নেই। তথাপি কালান্তরে, যুদ্ধবিদ্ধস্থ পৃথিবীর মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন তিনি মনুষ্যত্বের কথা বলছেন, তখন বুঝতে হবে, এটা তাঁর প্রধান যৌক্তিক চর্যা। এটাই তাঁর চিন্তার ভিত্তি। এভাবে না বুঝলে, একটা বিরাট ঐতিহাসিক দূরত্ব খুব অবহেলায় পেরিয়ে যেতে হয় আমাদের। এক্ষেত্রে আমরা যাদের নিয়ে আলোচনা করছি, চেষ্টা করছি তাদের নিজেদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধ রেখেই, পাঠ্যগুলিকে নতুন আলোকে ভেবে দেখার। অরুণ কুমার লিখেছেন,

“সাহিত্য কেন? এই মূল প্রশ্নের বিচারে রবীন্দ্রনাথ কুণ্ঠাহীন। মানবজীবনের মহিমাকে রূপদানই সাহিত্যিকের লক্ষ্য বলে তিনি মনে করেন।”[১৫৪]

আরও লিখেছেন, ‘প্রকাশ অর্থে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বুঝেছেন, মানবপ্রকাশ।“সাহিত্য বিশ্বমানব আপনাকেই প্রকাশ করিতেছে।...

এই আনন্দে পাঠকের মুক্তি। “নিত্যলোকে রসলোকে তথ্য-বন্ধন থেকে মানুষের এই মুক্তি...”’[১৫৫]

রস বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝতে চেয়েছিলেন, ওনার সময়ে দাঁড়িয়ে, সে বিষয়েও অরুণকুমার লিখেছেন,

‘ “শ্রেষ্ঠ কাব্যে প্রথমে আমাদের কানের ও কলাবোধের তৃপ্তি, তারপরে আমাদের বুদ্ধির তৃপ্তি ও তারপরে হৃদয়ের তৃপ্তি ঘটলে তবেই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যে যে রস তাই আমাদের স্থায়ী-রূপে প্রগাঢ়রূপে অন্তরকে অধিকার করে। নইলে, হয় রসের ক্ষণিকতা, নয় রসের বিকার ঘটে।” [বিকারশংকা, ‘শান্তিনিকেতন’, প্রথম খন্ড]’[১৫৬]

মানবতাবাদের প্রচলিত তর্কের পাশাপাশি, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য তত্ত্বের উৎস সন্ধানে , অরুণকুমার আরও একটি সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন। লিখছেন,

---

[১৫৪] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-১৬৪

[১৫৫] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-১৬৪

[১৫৬] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-১৬৫

‘ “রবীন্দ্রনাথের সুন্দর-সত্য-শিব সম্পর্কিত ধারণার মূল পাই ভিক্টর কুঁজা (Victor Cousin 1792-1867) রচিত “সত্য-শিব-সুন্দর” ভাষণে (‘Du vrai, du beau et du bien’, 1836 ; Eng. translation: 1854 : ‘Lectures on The True, the Beautiful and the Good’) । রবীন্দ্র অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসি থেকে এই বই বাংলায় অনুবাদ করেন। ঠাকুর-পরিবারে এই গ্রন্থের নাম সমাদর ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কুঁজার মতে সুন্দরের সঙ্গে প্রয়োজনের যোগ নেই। তিনি ‘সুন্দর’ বলতে নৈতিক সৌন্দর্য ওরফে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে বুঝেছেন ; শিল্পের উদ্দেশ্য একে প্রকাশ করা। রবীন্দ্রনাথও তাই মনে করেন।” ’[১৫৭]

এই বিষয়ে বিশেষত আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আবার আলোচনা করব, যেখানে আমরা বুঝতে পারব যে, রবীন্দ্রপন্থী আবু সৈয়দ আইয়ুব এবং মার্ক্সবাদীরা কিভাবে রবীন্দ্রনাথ তথা আইয়ুবের এই নির্দিষ্ট তর্ককে কেন্দ্র করে তর্ক করছেন। আপাতত উল্লেখ্য যে, অরুণকুমার তথ্যগত ভাবে যদিও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তার নানাবিধ উৎস সন্ধানে, এদেশি ও বিদেশী দার্শনিক চিন্তনের সূত্র উদ্ধার করে করে দেখিয়েছেন, তথাপি বোধ হয় ওনার আলোচনা যেন একটু খাপছাড়া, আলগা গোছের। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগত আরও বিপুল ও বহুমাত্রিক। আমাদের গবেষণার আলোচনা ও তর্কের প্রেক্ষিতে যতটুকু উঠে আসা সম্ভব, ততটুকু রবীন্দ্রনাথই কেবল আলোচনায় উঠে আসছে বলে আমার মত।

সত্যেন্দ্রনাথ ওনার চিন্তা-সিরিজের সংকলনগুলির মধ্যে ‘সাহিত্য চিন্তা’-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাগুলিকে একত্রে জরো করে করে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তার একটা কোলাজ তৈরি করেছেন, যা আমাদের একটি প্রকৃষ্ট চিত্র খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এই চিত্র-সংগঠিত করার প্রয়াস দেখলেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ কতখানি বহুমাত্রিক চিন্তক ছিলেন। বলাবাহুল্য, প্রায় যা কিছুর সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, সেই সাক্ষাতের পর নিজের চিন্তায় কিছুটা বিয়োজন কিংবা সংযোজনের কাজ চালিয়ে গেছেন। কোন ক্ষেত্রকে অবহেলা করেননি। হয়ত এটা এক অর্থে প্রকৃত উদারবাদী চিন্তকের মূল লক্ষণ অথবা হয়ত চিন্তকেরই মূল লক্ষণ এটি – সেটা বিতর্কিত প্রসঙ্গ। এই সৌন্দর্য, মানবতাবাদ, সত্য ইত্যাদির মাঝেই অতিরিক্তের কথা বলতে, উদ্বৃত্তের কথা বলতে রবীন্দ্রনাথ কখনো ভুলে যাননি –

“...এই অনুভূতিকে অসম্ভব অত্যুক্তি ছাড়া আর কী দিয়ে ব্যক্ত করা যেতে পারে। রসসৃষ্টির সঙ্গে রূপসৃষ্টির এই প্রভেদ ; রূপ আপন সীমা রক্ষা করেই সত্যের আসন পায়। আর রস সেই আসন পায় বাস্তবকে অনায়াসে উপেক্ষা করে।”[১৫৮]

---

[১৫৭] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-১৬৫

[১৫৮] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ--১৭৭

রবীন্দ্রনাথের লিখন-তর্কের প্রসঙ্গে রসবাদের যে আনুমানিক পাঠ করার প্রচেষ্টা করছিলাম আমরা গত অধ্যায়ে – অরুণকুমারের উদ্ধৃত একটি উক্তি থেকে সেই বিষয়ে আরও কিছুটা নিশ্চিত হওয়া যায় –

"...আজ জন্মদিনে এই কথাই ভাববার – রসের ভোজে কিংবা রূপের চিত্রশালায় কোন্‌খানে আমার নাম কোন অক্ষরে লেখা পড়েছে। লোকখ্যাতির সমস্ত কোলাহল পেরিয়ে এই কথাটি যদি দৈববাণীর যোগে কানে এসে পৌঁছতে পারত, তাহলেই আমার জন্মদিনের আয়ু নিশ্চিত নির্ণীত হত। আজ তা বহুতর অনুমানের দ্বারা জড়িত বিজড়িত।"[১৫৯]

এই উৎক্রান্তিমূলকতা রবীন্দ্রচিন্তার সবিশেষ উপাদান। এই বিষয়ে বিস্মৃত না হয়ে এবং একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে অন্য কোন এক তর্কে জবর্দস্তি আঁটিয়ে না নিয়ে, আমাদের চিন্তা করা উচিৎ যে - এই সীমাবদ্ধতা বা উন্মুক্ততার মধ্যে থেকেই কোন নূতন চিন্তার বিচ্ছুরণ কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব? এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় বলে আমার মনে হয় – প্রাগাধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাব্যের রূপগত বা আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতাগুলিকে ভীষণ সচেতনভাবে মেনে নিয়ে কাব্য সংগঠিত করার ঐতিহ্য খুঁজে পাই আমরা। এই সূত্র ধরে আমাদের মনে হতে পারে, আধুনিক সাহিত্য, যে কোন সীমাবদ্ধ সাহিত্য আঙ্গিককে ভেঙে দিতে চায়, যেমন রবীন্দ্রনাথ সবকিছু থেকে পালিয়ে এসে, চিঠির মধ্যে প্রকৃত প্রকাশের সন্ধান করছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কোন একটা অনুশাসন ভেঙ্গে ফেলার থেকেও যেটা প্রবল ছিল, তা হল যতরকমের রূপে সাহিত্য প্রকাশ সম্ভব তার প্রায় সবগুলির মধ্যে দিয়েই সাহিত্য রচনার চেষ্টা, অর্থাৎ নতুন নতুন সীমাবদ্ধতায় নিজেকে যাচাই করা। এই প্রবণতা কোন একজন লেখককে, নিজের মতাদর্শগত প্রেক্ষিতকে বার বার বিপদের মুখে ফেলার ঝুঁকি নিতে প্ররোচনা করে। অর্থাৎ ছন্দে লেখা কিংবা না লেখা, উপন্যাস লেখা কিংবা ছোটগল্প লেখা, গীতিনাট্য কিংবা নৃত্যনাট্য লেখা – যাইহোক, এই সমস্ত মাধ্যমের সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়েই লেখা, এই সীমাবদ্ধতা, শর্তগুলিকে সম্মান করা অথচ বলবার কথাটিকে বজায় রাখা। এই চর্চায় ক্রমে হয়তবা খানিকটা ফুটেও ওঠে, যে কোন মাধ্যমে লেখা হচ্ছে, তার সীমাবদ্ধতাগুলি নিশ্চয়ই কি লেখা হচ্ছে তাকে একই সঙ্গে নির্মাণও করে। তাই আধুনিককালে কেবল সাহিত্যের নিয়ম ভাঙ্গাই নয়, নিয়ম নিয়ে তর্ক এবং বিশেষ বিশেষ শর্ত তৈরি করে তার মধ্যে দিয়ে লঙ্ঘণক্রিয়া সম্পন্ন করা – আধুনিকতাবাদীদের এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধটিকে অনেকসময় পাঠক না বুঝেই এড়িয়ে যান। এটা কেবলমাত্র এক-পাক্ষিক ভাঙার গল্প নয়, নতুন নতুন সীমাবদ্ধতায় প্রবেশ করে ভাঙার গল্প। এইখানেই, একজন লেখকের ভাষার প্রতি দক্ষতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, জীবনবোধ, সমাজকে, সম্পর্ককে দেখার, নিরীক্ষণ করার অবিরাম প্রয়াস – সমস্ত গুণাগুণের বিচার সম্ভবপর হয়। এই বৈচিত্র্যের ভিত্তিতেই আমরা ঐতিহাসিক ভাবে লেখকে-লেখকে তফাৎ করতে পারি।

---

[১৫৯] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাব্লিশিং,২০১৯, পৃ-১৭১

সাহিত্যের মূল্যের প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে আধুনিক কালে বাংলা সাহিত্য চিন্তার ইতিহাসের ধারায় ক্রমে উনিশ-শতকের প্রাথমিক কালপর্ব থেকে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ পর্বে প্রবেশের মধ্যে দিয়ে, মূল্যের তর্কটি প্রধানত সাহিত্যের নৈতিক তথা সামাজিক দায়বদ্ধতা (সেটা সমাজসংস্কার অর্থে হতে পারে, ঐশ্বরিক চর্চার অর্থে হতে পারে, পারিবারিক দায়বদ্ধতা অর্থে হতে পারে আবার স্বাদেশিকতা বা জাতিবোধের শর্তেও হতে পারে। প্রাচ্য অলংকার এবং পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের প্রভাবের পাশাপাশি, উনিশ-শতকে ধর্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরচিন্তার বড় একটি অংশ ছিল, যার দায়বদ্ধতা নানা ভাবে সাহিত্য চিন্তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। এই দায়বদ্ধতার প্রধান ঝোঁকটি নৈতিক। এই নৈতিক সহিতত্বের প্রাধান্য যেন – একভাবে সাহিত্যের বড় অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে যদিও নৈতিকতা বলতে ভিক্টোরীয় নৈতিকতাকে বুঝব কিনা সেটি তর্কের বিষয়, নৈতিক দায়বদ্ধতা ছুৎমার্গ অর্থে একেবারেই নয়, বরং বলা চলে, ব্যক্তি অতিরিক্ত কোন মূল্যের প্রতি দায়বদ্ধতা। যেটা অন্যদিকে বিশেষত, রোম্যান্টিকতাবাদ ও লিরিক কবিতার হাত ধরে ক্রমে রবীন্দ্রনাথে এসে অনেক বেশি ব্যক্তির অন্তর্মুখীনতার দিকে সংকুচিত হয়ে আসে। খুব বৃহৎ অর্থে এইভাবে উনিশ-শতক জুড়ে, নীতি ও নন্দনের , পারস্পরিক সীমানা ও লঙ্ঘনের খেলার মধ্যেই আমরা সাহিত্যের মূল্যকে বৃহৎ অর্থে খুঁজে পাই। এই প্রেক্ষাপটকে স্মরণে রেখে যদি আমরা ছিন্ন পত্রাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গটিকে ফিরে দেখি – তাহলে, একভাবে যেন পাঠকের প্রতি গড়ে ওঠা একধরণের সীমাবদ্ধ দায় থেকে যেন রবীন্দ্রনাথের লিখন দর্শন মুক্তি পেতে চায়, আরও কোন অধিক সত্যের সন্ধানে। সাহিত্যের জন্য গড়ে ওঠা জমাট সংরূপগুলির মধ্যে দিয়ে নয়, লেখা যেন আরও গভীরতম, আরও উচ্চতম কোন সম্বন্ধের কাঙাল। যে সম্বন্ধের জন্য পাঠক সমাজ তখনও প্রস্তুত নয়[১৬০]।

এই অনুষঙ্গে আমরা আবার ফিরে, মনে করতে পারি রবীন্দ্রনাথের পুরনো একটি অনুষঙ্গ যে - পাঠকের দরবারে ওনার লেখা যেন ঠিক ঠিক পৌঁছতে পারেনা, ইন্দিরাদেবীর কাছে লেখা একটি ছোট্ট চিঠিতে উনি সেই সম্বন্ধ উদঘাটন করতে তৎপর হন কিংবা রানুর একটি সামান্য চিঠি পেয়ে, সেই চিঠি নিয়ে মত্ত হয়ে ওঠেন।

পরবর্তীকালের বিখ্যাত সমালোচক যারা বাংলা বিদ্যায়তনিক প্রেক্ষিতে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন যেমন – শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন চক্রবর্তী, রণজিৎ গুহ, প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, মালিনি ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা – তাঁদের আলোচনার প্রসঙ্গ এখানে নিয়ে আসছিনা, কারণ সেই ইতিহাস এখনও বাংলা সংস্কৃতিতে অলিখিত। একদিকে যেমন এদের চিন্তায় মার্ক্সবাদী ধারার প্রভাব ছিল তেমনি – এরা পৃথিবীর আরও নানাবিধ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। যেহেতু আমাদের গবেষণা খুব নির্দিষ্ট ভাবে ‘লেখার কাজ’-এর আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং মার্ক্সবাদী সমালোচনার অংশটুকু মানিক কিংবা অমিয়ভূষণ আলোচনার প্রেক্ষিতেই উঠে এসেছে – সেই হেতু উক্ত প্রজন্মের নানাবিধ লেখালিখির প্রসঙ্গ সরাসরি আমাদের গবেষণায় উঠে আসবেনা। পরোক্ষ ভাবে সর্বদাই

---

১৬০ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাবলিশিং,২০১৯, পৃ-৭৭

সেই প্রজন্মের ঋণ আমাদের চিন্তায় বর্তমান। আমাদের গবেষণার মূল দার্শনিক প্রস্থান যেহেতু বিনির্মানবাদ (Deconstructionism) সেই হেতু প্রধাণত অণির্বান দাশের চিন্তা এবং পাশাপাশি শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও কিছু চিন্তকের লেখা-পত্র আমাদের গবেষণায় উল্লেখিত হয়েছে।

এই অধ্যায়ে পঞ্চাশ পরবর্তী সমালোচকদের আলোচনা সূত্রে কয়েকটি প্রসঙ্গ উঠে আসবে। আপাতত অরুণকুমার কিংবা সত্যেন্দ্রনাথের তুলনায় সুদীপ বসুর আলোচনায় আমরা আরও স্পষ্ট-রূপে রবীন্দ্রসাহিত্য চিন্তার রূপরেখা পাই। সেই রূপরেখার পুনর্লিখনের মাধ্যমে এখানে আমরা আবার আমাদের গবেষণার প্রসঙ্গটিকে বুঝে নেওয়ার প্রচেষ্টা করব। এই রূপরেখাটি বুঝলে ছিন্নপত্রের তর্কটি থেকে ঠিক কি আমরা খুঁজে নিতে চাইছি, সেই বিষয়েও আরও খানিকটা পরিষ্কার হওয়া সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তার কাঠামো নির্মাণ প্রকল্পটিকে তিনি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন –

১। ভূমিকাংশ, ২। তথ্য : বাস্তব : সত্য ৩। রস ও বাস্তব ৪। রূপ ও রস ৫। প্রকাশ-তত্ত্ব ৬। আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথ ৭। একালের চোখে প্রাচীন অলংকার। ৮। উপসংহার অংশ।

ওনার ভূমিকাংশে উনি অনেকখানি বিস্তারিত ভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য চিন্তার প্রাথমিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন –

‘ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তা ইদানীংকালে যথেষ্ট আলোচিত বিষয়। ব্যাপারটিকে সমালোচকেরা একাধিক নামে পরিচিত করে তুলেছেন... বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, প্রবাস-জীবনের কাছে যা ‘সৌন্দর্যদর্শন’, বিমলকুম্‌র মুখোপাধ্যায়ের কাছে ‘রবীন্দ্রনন্দনতত্ব’ ...কারোর মতে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা প্রবন্ধের ভিত্তিতে আছে ‘মিলনতত্ব’... কারো মতে “...ভারতীয় তত্ত্ব ও দর্শন থেকে আরম্ভ করে নিও-প্লেটোনিক, হেগেলীয় এবং রোম্যান্টিক সাহিত্য-দর্শন তাঁর ভাবনার উপর সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করেছে, অথচ তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। নন্দন-তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই।” ’ ’[১৬১]

এই রাবীন্দ্রিক বিশেষত্বকেই আবার সুবোধ সেনগুপ্তের সমস্যা-জনক মনে হয়েছে অথচ অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তাকে যথেষ্ট মূল্য দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন – সাহিত্যতত্ত্ব-চর্চা রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম। এরপর সুদীপ বসু, তাঁর গ্রন্থে, ‘তথ্য : বাস্তব : সত্য’ নামক বিভাগে – রবীন্দ্রনাথের তথ্য, সত্য এবং সৃষ্টির ধারণাকে অবলম্বন করে তিনি বলেন, জন্মসূত্রে অসম্পূর্ণ মানুষ যেন, সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে তথ্যের গণ্ডি পেরিয়ে সত্যের অসীমতায় প্রসারিত হয়। তথ্যের মধ্যে দিয়েই তাকে সত্যান্বেষণে যেতে হয় কিন্তু তথ্য বা বাস্তব বা রূপ কিন্তু সত্য বা রসাস্বাদন নয় – কতকটা এরকম তত্ত্বেই রবীন্দ্রনাথের তথ্য এবং সত্যের সম্পর্ক সংরক্ষিত। পরবর্তী অধ্যায়ে অন্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আবার ফিরে আসব এই তর্কে।

---

[১৬১] সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০, পৃ-৭৬

'রস ও বাস্তব' বিভাগে, বাস্তবতার সঙ্গে সাহিত্যের বিরোধিতা আছে কি নেই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান কতকটা ভাববাদীই বলা চলে – কারণ বস্তুর দর বাড়ে কমে, রোজের হাটে – ফলত হাটের কাব্য তিনি লিখতে নারাজ ছিলেন। তার বদলে কবির অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সুতরাং অনুভূতির অংশটুকু আমাদের আলোচনার সঙ্গে সম্বন্ধীয় বলে মনে হলেও অন্তরের আত্মপ্রসাদ প্রভৃতি ভাববাদী শব্দ-বন্ধ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা মুশকিল। ওনার সাহিত্য চিন্তা সেই অর্থে খানিকটা কাল্পনিকও একইসঙ্গে সে কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা।

রূপ ও রস অংশে, সুদীপ বসু রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে রবীন্দ্র-সাহিত্য-চিন্তায়, রূপ ও রসের পার্থক্য বিষয়ে স্পষ্ট বয়ান দিচ্ছেন –

' "রূপ আপন সীমা রক্ষা করেই সত্যের আসন পায়, আর রস সেই আসন পায় বাস্তবকে অনায়াসে উপেক্ষা করে।" [১৬২]'

প্রকাশ-তত্ত্ব অংশে সুদীপ বসু দেখাচ্ছেন, সেখানে প্রাথমিক ভাবে উনি, বিজ্ঞানের সঙ্গে কবির পার্থক্যের প্রসঙ্গে কথা বলবেন এবং কবির ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রকাশ সম্ভবপর ইত্যাদি বলবেন। সুদীপ বসু উদ্ধৃতি তুলে এনে লিখছেন, '"নিজের [সেই] পূর্ণ প্রকাশেই আনন্দ"'[১৬৩] প্রকাশের আরেকটি সংজ্ঞা উদ্ধার করে আনছেন তিনি, ' "বাস্তবে যা আছে বাইরে, তাকে পরিণত করে তুলতে হবে মনের জিনিস করে।"[১৬৪] ' এবং একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলবেন, '"কোন দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাস্টারির ভার লয় নাই।"[১৬৫] ' প্রকাশতত্ত্বের সঙ্গেই লীলাতত্ব সংযুক্ত তাই সুদীপ বসু এই সম্পর্ককে একটি উদ্ধৃতিতে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে তুলেছেন –

' "অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পরিনতি দান করবার যে চেষ্টা তাকে খেলা না বলে লীলা বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে আমাদের রূপসৃষ্টি করবার বৃত্তি, প্রয়োজন সাধনের বৃত্তি নয়।"[১৬৬] '

আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথ অংশে, এই ক্ষেত্রেও সুদীপ বসু রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদের মূল অংশটিকে চিহ্নিত করেছেন – 'প্রয়োজন ও জ্ঞানের যোগ ছাড়াও বিশ্বের সঙ্গে মানুষের বিশুদ্ধ অনুভূতির যোগ আছে। আর সেই যোগেই বিশ্বের সঙ্গে "আমার আত্মীয়তার সম্বন্ধ। যেখানেই বিশ্বে এই আত্মীয়তার অনুভূতি জাগে সেখানেই আমি

---

[১৬২] সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০, পৃ-৮০

[১৬৩] সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০, পৃ-৮১

[১৬৪] সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০, পৃ-৮১

[১৬৫] সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০, পৃ-৮১

[১৬৬] সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০, পৃ-৮১

আনন্দিত...রিয়েল অর্থে বাস্তব শব্দটিকে ব্যবহার না-করে "রিয়্যালিটির চেতনা" অর্থে প্রয়োগ করে তিনি বোঝাতে চাইলেন, আর্ট আমাদের মনে ঐ বাস্তবের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, আমাদের সত্তার সঙ্গে তার নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করে গভীর আনন্দের চেতনা এনে দেয়। "এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানিনা।" '[১৬৭]

অলংকার, রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় অলংকার বা রসের কারবারি দের প্রয়োজনের হাটে মাসুল দিতে হয়, উনি নিজেকে সেই মাশুলের জন্য প্রস্তুত মনে করেছেন। অলংকারের মাধ্যমেই চরমকে প্রকাশিত হতে হবে, একথাও তিনি অস্বীকার করেননি। অলঙ্কৃত বাক্যই কাব্য স্বীকার করেছেন এবং সার্থক অলঙ্কার প্রয়োগ ও কাব্যরচনার সঙ্গে ব্যক্তি রুচির সম্বন্ধ যোগ পেয়েছেন, বিশেষত যখন বাস্তববাদীদের সঙ্গে রুচির তর্ক হচ্ছে সেই পরিমণ্ডলেই তাঁর এই বোধ প্রবল হয়েছে। সব মিলিয়ে সুদীপ বসু ওনাকে মোটের উপর আনন্দবাদী হিসেবেই পাঠ করতে চেয়েছিলেন।

তাহলে প্রকাশ-তত্ত্ব, আনন্দবাদ, রসবাদ, সহিতত্ব, সংযোগ – যেভাবেই পাঠ করার চেষ্টা করতে চাই না কেন আমরা – প্রধানত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তায়, অনুভবের সত্যকার প্রকাশ ও সেই সূত্রেই জগতের সঙ্গে স্রষ্টার সংযোগ আবিষ্কার। যা কিছু স্রষ্টার নিজস্ব নয়, অপর তার সঙ্গে সংযোগ আবিষ্কার – এই অর্থে যদি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে বুঝি, তাহলে ছিন্ন-পত্রের বক্তব্যটিও সেই রকমই অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধের, সহিতত্বের ইশারা দেয় – যে সম্বন্ধ-যোগ সমকালীন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যচর্চা তথা সাহিত্যের কারবারের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন না রবীন্দ্রনাথ। সেই সীমাবদ্ধ সাহিত্য চর্চাকে ঠেলে দিয়ে অন্য কোন এক লিখনের পরিসরে খুঁজে চলেছেন যেন তিনি, সেই অনুসন্ধান প্রকল্পে তাঁর ব্যাকুলতারও যেন অন্ত নেই।

রোসিঙ্কা চৌধুরীর 'The Literary Thing' – গ্রন্থটি উনিশ শতকের গোঁড়ার দিকের সাহিত্য-চিন্তা এবং সাহিত্য-বস্তুর ধারণাটির সম্পর্কে জটিল একটি আলোচনার অবতারণা করেছে। একদিকে সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির ইতিহাস-গ্রন্থ, অন্যদিকে সাহিত্যতত্ত্ব এবং পাশাপাশি দর্শনের আলোচনার মধ্যে দিয়ে – প্রধানত উত্তর-ঔপনিবেশিক, বিশ্ব-সাহিত্যিক প্রেক্ষিত থেকে, সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের ধারণা বিষয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ওনার আলোচনার আকর ঐতিহাসিক সময় হল উনিশ-শতকের বাংলা সাহিত্য, সুতরাং আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে ওনার বক্তব্য প্রাসঙ্গিক সে নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। ওনার যুক্তি অনুসারে, বাংলা সাহিত্যের পরিসরে, ইংরেজি সাহিত্যের দ্বান্দ্বিক হয়ে ওঠার ইতিহাসের সঙ্গেই, স্বদেশচিন্তা এবং উপনিবেশবাদের ইতিহাস জড়িত। তথাকথিত 'Authentic' বা 'বিশুদ্ধ/ফাৎনামনস্ক' বাঙালি সংস্কৃতি বা সাহিত্যের ধারণা আসলে ঐতিহ্য ও বিশেষ একধরণের পাশ্চাত্য সাহিত্য-চিন্তার ধারণার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। যদি সেরকমটাই হয় তাহলে বিশুদ্ধ বাঙালিয়ানার ধারণাকে তর্কাতীত ভাবে গ্রহণকরার কোন অবকাশ নেই পাঠকের কাছে। তেমন কোন

[১৬৭] সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০, পৃ-৮২

সাহিত্যও যে আদপে সম্ভব – এমনটাও মনে করার কারণ নেই। ওনার চিন্তার পরিসর যথেষ্ট উন্মুক্ত – ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত। সাহিত্য-বস্তুর আলোচনাটিকে উনি প্রধানত – সাহিত্যে জাতীয়তাবাদ এবং স্বদেশ-বিদেশের দ্বান্দ্বিক পরিসরে – ঔপনিবেশিক বিষয়ীতার বিচরণসূত্র ধরেই আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর আলোচনার কেন্দ্রে যেমন উঠে এসেছে বিশুদ্ধ বা খাঁটি বাংলা সাহিত্যের বিতর্ক যেখানে রোসিঙ্কা চৌধুরীর বক্তব্য, খাঁটি বাংলা সাহিত্যের ধারাকে যদি অনুসরণই করতে চাওয়া হয় তাহলে সেটি কখনো সেই অর্থে খাঁটি বাংলা সাহিত্য নয়। যে মর্মে বা যে মূল্য আরোপ করে, উনিশ-বিশশতকের তার্কিকরা তর্ক করেছিলেন - বিশেষত আধুনিকতাবাদের পরিসরে তেমনি উঠে এসেছে[১৬৮] 'কবি কে?' – প্রসঙ্গে, বঙ্কিম এবং ঈশ্বর গুপ্তের তর্ক। যেখানে উনি রোঁলা বার্ত এবং দুসাঁ-র শিল্প-দর্শনের তর্ক টেনে এনে দেখিয়েছেন, কিভাবে বঙ্কিম-পূর্ববর্তী বিশেষত ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য আসলে 'যাহা আছে'[১৬৯] সেই বস্তু-পৃথিবীর সাহিত্য। এই বস্তুত্বের প্রেক্ষিতে কি প্রাগাধুনিক সাহিত্যকে বাঙালির খাঁটি সাহিত্য বলছেন কমলকুমার মজুমদারের মতন বঙ্গ-আধুনিকতাবাদীরা? এটা তাঁর প্রকৃত প্রশ্ন এবং এর ভিত্তিতেই কি কবিত্বের বিচার সম্ভব? যে কবিত্ব বা লেখকত্ব কমল মজুমদার বা জীবনানন্দ দাশের মত আধুনিকতাবাদীদের প্রতিভা সম্পদ – যদিও কমলকুমার ও কৃত্তিবাসের অনেকেরই রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিম বিষয়ে কিছুটা উদাসীনতা ছিল, এটা কল্লোল-যুগ সংস্কৃতির যুগ-বৈশিষ্ট্যের অঙ্গ যা সম্ভবত ঐতিহ্যাকারে প্রবাহিত হয়ে কৃত্তিবাস অবধি এসেছিল। তো যে অর্থে প্রতিভাবান কবি রবীন্দ্রনাথও – সেই অর্থে কিন্তু আধুনিকতাবাদীদের দৃষ্টিতে কোন কবি প্রতিভাবান নন – যে অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত প্রতিভাবান সে অর্থেও নন। যাইহোক, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনায় রোসিঙ্কা চৌধুরী যদিও অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, বরং ছিন্ন-পত্রাবলীর অনুবাদ গ্রন্থের প্রাককথণ অংশে কবি রবীন্দ্রনাথের আত্ম-আবিষ্কার বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা করেছিলেন, যে বিষয়ে আগের অধ্যায়েই লিখেছি। তাহলে কবিতার কবিত্ব কোথায় থাকে, কবির প্রতিভায় নাকি পাঠ্যে? বার্থের তর্ক টেনে এনে রোসিঙ্কা চৌধুরী দেখাবেন, শব্দ – শব্দই কবিতার কাব্য-বস্তু নির্মাণ করে – রোম্যান্টিক কাব্যতত্ত্ব সমস্ত কাব্যিক মূল্য, কবির প্রতিভাকে দিয়ে বসে থাকে, সেই মহিমা-তত্ত্বের খণ্ডনই আমাদের সাহিত্য-বস্তুর ধারণার কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। কী এই ধারণা, অর্থাৎ সাহিত্য বস্তু বা 'Literary thing' – বলতে তাহলে আমরা কি বুঝবো? এ বিষয়ে আমরা আগেই খানিকটা লিখেছি - মাশেরে, সৃজনের ধারণাকে উৎপাদনের নূতন ধারণা বা বলা চলে তর্কমূলক উৎপাদনের ধারণা দিয়ে পুনঃস্থাপণ করতে চেয়েছিলেন। পিয়ের মাশেরের 'Process' বা 'Work'–এর ধারণা এই ধরণের উৎপাদনের তত্ত্বের মধ্যে দিয়েই সংগঠিত হয়েছে। এই উৎপাদনের ধারণা অনেক বেশি উন্মুক্ত এবং ব্যাপক। প্রথাগত মার্ক্সবাদী চিন্তায় যে উৎপাদনের ধারণা তার নানাবিধ চিন্তামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেকেই করেছেন, যেমন : ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের 'Mechanical reproduction'- এর ধারণা তার মধ্যে অন্যতম। জাক দেরিদার,

---

[১৬৮] Chaudhuri Rosinka, *The Literary Thing*, Oxford University Press, 2014. P-47

[১৬৯] Chaudhuri Rosinka, *The Literary Thing*, Oxford University Press, 2014. P-74

‘স্পেক্টার্স অফ মার্ক্স’ গ্রন্থটির সমালোচনা-গ্রন্থ হিসেবে, ‘গোস্টলি ডিমার্কেসন’ গ্রন্থটির কথা সর্বজনবিদিত। ফরাসি চিন্তার ইতিহাসে, লুই আলথুসেরর বিখ্যাত ছাত্র যারা যারা ছিলেন – তার মধ্যে এতিনে বালিবার এবং পিয়ের মাশেরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিন্তক। জাক দেরিদা যেহেতু প্রাথমিক ভাবে, একজন অবভাসবিদ বা Phenomenologist ছিলেন (ওনার প্রথম কাজ ছিল এডমুন্ড হুসার্ল বিষয়ক)। সেহেতু ওনার কাজে মার্ক্স বিষয়ক তর্ক তেমনভাবে কেউ খুব একটা আশা করতেন না। উনিও মার্ক্স বিষয়ে আলোচনা করার কথা তখনই ভাবেন, যখন ইউরোপ জুড়ে মার্ক্স চর্চা থিতিয়ে এসেছে। ফলে কার্যত খানিকটা সেই কারণেই, ওনার প্রতি তথাকথিত মার্ক্সবাদীদের আক্রমণ একটু বেশি মাত্রাতেই দেখা যায়। খানিকটা সেই কারণেই, ‘গোস্টলি ডিমার্কেসনস’ গ্রন্থের শেষ অংশে, উনি ওনার সমালোচকদের প্রতি কিছুটা ঠাট্টার সুরেই একটি নিবন্ধ লেখেন। যার নাম ছিল – ‘মার্ক্স এন্ড সন্স’। নামটা কতকটা কর্পোরেট সংস্থার মতন শোনায়, উনি উল্লেখ করেছেন – মার্ক্সবাদীরা বংশ দেখে চিহ্নিত করেন একে অপরকে তাই ওদের ক্ষেত্রে ‘সন্স’- কথাটা ভীষণই উপযুক্ত। এই আলোচনায় উনি স্পষ্টাক্ষরে একটি বাক্য লিখেছেন – মার্ক্সের লেখা নিয়ে সমালোচকদের নিজেদের মধ্যে এবং দেরিদার সঙ্গে – নানাবিধ তফাৎ ও তর্ক আছে। একমাত্র ফ্রেডরিক জেমিসন ব্যতিরেকে দেরিদার মতে আর কোন মার্ক্সবাদীদের সঙ্গেই তেমন মতের মিল হয়নি ওনার। অবশ্যই সেই তালিকায়, মাশেরেও ছিলেন – যিনি দেরিদার লেখাকে মার্ক্সের নির্বস্তুকরণের বদলে, দেরিদার আত্মার অভীপ্সা রূপে পাঠ করতে আগ্রহী ছিলেন বেশি। এই ধরণের কটাক্ষগুলিকে দেরিদা একধরণের নিঃসংযোগ হিসেবে পড়েছেন এবং অবশ্যই তিনি এই ধরণের নানাবিধ পাঠের সম্ভাবনা বিষয়ে আগ্রহী, সে কথা আন্দাজ করাই যায়। মাশেরের প্রতি দেরিদার সেই নিঃসংযোগী ইঙ্গিতটুকুকেই আমরা আমাদের আলোচনায় মেনে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, এর বাইরেও নিশ্চয়ই দেরিদা ও মাশেরের মধ্যে নানাবিধ বিশ্লেষণাত্মক পরিসর খোলা থাকবে বলেই আমার ধারণা। ফলে আপাতত আমাদের আলোচনা যে অংশে রোসিঙ্কা চৌধুরীর আলোচনার সঙ্গে কিছুটা তফাৎ তৈরি করে ফেলছে – সেটা নিশ্চিতরূপেই দেরিদা এবং মাশেরের নিজস্ব দার্শনিক অবস্থানের তফাৎ। এই ধরণের তফাতগুলিই চিন্তকদের একে অপরের থেকে পৃথক করে। যাই হোক মাশেরেও তাঁর তর্কে কাজ বা Work –এর কথা বলবেন। যে কর্মমূলক উৎপাদনের তত্ত্ব দিয়েই পরবর্তীতে উনি সাহিত্যিক বস্তুকে বুঝতে চাইবেন। প্রকারান্তরে আমাদের তর্কের বিষয় সাহিত্য-বস্তু না হলেও কাজ-এর তত্ত্ব। লেখার কাজ-ই আমাদের তর্কের বিষয় – কিন্তু সেখানে আমরা ঐ দার্শনিক তফাৎটুকু মেনে নিয়ে চলছি, আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে আছে লিখন। আমাদের লেখার কাজের ধারণা, সৃজনের ধারণাকে ধরে রাখে – সৃজনশীল লেখকদের উদ্বিগ্ন, প্রকাশের আকুতিকে তফাতে রাখার কথা ভাবে – অনির্দিষ্ট অজানা কোন এক অপরের প্রতি তার দায়বদ্ধতাকে তফাতে রাখার কথা ভাবে - সেই শ্রমের অন্য পরত খোঁজার কথা ভাবে এবং এই সুতো ধরে, শ্রমের অন্য কোন এক সৃজনশীল পরত থাকে কিনা, তা খুঁজে দেখার কথা ভাবে। মানিকের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই তর্কের জটিলতায় আগেও প্রবেশ করেছি – পরবর্তীকালেও প্রবেশ করব আবার। কিন্তু আমাদের তার্কিক অভিমুখ অর্থাৎ দেরিদা, মার্ক্স, ডেরেক অ্যাট্রিজ কিংবা ভিকি কার্বির মত বি-নির্মাণবাদী এবং কিছু বিশেষ মার্ক্সবাদী

চিন্তকেরাই আমাদের আলোচনায় প্রাধান্য পাবে - যে কারণে লেখকের ‘Ideoculture’ কিংবা অন্য-অর্থে ঐতিহ্যের নানাবিধ প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে কোন লেখককে কিভাবে পাঠকরা যায় সেটা আরেকটা প্রশ্ন। রোসিঙ্কা চৌধুরী ঈশ্বর গুপ্ত-কে যেভাবে বস্তুর কবি হিসাবে চিহ্নিত করেন – তা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে ভীষণই নতুন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে একমত কিনা তা এখানে অনুল্লেখিত থাক – কারণ বঙ্কিম যেভাবে পাঠ করেন ঈশ্বর গুপ্ত-কে তার মধ্যেও বঙ্কিমী নজরটান রয়েই যায় এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের সম্বন্ধ হয়ত আরও কিছুটা জটিল যেভাবে ওনার কাব্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব উঠে আসে তা নিয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে বলেই আপাতত মনে হয়।

যাই হোক বঙ্কিমী যে কবিত্বের ধারণা, যার সঙ্গে অলৌকিক প্রতিভার ধারণা মিশে আছে, সেই অলৌকিকতার নানান তর্ক-বিতর্কই আমাদের আলোচনার প্রধান উপাদান – সুতরাং এই গবেষণা সার্বিক ভাবে, বঙ্কিমের ‘কবি’-কে কিভাবে দেখবে, তার উত্তর নিশ্চয়ই গবেষণার মধ্যেই নিহিত থাকবে। রোসিঙ্কা চৌধুরীর সঙ্গে আমার এই গুটিকয় চিন্তার তফাতের কারণ আগেই লিখেছি, আবারও উল্লেখ করছি – যথার্থ তফাতই চিন্তার অন্যতম গূঢ় ঐশ্বর্য।

তাহলে উনিশ শতকের যে প্রেক্ষাপটে ছিন্ন-পত্রাবলীর সেই ছিন্ন টুকরোখানি লিখিত হয়েছিল – তার মোটের উপর একখানি ধারণা আমরা পাচ্ছি। সর্বোপরি যে, সম্বন্ধের দায়বদ্ধতার কথা রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সূত্রে আমরা উদ্ধার করলাম, গত অধ্যায়েও যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম – তার সঙ্গে অ্যাট্রিজ ও দেরিদার সাহিত্যতত্ত্বের লেখকের বা স্রষ্টার অপরের প্রতি উন্মুক্ত হওয়ার তত্ত্বকে মিলিয়ে পাঠ করতে কোথাও অসুবিধা হয়না আমাদের। বরং সমগ্র আলোচনাটির মধ্যেই যেন সেই দেরিদার সাহিত্য প্রস্থানের ছায়া উজ্জ্বলতম।

এরপরের আলোচনা থেকেই আমাদের তর্ক অনেক বেশী নির্বাচন-ধর্মী হয়ে উঠবে - আমরা প্রবেশ করব রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে। এই অংশে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল তারকা হিসেবে বিরাজ করলেও, তাঁর বিরোধিতার উদ্যোগও মধ্যগগণে উঠে গেছে প্রায়।

এই সময়পর্বকে আমরা সাধারণত কল্লোলযুগ হিসেবেই চিনে নিতে পারি। ‘ফোর আর্টস ক্লাব’ থেকে ‘কল্লোল’ পত্রিকা হয়ে ওঠার কালপর্ব। যে কালপর্বে, একদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেন, বুদ্ধদেব বসুর মতো ব্যক্তিত্বরা – যাঁদের অনেকেই প্রকাশ্যে রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করতেন কিন্তু , আড়ালে রবীন্দ্রনাথ পড়তেন (একথা বহু আলোচিত)। ‘পরিচয়’ পত্রিকার সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি হয়ত কখনও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে বসেই কবিতা লিখছেন আবার লেখার মধ্যে বিষ্ণু দে বা জীবনানন্দ দাশের মতই সুস্পষ্ট রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ছাপ। অমিয় চক্রবর্তীর মত লেখকও ছিলেন এই তালিকায়। এঁদের প্রায় সকলেরই রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঋণ স্বীকারের মনোভাব নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করা। এরকম যুগের হাওয়ার মধ্যেই, যেখানে রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যে কেবল ‘রিয়ালিটির কারি পাউডার’ মেশানো চলছে, প্রমথ চৌধুরীর অবস্থান অনেকখানি স্বতন্ত্র। তাঁর ‘সবুজপত্র’

পত্রিকার মধ্যে দিয়ে চলিত ভাষার যে নতুন সাহিত্য রচনার দাবী নিয়ে তিনি সাহিত্য সমালোচনার তর্কে অবতীর্ণ হচ্ছেন – তার মধ্যে দিয়ে যেন, নতুন যুগের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'কল্লোলে'-র আবির্ভাব ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে হলেও প্রমথ চৌধুরী সমালোচনার চৌহদ্দিতে প্রবেশ করছেন – ১৯১৪ খ্রীঃ – উনি ওনার সমকালীন নবকবিদলকে সম্ভাবনাময় মনে করেছিলেন[170] - তাদের মধ্যে ছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রিয়ম্বদা দেবী এবং ভারতী ও মানসী ও মর্মবাণী গোষ্ঠীর কবিবৃন্দ – সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখেরা। ওনার সাহিত্য চিন্তার ক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা খুবই প্রবল ছিল – তার সঙ্গে ছিল খেলার ধারণার মিশ্রণ। কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্ব বেশ কিছুটা বস্তুতান্ত্রিক। অর্থাৎ উনি ভাবকে কাব্যের আত্মা এবং ভাষাকে কাব্যের দেহ হিসেবে মেনে নেন ঠিকই কিন্তু – দেহহীন আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে ওনার তেমন আগ্রহ ছিলনা। সেইকারণে ভাষার প্রতি এবং ভাষা বা কাব্য-আঙ্গিকের ধারালো ও নব্য ভঙ্গিমার বিষয়ে ওনার শ্যেন দৃষ্টি ছিল। একই সঙ্গে ব্যঙ্গ ও হাস্যরস বিষয়েও আগ্রহ ছিল – ভারতচন্দ্রের পুণঃপাঠ করার প্রবণতা দেখা যায় ওনার লেখায়। রাজনৈতিক লেখা পত্র এবং সর্বোপরি প্রবন্ধকে, সমালোচনাধর্মী আধুনিক চলিতভাষার লিখনকে নব্য যুক্তির অভ্যাসে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী অবিস্মরণীয় একটি উদাহরণ। ওনার সাহিত্যের ধারণাকে আমরা মূলত নৈতিকতা থেকে নব্য-নান্দনিকতার যাত্রার তত্ত্ব হিসেবে পাঠ করতে পারি – যা ভাষার গঠনের ও পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর, আঙ্গিকের উপর, প্রাচ্য রীতিবাদের (বামনাচার্য, দণ্ডী প্রমুখের তত্ত্ব) উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ওনার ক্ষেত্রে যুগধর্ম ও সাহিত্যের স্বাধীনতার প্রশ্ন, নান্দনিকতার প্রশ্ন এবং রীতি ও ভাষার প্রশ্নই সাহিত্যের প্রধান প্রশ্ন, প্রধান কাজ।

"অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশংকর রায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্তী, ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী – এঁরা প্রত্যেকেই মননশীল যুক্তিভিত্তিক নির্মোহ আলোচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু স্থায়ী সমালোচনাকর্ম খুব বিশেষ কিছু রেখে যান নি। তবে বাংলা সমালোচনায় মনন ও বুদ্ধির ধারাটিকে সুগম করে দিয়েছিলেন।"[১৭১]

প্রমথ চৌধুরীর মতই 'সবুজ পত্র', বাঙালির সাহিত্য চিন্তায় মননশীলতার নতুন আঘাত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, যার মধ্যে খুব অল্পকিছু উপাদানই পরবর্তী কালে টিকে গিয়েছিল।

"সমালোচনায় বিশ্ববীক্ষা ও নির্মোহ যুক্তির যে চর্চা সবুজপত্রে (১৯১৪) দেখা যায়, তার অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত – সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রে(১৯৩১)। কল্লোল (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৬) পত্র দুটিতে সমালোচনা অবহেলিত, মননশীল দৃষ্টি-চর্চা উপেক্ষিত। সবুজপত্রের সাধনা বুদ্ধি-প্রবণ মননশীলতার সাধনা, কল্লোল-কালিকলমের সাধনা আবেগপ্রবণ অতিতরল তারুণ্যের সাধনা। ত্রৈমাসিক পরিচয়ের সাধনায় সবুজপত্রের

[১৭০] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ - ২০০

[১৭১] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ - ২০৬

উত্তরাধিকার লক্ষ্য করা যায়। পরিচয়ের প্রথম পর্বের প্রধান ফসল কবিতা, প্রবন্ধ ও সমালোচনা। বাংলা সমালোচনার আধুনিক রূপ পরিচয়ে প্রথম লক্ষ্য করা গেল। সবুজপত্র ও পরিচয়-এর মূলধন ছিল reason ও rationalism। তাই সমালোচনায় আধুনিক দৃষ্টি ত্রৈমাসিক পরিচয়ে লক্ষ্য করা গেল। এখানে স্মর্তব্য যে, সবুজপত্র-গোষ্ঠীর অনেকেই ত্রৈমাসিক পরিচয়-গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছিলেন।"[১৭২]

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রায় সেই সময়ের সমস্ত উজ্জ্বল লেখকেরাই ছিলেন - সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু এছাড়াও নিয়মিত লেখক ছিলেন – চারুচন্দ্র দত্ত, অপূর্ব কুমার চন্দ, হুমায়ূন কবির, প্রশান্ত মহলানবিশ, যামিনী রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখেরা। অরুণকুমার তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন এবং একথা সর্বজনবিদিত – পরিচয় পত্রিকার হাত ধরে এলিয়ট এবং এজরা পাউন্ড প্রমুখ পাশ্চাত্যের নব্য-ক্রিটিকদের সমালোচনা পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ হতে থাকে বাংলা সাহিত্যে এবং স্বাভাবিক ভাবেই পরবর্তীকালে আবার এঁদের লেখা-পত্রের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সমালোচনার তুল্য-মূল্য আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

'পরিচয়' পত্রিকা তথা ১৯৩০ –র আমল থেকে ধীরে ধীরে বাংলায় মার্ক্সবাদী চিন্তা প্রসার লাভ করতে থাকে। মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনার প্রধান তর্কগুলি নিয়ে অধ্যায়ের প্রথমেই আমরা আলোচনা করেছি এবং কিভাবে মানিকের সূত্রে মার্ক্সবাদী প্রতর্কের কয়েকটি দিক আমাদের মূল আলোচনার সঙ্গে সাযুজ্য-পূর্ণ সেই নিয়েও আলোচনা করেছি। মূলত সাহিত্যের মূল্যের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যচিন্তা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষিতের সাপেক্ষে মার্ক্সবাদ তথা মানিকের তর্ক আমাদের আলোচনার বন্ধু-স্থানীয় বিতর্ক। মার্ক্সবাদের অনুষঙ্গে মূল্য বিষয়ক আরেকটি তর্ক পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য মুলতুবি আছে, পূর্বে সেকথা জানিয়েছি।

বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গি তার যথার্থ বাস্তবতা লাভ করে। ১৯৫১ খ্রীঃ –এর রচনা অরবিন্দ পোদ্দারের 'বঙ্কিম-মানস' এবং ১৯৫৮ খ্রীঃ শীতাংশু মৈত্রের লেখা 'যুগন্ধর মধুসূদন' গ্রন্থ। এই সময়েই লেখা জগদীশ গুপ্তের কবি-মানসী এবং নন্দগোপাল সেনগুপ্তের লেখা আলোচনা প্রসঙ্গে, অরুণকুমার তাঁর গ্রন্থে লিখছেন,

"কেউ রবীন্দ্রনাথকে বোদলেয়র বা র‍্যাঁবো-র সঙ্গে তুলনা করছেন, কেউ-বা রিলকে-র সঙ্গে তুলনা করছেন এবং তাঁদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথকে নিচু বলে প্রমাণ করতে চাইছেন (দ্রঃ – বুদ্ধদেব বসু, 'সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা, রবীন্দ্রনাথ' ও শিবনারায়ণ রায়ের 'সাহিত্য-চিন্তা'।) আবার কেউ-বা রবীন্দ্রনাথকে তাঁর মননচিন্তায় ও বিশ্বমানবতার পটভূমিকায় দেখতে চেয়েছেন (দ্রঃ-অন্নদাশংকর রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ')[১৭৩]।"

এই সূত্রে আমাদের মনে পড়তে পারে, 'ছিন্ন-পত্রাবলী' বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু প্রশংসায় উচ্চকিত ছিলেন এবং বাংলার একমাত্র স্মৃতি বা একটুকরো বাংলাকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশ যাওয়ার জন্য – 'ছিন্ন-পত্রাবলী'-কে তিনি সঙ্গে

[১৭২] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ - ২২২

[১৭৩] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ - ২২৭

নিয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নিজেও এবং রবীন্দ্র-পাঠকেরা তাঁর সমসময়ে এবং পরবর্তীকালে তো অবশ্যই – তাঁকে ক্রমাগত নানাভাবে পাঠ করেছেন এবং পাঠ করে চলেছেন এখনও। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সেই অসীম সম্ভাবনাময়তাকে মাথায় রেখেই আমরা আমাদের গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিকে স্থির করে চলেছি। এটা মেনে নিয়েই যে – নানাবিধ সম্ভাবনার পাশাপাশি ঐতিহাসিক ও স্বভাবগত ভাবে রবীন্দ্রনাথ তথা আমাদের আলোচ্য অন্যান্য সাহিত্য-চিন্তকদের প্রধান কতগুলি চিন্তন-মার্গ বা বৈশিষ্ট্য ছিল।

অরুণকুমারের গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল উনি আলোচনার মধ্যে মধ্যে বারংবার সমালোচনার ইতিহাসকে গুটিয়ে নেওয়া এবং তাকে কোন না কোন একটা দার্শনিক প্রেক্ষিত দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন। যে ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে উনি কাজ করছেন, তার ব্যাপ্তির কোন কূল-কিনারা নেই অথচ উনি একজন প্রকৃত গবেষকের মত বারং বার সেই উপাদানগুলিকে একত্রে একটি কাঠামোয় বাধার চেষ্টা করছেন। সেই কারণেই আমাদের আলোচনায় ওনার গ্রন্থের এতখানি প্রয়োজনীয়তা।

১৮৫১ খ্রীঃ থেকে **১৯৬৫** খ্রিষ্টাব্দের এই একশ পনের বছরের সমালোচনার ইতিহাসকে অরুণকুমার কতগুলি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে বা প্রবণতায় বিভক্ত করেছেন – কিন্তু সেই বিভাজন ভীষণই আলগা প্রকৃতির, যা কেবলমাত্র আবছা ধারণা নির্মিতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু গভীর আলোচনায় তেমন কোন অবদান আছে বলে আমার মনে হয়না। সেহেতু কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপাদান কেবল পাদটীকায় উল্লেখিত রইল[১৭৪]।

---

[১৭৪] যেখানে উনি হার্বার্ট স্পেন্সারের অষ্টাদশ শতকীয় পাশ্চাত্যনীতির অনুসরণে 'Inscrutable Power of Nature'[174] বা জীবনবাদের প্রকাশ দেখেছেন বঙ্কিমের সাহিত্যচিন্তায় – বিশেষত 'উত্তরচরিৎ', 'ধর্মতত্ত্ব' প্রমুখ সমালোচনায়। এরপর অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পূর্ণচন্দ্র বসু, চন্দ্রনাথ বসু, বীরেশ্বর পাঁড়ে – প্রমুখেরা সৌন্দোর্যবাদের চেয়ে নীতিবাদকেই বড় করে দেখান – সুতরাং এই সময়ের সমালোচনাকে অরুণকুমার ভাবতে চাইবেন নীতিবাদী সমালোচনা হিসেবে। যে ধারা বঙ্কিম থেকেই শুরু হয়ে, ক্রমে সৌন্দোর্য্য ছাপিয়ে নীতির দিকে সরে যাচ্ছে। এর পরের ধাপে আসছে সৌন্দোর্য্যবাদ, অরুণকুমার লিখছেন –

"ছিন্নপত্র, পঞ্চভুত, সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই সৌন্দর্যবাদকে ব্যখ্যা করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

প্রিয়নাথ সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ রবীন্দ্র-শিষ্যেরা সৌন্দর্যবাদী সমালোচকরূপে নিজেদের উপস্থিত করেছেন। নীহাররঞ্জন রায়, প্রমথনাথ বিশী, মূলত : এই পথেরই পথী।"

'ছিন্নপত্রাবলী' আলোচনার সূত্রে, নান্দনিক তত্ত্বের আলোচনার আবশ্যিকতার কথা আমরা আগেই লিখেছি, এখানে তা আবারও প্রমাণিত হয়। এর পরবর্তীকালের সমালোচনাকে অরুণকুমার দেখেছেন 'প্রত্যক্ষবাদ' হিসেবে। উনি লিখছেন –

'দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রকাব্যে দৈবীপ্রেরণাকে (জীবনদেবতাবাদ) অস্বীকার করেছিলেন। 'বৃহৎ আইডিয়া' নামে 'অস্পষ্টতাকে' তিনি সমর্থন করেননি, সোনার তরী নাম কবিতাকে 'দুর্বোধ্য, অর্থশূণ্য ও স্ববিরোধী' বলে অভিহিত করলেন এবং বললেন "অস্পষ্টতা কাব্যের দোষ, গুণ নহে"। ("কাব্যের অভিব্যক্তি")

বাংলা সমালোচনায় প্রত্যক্ষবাদের প্রসঙ্গ পূর্বে উঠেছে, হেম-নবীনের কাব্যের সমালোচনায় তা আলোচিত হয়েছে, তবু দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে জোরের সঙ্গে প্রচার করলেন, এ-কথা স্বীকার্য। এক হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্কিম-যুগের সাহিত্যচিন্তার উত্তরাধীকারী। কাব্যে বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের যে সমাদর উনিশ শতকে ছিল, রবীন্দ্র-আবির্ভাবের ফলে তার প্রভাব নিরাকৃত হয়ে এল। এমন সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বস্তুবাদ, যুক্তিবাদ তথা প্রত্যক্ষবাদকে পুনরায় বড় করে তুলে ধরলেন।'

এর পরবর্তীকালের সমালোচনা, অরুণকুমার যার নাম দেবেন 'এতৎকালের সমালোচনা' – তার কালপর্ব হল, ১৯৬৬-২০০০ খ্রীঃ পর্যন্ত। এই অংশের মোটের উপর একটা বর্ণনা করে আমরা বিশেষ কয়েকজন সমালোচকের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। যাতে করে একাধারে বৃহৎ ইতিহাসের একটা ধারণা এবং অন্যদিকে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিন্তকের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মত কতগুলি ধারণা – এই দুয়ের নিরিখেই আমাদের গবেষণার প্রশ্নটিকে গভীরভাবে চিনে নেওয়া যায়।

খেয়াল থাকা প্রয়োজন, যে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা এই তর্কগুলি নিয়ে আলোচনা করছি সেই সময়ে রাজনৈতিক ভাবে কতগুলি সন্দর্ভ আলাদা করে জরুরি যেমন - নারীবাদ, জাতপাতের রাজনীতি, জাতিচিন্তা, পরিবেশবাদী-দর্শন, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অবশ্যই এই শতকের বিজ্ঞাণচিন্তার সাপেক্ষে সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনার বিশ্লেষণ। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে এই সকল সন্দর্ভই প্রাথমিক ভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয়ত এগুলিকে এক-অন্যের সঙ্গে ক্রমশ নানাবিধ সম্বন্ধে জড়িয়ে পড়তে থাকা একটি 'ইন্টারডিসিপ্লিনারী' ক্ষেত্র হিসেবেও খুঁজে পাওয়া যায়। কয়েকবছর পূর্বে বিদেশে যা সম্ভবপর ছিল, বাংলা বিদ্যাচর্চা মহলে আজ আর তেমন 'ইন্টারডিসিপ্লিনারি' চর্চার কোন অভাব নেই। তেমন পত্র-পত্রিকার কথা একের পর এক উল্লেখ করা যায় অবলীলায়।

মার্ক্সবাদী সমালোচনার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা অধ্যায়ের শুরুতে যেমন আলোচনা করেছিলাম তেমনি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন – মার্ক্সবাদী সমালোচনার ইতিহাস নিয়ে বাংলা ভাষায় বেশকিছু গ্রন্থ লিখিত হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, 'মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' নামক গ্রন্থটি অন্যতম। মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক নামক তিনটি খণ্ডের সম্পাদনা করেছিলেন ধনঞ্জয় দাশ, ১৯৭৫ খ্রীঃ থেকে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। এই

এরপর অরুণকুমার দেখাচ্ছেন, প্রমথ চৌধুরীর হাত ধরে আবার সৌন্দোর্য্য বা নন্দনতত্ত্বের একধরণের ফেরা আছে এবং সৌন্দোর্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, তীক্ষ্ণ মনন ও বিশ্লেষণ। উনি লিখছেন –

"প্রমথ চৌধুরীর মতবাদ সবুজপত্র-গোষ্ঠীর লেখায় লক্ষ্য করা গেল। সৌন্দোর্যবাদের সঙ্গে যুক্ত হল তীক্ষ্ণ মনন ও বিশ্লেষণ। সাহিত্যবিচারে প্রমথ চৌধুরী বিশ্লেষণপন্থী ও মনননির্ভর হলেও রসই তাঁর উপজীব্য। তিনি সাহিত্যকে অপ্রয়োজনের আনন্দ বলে মনে করেন, শিল্পীমনের 'খেলা' বলে স্বীকার করেন। সাহিত্যে তিনি ইস্থেটিক আনন্দ খোঁজেন। তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধটি এই দৃষ্টিভঙ্গীর সার্থক পরিচয় স্থল। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে তিনি নীতি খোঁজেননা কেবল আনান্দ অমরাবতীর সৌন্দোর্য উপভোগ করেন। তাঁর মতকে বলা যায় কলাকৈবল্যবাদ।"[174]

প্রমথ চৌধুরির মতে বঙ্কিমী নীতিবাদ আসলে ভিক্টোরিও মর‍্যালিটির প্রকাশ এবং সমাজের দাসত্ব করা সাহিত্যের কাজ নয়, ফলত এই দুটিই খন্ডিত হয়ে ওনার মতে কলার প্রতি বিশুদ্ধ নান্দনিক চাহিদার প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যচিন্তা হিসেবে, বস্তুবাদকে চিহ্নিত করতে পারি আমরা। যাকে অরুণকুমার বলবেল - মার্ক্সবাদী, দ্বন্দমূলক বস্তুবাদী চিন্তন। এবং পরিশেষে 'পরিচয়' পত্রিকাকে ঘিরে গড়ে ওঠা – এলিয়ট, পাউন্ডের প্রমুখের দ্বারা প্রভাবিত – সমালোচনার ধারা, যা বৈজ্ঞানিক তথা মণঃসমীক্ষণবাদী তথা কাব্য-প্রকরণের প্রতি প্রধাণত আলোকপাতকারী এক ধরণের সমালোচনা। যদিও এই পরিমন্ডল – আসলে রাবিন্দ্রীক ঋণে[১৭৪] জর্জরিত ছিল, সে কথা আগেই লিখেছি।

- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাবলিশিং, ২০১৯

ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই প্রকাশিত হয়েছিল, 'বস্তুবাদী সাহিত্য বিচার ও অন্যমত'। পরবর্তীকালে এই তিনটি খন্ড একত্রে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম দুটি খণ্ডের ভূমিকাংশে ধনঞ্জয় দাশ যে ভূমিকাংশ লিখেছেন – তা সত্যই পূর্ণাঙ্গ গবেষণার কম কিছু নয়। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য এই গ্রন্থ বিষয়ে লিখতে গিয়ে এই বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন এবং আরও বলেছেন বহুদিন যাবত অ্যাকাডেমি চর্চায় এই গ্রন্থের গুরুত্ব অস্বীকার করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে এই গ্রন্থ তার সঠিক মর্যাদা খুঁজে পায়। আমাদের গবেষণায় এই গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রধানত এই গ্রন্থ থেকেই আমরা মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে উদ্ধার করতে পেরেছি এবং এও বুঝতে পেরেছি, মার্ক্সবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়টি গড়েই উঠেছে, মূলত বিতর্কের উপর – বিতর্কই এই তত্ত্বের সার।

রসতত্ত্বের ঐতিহ্যে, প্রস্থানগুলির নিজেদের মধ্যেকার তর্ক-বিতর্ক বিষয়ে আমরা গত অধ্যায়ে আলোচনা করছিলাম, অলংকার প্রস্থানের সঙ্গে, ধ্বনি প্রস্থান, ধ্বনি প্রস্থানের সঙ্গে রস-প্রস্থান, রীতি প্রস্থান কিংবা উৎপত্তিবাদের সঙ্গে অনুমিতিবাদ, অনুমিতিবাদের সঙ্গে ভুক্তিবাদ অথবা অভিব্যক্তিবাদের তর্ক-বিতর্ক সমস্তটাই ভরত কথিত কয়েকটি - সূত্রকে কেন্দ্র করে। যার ক্রমাগত বিচার ও বিশ্লেষণই সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের জ্ঞাণচর্চাগত দার্শনিক দিকটিকে নির্মাণ করেছে। কাব্যতত্ত্বের প্রস্থানগুলির পারস্পরিক মতান্তরের গভীরে আসলে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতামতের বিভিন্নতাই সক্রিয়। সে বিষয়ে পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে - কাব্যতত্ত্বের প্রস্থানগুলির মুখ্য প্রবক্তাদের মধ্যে কেউ ছিলেন সাংখ্য দর্শনের অনুসারী, কেউ ছিলেন শৈব ধর্মাবলম্বী অদ্বৈত দর্শনের অনুসারী ইত্যাদি। মার্ক্সবাদী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও, পাশ্চাত্যে এবং বঙ্গদেশে উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন মতামতের অবকাশ লক্ষ্য করা যায়, প্রগতিবাদী সাহিত্য কেমন হওয়া উচিৎ, সমকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় কোণ ধরণের সমস্যা – সেই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। মানিকের সঙ্গে চিন্মোহন সেহানবিশের মতের অমিল, রবীন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে মানিকের মতের অমিল। তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে অর্থাৎ বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে গোঁড়া মার্ক্সবাদীদের মতান্তরের ক্ষেত্রেও তথাকথিত আধ্যাত্মবাদ বা কাব্য ও নন্দন-তাত্ত্বিক বিষয়ের নানাবিধ মতাদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তর্ক-বিতর্ক, প্রকারান্তরে যেন সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের মতনই বিভিন্নতা-পূর্ণ একটি পরিসরের নির্মাণ করে কতকটা অসচেতন ভাবেই। এভাবে বিচার করতে গিয়ে মনে হয় - প্রকৃষ্ট জ্ঞানচর্চার বৈশিষ্ট্য এরকমই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন একটা পরিসর যেখানে নানাবিধ মত ও মতান্তরের পারস্পরিক লেনদেন ও তর্ক-বিতর্কের অবকাশ থাকা সম্ভবপর হয়। এর অর্থ কখনই এমনটা নয় যে - এই মতগুলির সমস্তটাই সঠিক বা বেঠিক। তুল্য-মূল্য বিচারে হয়ত বেশ-কয়েকটি মতামত যথেষ্ট সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট ও বাতিলও হতে পারে এবং কয়েকটি মত অপর কয়েকটি মতের তুলনায় দুর্বলও হতে পারে প্রকৃত অর্থে – তথাপি কোন একটি বা দুটি মতের নির্ণায়ক হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানচর্চা উন্নততর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা খাটো হয়ে আসে বলেই আমার ধারণা।

মার্ক্সবাদী তর্কের প্রবণতাগুলিকে অধ্যায়ের প্রারম্ভেই উল্লেখ করার পর, আমরা এই অধ্যায়ের তর্কে প্রবেশ করেছি। এর পরবর্তী অংশে আমরা দেখবো কিভাবে এই তর্কই বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের বাংলা সাহিত্যের ধারণাকেও ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ করে গেছে।

অরুণকুমারের মতেও ১৯৬০ থেকে ২০০০ সালের বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ধারায় প্রধানত প্রগতিবাদী মার্ক্সবাদ ও তার বিরোধিতার তর্কের মধ্যে দিয়েই সাহিত্যের ধারণা সংগঠিত ও আলোচিত হয়ে এসেছে। সুতরাং সেই দিক থেকে দেখতে গেলেও ঐতিহাসিকভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে তর্কটির মধ্যে থেকে আমরা আমাদের আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম – অন্তত উনিশ-বিশশতকের তথাকথিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, সাহিত্যের যে ধারণা – আমাদের তর্কটি সেই ধারণার একেবারে কেন্দ্রের একটি তর্ক। বলাচলে, এই তর্কটিকে অগ্রাহ্য করে, বাংলা সাহিত্যের কোন প্রয়োজনীয় তর্কই দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা। অথচ 'লিখন' বিষয়ক কোন একটি আপাদমস্তক আলোচনা থেকে বাংলা সমালোচনা প্রায় নির্বাসিতই বলা চলে। আমাদের এই গবেষণা কেবল একটি প্রয়াস মাত্র কারণ আমরা আলোচনার বিপুল সম্ভার দেখেই বুঝতে পারছি – এই তর্কটিকে বাংলা সাহিত্যের কত অঞ্চলে, কত রকম ভাবে আলোচনা করা যায় – তা কল্পনার অতীত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উত্তরকাঠামোবাদী তর্ক ও তত্ত্ব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ কিংবা বিদেশের বহু সাহিত্য-চিন্তক বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে ইংরেজি এবং বাংলা দুটি ভাষাতেই আলোচনা করেছেন। যাদের মধ্যে বেশিরভাগের তর্কই আমাদের আলোচনার মধ্যেও এসে পড়েছে এবং পড়বে কিন্তু আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে সেসব আলোচনার অভিমুখ - স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা সাহিত্যের কোন বিশেষ প্রবণতা বা রাজনৈতিক অভিঘাত বিষয়ক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'সাহিত্যে'র ধারণার বিষয়টিকে কিভাবে আমরা লিখনতত্ত্বের উত্তরকাঠামোবাদী তর্কের সাপেক্ষে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে ওঠা বস্তু কিংবা বিষয়ীর মূল তর্কগুলির সাপেক্ষে পাঠ করতে পারি – সেরকম আলোচনার পরিসর এবং প্রয়োজনীয়তা খুব একটা দেখা যায়নি। কিন্তু সমালোচনার ইতিহাস আলোচনার সূত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি – বাংলা সাহিত্য আসলে লিখনের দর্শন ভিন্ন পাঠ করাই একপ্রকার অনৈতিহাসিক পাঠের সামিল। উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তা আমাদের বিশ্বের চিন্তনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পথকে যথার্থ মর্মে প্রশস্থ করেছে – তাই ফরাসী লিখণতত্ব আমাদের আলোচনার প্রধান আকর হয়ে উঠেছে। লিখনের প্রশ্নগুলিকে অন্য কোন লিখনতত্ত্বের নিরিখেও চাইলে কেউ পাঠ করতে পারেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আলোচনা অন্তত এই যুগে দাঁড়িয়ে আর কোন মর্মেই লিখনের প্রধান তর্ক থেকে বিচ্যুত থাকতে পারেনা বলেই বোধ হয় কারণ লিখনের তর্কই, সাহিত্য নামক আশ্চর্য প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক তর্ক। অরুণকুমার বর্ণিত, এতৎকালের সমালোচনার প্রধান আলোচ্য সমালোচক ও তাদের কাজ বিষয়ে দুয়েকটি তথ্য নিম্নে উল্লেখিত হল -

শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'রক্তকরবী'-র আলোচনায় স্ট্রিন্ডবের্গের 'A Dream Play' –র উল্লেখ করছেন। স্ট্রিন্ডবের্গের 'ড্রিম প্লে'-র নন্দিনীর সঙ্গে রাজার সংলাপ পাশাপাশি রেখে শঙ্খ ঘোষ লিখছেন – 'খুবই সদৃশ কিন্তু প্রভেদ এই যে স্বপ্ননাটককে এদের পারস্পরিক সংলাপ ঐ একবারই উদ্বেল হয়ে ওঠে প্রতিমা-বিন্যাসে, রক্তকরবীতে এ-উদাহরণ অনেকের একটি মাত্র।'[১৭৫] এই উদাহরণ তুলনামূলকতা সাহিত্য সমালোচনার সবিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠছে

[১৭৫] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস,* দেজ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ - ২৫৫

অরুণকুমারের মতে। এরই হাত ধরে বিশ্বসাহিত্যের প্রসঙ্গ প্রবেশ করছে সমালোচনার ইতিহাসে – বিশ্বসাহিত্যের তর্কে বুদ্ধদেব বসু এবং এমনকি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যগুলি বাঙালি পাঠকের কাছে আজ আর অবিদিত নয়। ১৯০৭ খ্রীঃ রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বসাহিত্য' নামক প্রবন্ধ লেখেন - "সাহিত্যকে গ্রাম্য-ভাবে দেখলে চলবে না, 'সেই গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশ চেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।' "[১৭৬] ২০২১ সালে রোসিঙ্কা চৌধুরী তাঁর বিশ্বসাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় – বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসাহিত্যের ধারণা এবং অধুনা বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত তাত্ত্বিক ফেং শিয়া-র বিশ্বসাহিত্যের ধারণার তুল্যমূল্য আলোচনার মাধ্যমে – বিশ্বসাহিত্যকে পুনর্বিচারের কথা ভেবেছেন। যদিও এটি অন্য প্রসঙ্গ কিন্তু এই তুলনামূলকতা এবং বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে দিয়ে মানবতাবাদ ইউরোপ এবং অ-ইউরোপ তর্কের ঘেরাটোপকে অতিক্রম করে, নতুন সম্ভাবনার দিকে নিজেকে মেলে ধরে। হতে পারে সেসব তর্ক মানবতাবাদ থেকে বহু দূরবর্তী তথাপি সেই তর্কের মধ্যে দিয়েই বিশ্বসাহিত্যের বীক্ষা, বাংলা সমালোচনাচর্চায় ক্রমে জায়গা করে নিতে পারে ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী'- নাটকটির মধ্যে এমন গুণাবলী ছিল যা দেশ-কালের সীমানা অতিক্রম করে যে কোন পাঠককে মুগ্ধ করে তোলার ক্ষমতা রাখে। শঙ্খ ঘোষের সূত্রে এই প্রসঙ্গে আমরা বিশ্ব-সাহিত্যের প্রেক্ষিত বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে এলাম – এই অর্থেও একভাবে যেন লেখার কাজের মধ্যে সম্বন্ধের সাহিত্যিক মূল্যকে চিনতে পারছি আমরা। সম্বন্ধের মূল্য। বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া, বিশ্বজনীন হয়ে উঠতে চাওয়ার মধ্যে যে সম্বন্ধের আকাঙ্ক্ষা – এটাই যেন লেখার কাজের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা।

যেহেতু আবার সম্বন্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি আমরা, সুতরাং খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে, সুধীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে একটি তর্ক আপাতত উল্লেখ করা উচিৎ -

"কি কবিতা, কি উপন্যাস – সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের বিশেষ মূল্য দিয়েছিলেন। সদ্য-উদ্ধৃত উক্তিগুলি প্রমাণ করে সুধীন্দ্রনাথ আরো বেশি সচেতন ছিলেন অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন সম্পর্কে। 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর কাব্যগত অভিজ্ঞতা এক নয়, প্রথম যেখানেই সারা, সেখানেই দ্বিতীয়ের শুরু' : সুধীন্দ্রনাথের এই উক্তি প্রমাণ করে নিছক অভিজ্ঞতাই শেষ নয় লেখকের পক্ষে। অভিজ্ঞতা যখন অভিজ্ঞায় রূপান্তরিত হয়, তখনি কাব্যরচনা সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।"[১৭৭]

সাহিত্য রচনার নিষ্ঠা এবং লেখকের নিজেকে প্রস্তুত করার বিষয়ে মানিক লেখকের কথায় অনেকখানি লিখেছিলেন, সে বিষয়ে আমরা আগেই লিখেছি, পরেও খানিকটা ফিরিয়ে আনতে পারি সেই আলোচনা। এরসঙ্গেই আরেকটি

[১৭৬] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ - ২৫৯

[১৭৭] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ - ২৭৪

প্রশ্ন জরুরি হয়ে ওঠে, লেখকের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ভিন্ন কাব্যের অভিজ্ঞতা বলতে আমরা কি বুঝব? সেই অভিজ্ঞতা কি কেবলমাত্র প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা করে লেখা কিংবা সঠিক শব্দ ব্যবহার করতে পারার কৌশলে সিদ্ধ হস্ত হওয়া ? এবিষয়ে আমার একটি ভিন্ন মত আছে – মানিক যখন লিখবেন - জীবনকে দেখার শ্রম দেন লেখক তখন সেই দেখা, সেই দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতা কিন্তু কাব্যের কৌশল হস্তগত করার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাহলে এই দ্বিতীয় যে অভিজ্ঞতার কথা সুধীন দত্ত বলছেন, তা কি সেই অ(ন)ভিজ্ঞতা যা লিখনের শ্রম কে সর্বদাই পর্যুদস্ত করে ? এটাকে অনেকভাবেই দেখা যায়, কেউ যদি চান, এই দুটি অভিজ্ঞতাকে আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে বিচার করতে পারেন, কিন্তু লেখকের জীবন দেখা আর লেখার কৌশল বিষয়ে সিদ্ধহস্ত হওয়া কিন্তু একেবারে আলাদা আলাদা প্রক্রিয়া নয় বলেই আমার ধারণা। এ প্রসঙ্গে চিনমোহন সেহানবীশের সঙ্গে প্রগতি সাহিত্য বিষয়ক বিতর্কের কাহিনীটি উল্লেখ্য - মানিককে চিন্মোহন পার্টির কাজে একটি বিশেষ এলাকায় যেতে বলছেন, মানিক বলছেন, লেখার জন্য তাঁর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ লেখকের জীবন দেখা এবং লেখা এই দুই শ্রমের - পুরোপুরি তথ্যগত ভাবে বিভাজন করে নিলে একটু সরলীকরণ হবে বলে আমার ধারণা। এখানেই কি বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব কিংবা পজিটিভিজম সংক্রান্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিক? মনে রাখা প্রয়োজন, বঙ্কিম যে চিন্তক অর্থাৎ কোঁত কিংবা বেন্থামের প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন, তাঁদের কাছে পজিটিভিসম কিন্তু কেবলমাত্র যৌক্তিক সদর্থক চিন্তা বা তর্ক নয় – বরং অনেক বেশী বিজ্ঞাণগোত্রের জ্ঞানসাধনার অনুশীলন। সেক্ষেত্রে বঙ্কিম মোটেও কোন সংকীর্ণতাবাদী চিন্তক নন – হেলা ফেলা করার মতন কোন লজিক্যাল পজিটিভিস্টও নন। বঙ্কিম ও বাংলার পজিটিভিসম বিষয়ে – বেলা দত্তের ‘বঙ্গে ধ্রুববাদ’ গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। সুতরাং সেই ধরণের একটি বিমূর্ত অনুশীলনের ধারণা, যা মূলত অ(ন)ভিজ্ঞতার অনুশীলন – তাকে কিভাবে আমরা সাহিত্য বা শিল্পের নিরিখে, বিশেষত সৃজনশীল সাহিত্যের নিরিখে কল্পনা করতে পারি?

সুধীন দত্তের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার কাব্যিক হয়ে ওঠা বা অভিজ্ঞা হয়ে ওঠা আসলে এক অর্থে যেন রোজকার পথ চলতি অভিজ্ঞতার কাব্যে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া। ওনার ক্ষেত্রে কাব্য হয়ে ওঠা এবং সেই কাব্য হয়ে ওঠার জন্য ক্রমাগত অনুশীলনের ধারণার উপর অত্যধিক জোর ছিল। এই অনুশীলনের ধারণার সঙ্গে বঙ্কিমী ধ্রুববাদী অনুশীলনের ধারণা কি এক? এই প্রশ্নের তেমন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়না – আমাদের পাঠে সুধীনদত্তের এই কাব্যানুশীলন আসলে অ(ন)ভিজ্ঞতার শ্রমেরই চর্চা বিশেষ। এমন এক অনুশীলন যার নির্যাস সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞতার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় – ডেরেক অ্যাট্রিজ ও দেরিদার লিখনের দর্শন বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম।

আগামী অধ্যায়ে আমরা এই তর্কের বাকী তাৎপর্যটুকু নিয়ে আলোচনা করব আবার। এ র পরেই যে তর্কটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল ব্যোদল্যাররের সাহিত্যকে ঘিরে গড়ে ওঠা তর্ক। বোদলেয়ারের ‘ফ্ল্যর দু মাল’ (ক্লেদজ কুসুম) প্রকাশিত হয় **১৮৫৭** খ্রীষ্টাব্দে আর বুদ্ধদেব বসুর ভূমিকা সহ ‘বোদলেয়ার ও তাঁর কবিতা’ প্রথম প্রকাশিত হয় **১৯৬১** খ্রীঃ। এই নিবন্ধে বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারের অমানবিক উন্মাদনা, নির্বেদ, বিবমিষা – সমস্তটুকুকেই ধাপে

ধাপে আলোচনা করে দেখিয়েছেন – বাংলা সাহিত্য জগতে বোদলেয়ারেকে কেবল রবীন্দ্রনাথের উল্টো-পীঠ বললেই যথাযথ বলা হয়। কাজেই বুদ্ধদেব বসুর এই তর্কের, পালটা কোন একটা উত্তর আসা প্রায় অবশ্যম্ভবই ছিল – ১৯৬৮ খ্রীঃ আবু সইদ আইয়ুবের, 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশিত হয়। আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের একটি বড় অংশজুড়েই বোদলেয়ার এবং এই সংক্রান্ত আলোচনা থাকবে, সুতরাং এই অংশের বাকি পর্যালোচনাটুকু আমরা ফের মুলতুবি রাখছি পরের অধ্যায়ের জন্য। কিন্তু একটি কথা অনস্বীকার্য যে অরুণকুমার তাঁর এতৎকালের সমালোচনা অংশে বাংলা সাহিত্য সমালোচনার এতৎকালের মূল আঘাতগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। এই বিতর্কে জগন্নাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখের বক্তব্য পরবর্তীকালে উঠে আসে। বুদ্ধদেব এবং আইয়ুবের এই বিতর্কটি ছাড়া বাঙালির রবীন্দ্রচর্চা কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারেনা। অরুণ কুমার, বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি উদ্ধার করে এনে লিখেছেন –

'এই ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (১৯৪১) পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজি ও ফরাসি কবিদের কাব্য ও কাব্য-ভাবনার প্রতি নবীন প্রজন্মের বাঙালি কবিরা ঝুঁকেছিলেন। এই প্রবণতার চেহারাটা সংক্ষেপে লিখেছেন বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথায় –

"রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, তাঁকে অনুকরণ করা আরও কঠিন। রবীন্দ্রানুজ যে সব কবি এই পরম সত্যটা নিয়ত অনুভব করেছেন তাঁদেরই অন্যতম জীবনানন্দ ১৩৪৮ –এ বলেছিলেন ('রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা আধুনিক কবিতা') – 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙালী কবির তেমন মন যোগাত না; অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা স্পষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভার্লেন, রঁসার ও ইয়েটস ও এলিয়ট-এর সদর্থক না নঞর্থক মনন বিচিত্রার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।' বারংবার উদ্ধার-যোগ্য এই একটি মাত্র বাক্যে রবীন্দ্রানুজ কবিদের দুটি প্রবণতা স্পষ্ট ধরা পড়ে। একটি হল, দেশীয় ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে পাশ্চাত্ত্যের বিচিত্র মেজাজের কবিদের দ্বারস্থ হওয়া – এবং 'অন্যটি' ঘোষণা করে বাঙলা কাব্যে এই নব্যতা ফিরিয়ে নিয়ে আসা যা রবীন্দ্রনাথে ছিলনা এবং সেই কাজটার শুরু রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই। উত্তরকালের গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন, মালার্মের কাব্যাদর্শে তাঁর আকর্ষণের কথা সুধীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন; বুদ্ধদেবের অনুরাগ বদল্যার-এ, বিষ্ণু দে এলিয়ট-অনুভাবিত এবং এলিয়ট-অনুবাদক। অনুরূপভাবে জীবনানন্দে ইয়েটস-এর প্রভাব সন্ধানও ব্যর্থ হবে না।" ('এক আকাশ : দুই নক্ষত্র'। ১৯৯৮। পৃঃ ১০৭) '[১৭৮]

রক্তকরবী আলোচনায় যে বিশ্বসাহিত্যের প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম, লিখনকে মুক্ত করার উৎসাহে, সে বিশ্বসাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতাই রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিকতাবাদী মহলটিকে ব্যাপক অর্থে বিদেশী সাহিত্য-মুখী করে তুলেছিল। বিশ্বের প্রতি উন্মুক্ত হওয়ার টান ছিল যেমন একদিকে অন্যদিকে সুস্পষ্ট ছিল, স্পষ্ট কয়েকটি আধুনিকতাবাদী নৈতিক অবস্থান। যে বিষয়ে আমরা পরের অধ্যায়ে গভীরে যাব যে - কেন, ঠিক কি মর্মে

[১৭৮] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ - ৩২৯

রবীন্দ্র-পরবর্তী বিশশতকের এই বাংলা সাহিত্যিক বর্গের জন্য, অরাবীন্দ্রীক তথা অন্য অর্থে বিশ্বজনীন নৈতিকতার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল! রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই নৈতিক বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্য লিখনের কোন ধরণের দর্শনের দিকে আরও বেশি মাত্রায় সরে গিয়েছিল? সর্বোপরি এই ঐতিহাসিক বিচ্ছেদকে প্রকট করে তোলার মধ্যে দিয়ে, এই নৈতিক বিচ্ছেদের কথা বারংবার তুলে আনার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের গবেষণার সাপেক্ষে কোন সূত্র খুঁজে পাচ্ছি।

অরুণকুমার তাঁর আলোচনায় আরো একজন প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচকের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, যার নাম অলোকরঞ্জন –

"১৯৬৭ সালে প্রকাশিত তাঁর বৈপ্লবিক একটি বইয়ের নাম 'সাহিত্য এবং অমঙ্গল' (La Literature et le mal)। এ বইয়েরও অন্যতম বিষয় বোদলেয়ার, যদিও এমিলি ব্রন্টে, মিশেলে, ব্লেক, সাফো, প্রুস্ত, কাফকা এবং জেন-এর সাহিত্যবীক্ষা নিয়েও এখানে অনেক তন্নিষ্ঠ পর্যালোচনা আছে। বাতাই-এর সমস্ত বিশ্লেষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভিন্নতর সেই সৌন্দোর্যচেতনার কথা আছে যার কাজই বিধিব্যবস্থার দ্বারা বলয়িত সমাজরীতিকে লঙ্ঘন করে যাওয়া। চিরায়ত নন্দন-শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত সুন্দরের জায়গায় অমঙ্গল কিংবা অসুখকে বসিয়ে বাতাই বলতে চেয়েছেন আধুনিক সাহিত্যে তাদের প্রয়োগ কিংবা প্রাসঙ্গিকতার অর্থনীতির অভাব নয়, বরং পরানীতির সন্ধান। বস্তুত, তাঁর যুক্তিতে, সেটাই তো শ্রেয়োভাবনার মাধ্যাকর্ষ।" ’[১৭৯]

আলোচনার প্রসঙ্গে ক্রমে আমরা বোদলেয়ার, আধুনিকতাবাদ থেকে অমঙ্গল ও লঙ্ঘনের তর্কে এসে পড়লাম। ডেরেক অ্যাট্রিজ তাঁর আলোচনায় বিখ্যাত দুটি ফরাসী – চির অর্বাচীন বন্ধু, চিন্তাবিদ জর্জ বাতাই এবং মরিস ব্লাশোঁ-র কথা উল্লেখ করেছেন নানা প্রসঙ্গে – দেরিদার সাহিত্য চিন্তার মূল অভিঘাতগুলির অনেকটা জুড়েই এই দুই চিন্তাবিদের আনাগোনা এবং দেরিদা সমকালীন বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক জিল দল্যুজ ও তাঁর বন্ধু ফেলিক্স গোয়েতারির পরবর্তীকালের চিন্তাভাবনার বেশীরভাগটা জুড়েই রয়েছে লঙ্ঘনের দর্শন, যাকে ইংরেজিতে বলা চলে – 'Transgression'. বোদলেয়ার ও বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে এই মঙ্গল, লঙ্ঘন এবং অমঙ্গলের বিতর্ক গভীরভাবে দানা বেঁধেছিল – বিশেষত যখন বুদ্ধদেব বসু, আইয়ুব, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জনেরা সমালোচনা সাহিত্যকে পথ দেখাচ্ছেন – ঠিক তখনি। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আবার দেরিদা ও মূল্যের আলোচনা বোদলেয়ার এবং উল্লেখিত প্রসঙ্গগুলিতে ফিরে যাব, বাতাই-য়ের লঙ্ঘনকেও আমরা আমাদের আলোচনার অঙ্গ করে নেব – এখানে বিশেষত লক্ষণীয়, অমঙ্গলের ধারণার সঙ্গে নান্দনিকের ধারণার পারস্পরিক মৈত্রীর বন্ধন আধুনিকতাবাদীদের চিন্তায় প্রকট – এমনকি যে বি-নির্মাণবাদী লিখনের দর্শন প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করছি, যা আমাদের গবেষণার মৌলিক অঙ্গ – সেই দর্শনের নৈতিকতাই আসলে তথাকথিত অমঙ্গল-বাচক সৌন্দর্য, পাপ, বিবমিষার – দোসর বিশেষ। কিন্তু

[১৭৯] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ – ৩৪৮

এই অমঙ্গলের নৈতিকতা কিভাবে লেখার কাজ ও অ(ন)ভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত সে বিষয়ে আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

এছাড়াও অরুণকুমার আরও অগণিত সমালোচকদের নিয়ে আলোচনা করেছেন – অশ্রুকুমার শিকদার, রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ, দেবতোষ বসু, অমলেন্দু বসু – পরবর্তীকালের সমালোচক দেবেশ রায়, যার 'নতুন উপন্যাসের খোঁজে' খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। পাশাপাশি মালিনী ভট্টাচার্যের সতিনাথ ভাদুরীর উপন্যাস নিয়ে আলোচনার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ – 'বাংলা উপন্যাসে ওরা', 'প্রসঙ্গ জীবনানন্দ' প্রমুখ। রণজিৎ গুহ-র রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক আলোচনা – 'কবির নাম ও সর্বনাম', 'ছয় ঋতুর গান' প্রমুখ গ্রন্থ এছাড়াও মহাশ্বেতা দেবী (মূলত নারী এবং আদিবাসী প্রশ্নে), নবনীতা দেবসেন (বিখ্যাত গ্রন্থ - 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য'), প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য (বিখ্যাত গ্রন্থ 'টীকাটিপ্পনী'এবং 'তারাশঙ্কর : জীবন ও আখ্যান'), রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশেষত কমলকুমার মজুমদার ও ঐতিহ্য বিষয়ক সমালোচনা) প্রমুখের লেখা। এছাড়াও জীবনানন্দ বিষয়ক লেখক - ভুমেন্দ্র গুহ-র অবদানও অনস্বীকার্য।[১৮০]

তাহলে, এতৎকালের সমালোচনার যে ধারা, সেখানে প্রধান যে তর্কটির কথা আমরা উল্লেখ করছিলাম, তা প্রকারান্তরে মার্ক্সবাদী অর্থনৈতিকভাবে নির্ণয়-বাদী সাহিত্য চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। এ বিষয়ে রেমন্ড উইলিয়ামসের বেস ও সুপারস্ট্রাকচারের আলোচনা[১৮১], আলথুসারের অর্থনৈতিক লঘু করণের বিরুদ্ধে সমালোচনা[১৮২] – এসবের বিষয় সমালোচকদের অবিদিত নয়। অতএব এই তর্কের নানাবিধ প্রকাশের বিচ্ছুরণে সমৃদ্ধ এবং পর্যুদস্ত বিশ-শতকের দ্বিতীয় ভাগের বাংলা সমালোচনা সাহিত্য। সুদীপ বসু এই কালপর্বের কয়েকজনকে নিয়ে, কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, সেই আলোচনার পুনর্লিখনের কোন প্রয়োজন নেই [১৮৩]। কিন্তু এও মনে রাখা

---

[১৮০] পাশাপাশি, বাংলা দেশে গ্রন্থ উৎপাদন এবং সমালোচনা সাহিত্য লিখণের জোয়ার আরও বেশি প্রবল, সুতরাং সেই আলোচনা আরও দীর্ঘ্য হতে পারে – পরের অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একটি মাত্র গ্রন্থ নিয়ে খানিকটা আলোচনা করব। আপাতত এখানে উল্লেখ্য যে,জাক দেরিদা ও তাঁর দর্শণ বিষয়ে এবং বাংলা ভাষায় অবভাসবিদ্যার গভীর দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ফরহাদ মজাহারের চিন্তা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ।জাক দেরিদার বিনির্মাণবাদী দর্শণের ধারায় অন্যতম চিন্তক গায়ত্রী স্পিভাকের তর্কে বাংলা দেশ প্রসঙ্গে বার বার ফিরে এসেছে মজাহারের প্রসঙ্গ এবং স্পিভাকের নিজস্ব লেখা এখনো পর্যন্ত্য বাংলা সাহিত্য পাঠক্রমের কিছুটা বাইরে থেকে গেলেও ওনার চিন্তা, ওনার দর্শন বাংলা সমালোচকদের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছে বহুদিন হল। প্রসঙ্গত উলেখ্য ওনার মূল্য সংক্রান্ত্র গুরুত্বপূর্ণ একটি তর্ক নিয়েও আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করব। এছাড়াও বাংলা দেশের সমালোচকদের মধ্যে, আব্দুল ওদূত ও আহমেদ ছফা'র মতো ব্যক্তিত্বরা উল্লেখযোগ্য।

[১৮১] Williams Raymond, *Marxism and Literature*, Oxford University Press, 1977, P-75-82

[১৮২] Althusser Louis, *On The Reproduction of Capitalism*, Verso, London, 2014, P- Appendix 2

[১৮৩] যেমন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুসারে, ওনার সাহিত্য সাধারণ মানুষের একে অন্যের প্রতি অনুভুত অনুভূতির প্রকাশ ও চাঞ্চল্য বিষয়ক।

প্রয়োজন বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে স্বাধীনতা পরবর্তী বিশেষত ৭০, ৮০ ও ৯০-এর দশকের চিন্তকেরা এখনও যথাযথ ভাবে ইতিহাসের পাতায় উল্লেখিত হননি। তাদের চিন্তার দ্বারা আমাদের গবেষনা পরোক্ষভাবে যথেষ্ট প্রভাবিত। আমরা গবেষক হিসেবে উক্ত দশকের চিন্তকদের সন্তান ভিন্ন আর কিছুই নই। কিন্তু উক্ত দশকের চিন্তকদের একত্রে এনে পাশাপাশি আলোচনা করার কাজ আরও দীর্ঘ ও সময় সাপেক্ষ। আপাতত আমরা সেই আলোচনায় প্রবেশ করছিনা। (কিন্তু আগেও উল্লেখ করেছি বিনির্মানবাদী চিন্তা ও চর্চার যে ধারা বাংলায় – সেই ধারার মধ্যেই আমরা আমাদের গবেষণাকে গণ্য করতে চাই)।

যদিও বিশশতকের আলোচনা একজন সমালোচক ব্যক্তিত্বের আলোচনা ভিন্ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তিনি হলেন – মোহিতলাল মজুমদার [১৮৪]।

"মানুষের সুগভীর বাসনা, নর-নারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে [আধুনিক সাহিত্যিক] প্রকাশ করবে না তো করবে কে? মানুষকে মানুষ চিনবে কোথা দিয়ে? সে বাঁচবে কি করে?"[183]

- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ - ২৫৯

আরেকটি উদ্ধৃতি যেমন,

"একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা নবীন সাহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধী নেই, কিন্তু সে যা সইতে পারে না, এর নাম করে ফাঁকি।"[১৮৩]

শরৎচন্দ্রের তাবৎ সমালোচনার মধ্যেই, আধুনিকতাবাদীদের প্রতি এমনকি রাবীন্দ্রিক পৃষ্ঠপোষণার প্রতি বিদ্রোহ আছে। ওনার আলোচনার মধ্যেই প্রথম এলিট বা হাই কালচারের লেখক বা লেখকদের লেখক এবং সাধারণ লেখকের মধ্যে তফাৎ-এর প্রসঙ্গ আছে এবং সমালোচনা যেভাবে লেখকদের হাত পা বেঁধে দেয়, সেই বিষয়ে তর্ক আছে –

"রাজনীতিতে, ধর্মে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে যেদিন আমাদের হাত-বাঁধা, পা-গুটানো আর থাকবেনা, যেদিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে, সেইদিন আবার সাহিত্যসৃষ্টির দিন ফিরে আসবে।"[১৮৩]

বক্তব্যগুলি, তর্কগুলি হয়ত খুবই পরিচিত – একাধারে তিনি রবীন্দ্রনাথের পূজা ও অন্যদিকে বিরোধীতা করছেন। এই দুটি কাজ একসঙ্গে হচ্ছে – কেবল এই নিরিখে যে, সমালোচকদের জ্ঞানের তান্ডবে সাধারণ লেখকের নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশের উপায় নেই। তাহলে পূর্বে আমরা যখন অনুভুতি বা affective labor বা ভালোবাসার শ্রমের প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম – তার সঙ্গে এই তর্কের কি পার্থক্য? প্রথমত এই তর্ক সমালোচনার অতিচর্চার সংকীর্ণতা ও বাজারের সঙ্গে, দৈনন্দিনের সঙ্গে সাহিত্যের রোজকার লেনদেনে অগভিরতার প্রয়োজনিয়তা বিষয়ক। কিন্তু এও আনন্দের কথাই বলছে অথচ এর মধ্যে জনপ্রিয় সাহিত্য ও অ-জনপ্রিয় সাহিত্যের তর্ক এসে জুটছে। এই তর্ক ইউরোপেও একই রকম এবং এও একভাবে, অর্থনীতি ও তার অতিরিক্ত মূল্য-বিষয়ক লড়াইয়ের ফলশ্রুতি। আপাতত এটুকু উল্লেখিত থাক, এই অংশটুকু নিয়ে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আবার ফিরে আসবো, বিশেষত এই অনুভুতির তর্ক এবং আমাদের অ(ন)ভিজ্ঞতার তর্কের তফাৎ কি? জনপ্রিয় সাহিত্য আর অ-জনপ্রিয় শিল্পের ক্ষেত্রের মধ্যেকার তফাতের সঙ্গে এই তর্কের কি সংযোগ?

- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ – ২৫৯

[১৮৪] উনি ছিলেন প্রাথমিকভাবে বঙ্কিমশিষ্য – দুই বিদেশী গুরু বেনেদেত্তো ক্রোচে এবং ম্যাথু আর্নল্ড। মোহিতলালের জীবনীকার ভবতোষ দত্ত লিখেছেন – "জীবনীকে জানতে হলে জীবনের সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্য আনন্দ-বেদনার মধ্যে ডুবে গিয়ে এক হয়ে যেতে হবে। এই নিবিড় অনুভূতিলব্ধ সমগ্রতার উপলব্ধিই কবির জীবনবোধ। মোহিতলাল ম্যাথু আর্নল্ডের উক্তিকে এই সামগ্রিক অনুভবের অর্থেই ব্যবহার করেছেন।"

- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাবলিশিং, ২০১৯, প-২০৫

আবার একইসঙ্গে উনি বলবেন,

সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ক আলোচনায় আমরা, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও কাব্যিক অভিজ্ঞতার প্রভেদ নিয়ে আলোচনা করেছি। এই দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার বিষয়ে তীব্র আগ্রহী হওয়ার ফলে, সুধীণ দত্ত মূলত কাব্য-ভাষায় দর হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সেই প্রাধান্য কখনো কখনো ব্যাধির মতন অথচ একই সঙ্গে যেন, এই তর্ক কবিত্ব বা শিল্পের অর্থময়তা বা অর্থ বহন করার ক্ষমতার বিরুদ্ধ-গামী হয়ে ওঠে, বিরুদ্ধাচরণ করে। এই যে অর্থের প্রতি একরকমের প্রতিরোধ – এই প্রতিরোধ ও সৃজনশীলতার সম্বন্ধ বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে আবার ফিরে আসবো। তৃতীয় অধ্যায়ে বিশশতকের প্রধান লেখকদের লিখন-বিষয়ক বক্তব্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও আমরা আবার উক্ত লেখকদের আলোচনা প্রসঙ্গে ফিরে আসবো।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবন ধরেই প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার সমালোচনা করে এসেছেন এবং সুধীনদত্তের মতই, কবি বা স্বভাব-কবিত্ব বিষয়ে, ব্যক্তি মানুষের কাব্য-নিষ্ঠা বিষয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল যার ফলে জীবননান্দ দাশ, বুদ্ধদেবের ‘প্রগতি’ কিংবা ‘কবিতা’ পত্রিকার হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব স্থান অধিকার করে নেয়। ভাষার, ভঙ্গিমার ও চিন্তার আধুনিকীকরণের যে জোয়ার, ইউরোপে যা আধুনিকতাবাদ হিসেবে মাথাচাড়া দিয়েছিল – বাংলায় বুদ্ধদেব বসু নানাভাবে সেই প্রকল্পের বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করেন। বিশ্বসাহিত্য ও সমগ্রতার তথা মানবতার যে তর্ক নিয়ে রোসিঙ্কা চৌধুরী তাঁর বিতর্কে আলোচনা করেছেন – সেই বিশ্বসাহিত্য বিষয়েও সুধীনদত্তের মতই বুদ্ধদেব বসু একইরকম ভাবে আগ্রহী ছিলেন। এক অর্থে এঁরা দুজনেই বাংলার আধুনিকতাবাদী প্রকল্পের বৃহৎ দুটি অঙ্গ। একই পঙক্তিতে বিষ্ণু দে’র প্রসঙ্গেও আমরা আলোচনা করতে পারি। বিষ্ণু দে-র সমালোচনা প্রসঙ্গ মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত – ১। রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, ২। সমকালীন বাঙালি সাহিত্যিক, ৩। বিদেশী সাহিত্য ও সাহিত্যিক।[১৮৫] এর মধ্যে তৃতীয় ভাগটিই প্রধান। আবারও আধুনিকতাবাদের সেই একই ঝোঁক এখানেও লক্ষণীয় – সাহিত্যিক মূল্যের আর্থসামাজিক লঘূকরণ এবং সমাজবাস্তবতাবাদের বিরুদ্ধে - মন:সমীক্ষণ, মনুষ্যত্ব, ব্যক্তিমানুষ, নাগরিকতা, মিথ, আধ্যাত্মবাদ আবার একইসঙ্গে বস্তুতন্ত্রের আঘাত - এমন নানাবিধ আধুনিকতাবাদী সাহিত্যিক মূল্যের প্রতি বিষ্ণু দে-র আগ্রহ এবং আবারও সেই একই ভাবে অর্থের প্রতি

“যিনি সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন, তিনি দেশকালকে উপেক্ষা করিয়া যত বড় কল্পনাকে আশ্রয় করুণ না কেন তাহা জীবন্ত ও প্রাণময় হইবে না।” প-২০৬

ওনার বক্তব্য,

“নিত্য-সাহিত্য কথাটি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করে দীর্ঘ্যস্থায়ী অর্থে গ্রহণ করা উচিৎ”[১৮৪] প-২০৭

ওনার আরও একটি জরুরি তর্কের প্রসঙ্গে আমরা আগেই উল্লেখ করেছিলাম – ব্যক্তিমানুষ এবং সমষ্টিমানুষের সাহিত্য উপলব্ধি। সাহিত্যে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার মধ্যে পার্থক্য। সাহিত্যিক স্টাইল বলতে উনি কবি ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। মোহিতলালের এই বিপুল সমালোচনা-চিন্তার চিন্তার আসলে মোহিতলালকে ভীষণই সমকালীণ করে তুলেছে। ওনার এত বৈচিত্র নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ আমাদের নেই, কিন্তু আগের আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি, অর্থনৈতিক মূল্য ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য মূল্যকে কিভাবে বস্তুগত ও বিশ্লেষণাত্বক ধারণার মধ্যে দিয়ে বুঝে নেওয়া যায়, সে বিষয়ে মোহিতলাল এক বিরাট সমালোচনার চিন্তার খোড়াক রেখেগেছেন তাঁর লেখালিখির মধ্যে।

[১৮৫] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দেজ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ-২৮৪

একরকমের স্বাভাবিক প্রতিরোধ, দুর্বোধ্যতার প্রতি অমোঘ টান, সুদীপ বসু লিখছেন, প্রগতি লেখক সঙ্ঘের তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য –

"এমন হতে পারে যে ব্যক্তিগতভাবে কোন বন্ধুর আমন্ত্রণে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তাঁকে যথাবিধি আমন্ত্রণ করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।"[১৮৬]

এছাড়াও সুদীপ বসু – অন্নদাশঙ্কর রায়, নলিণীকান্ত গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সমর সেন – প্রমুখের সমালোচনা বিষয়ে আলোচনা করেছেন, আপাতত তর্কের পরিধিকে আমরা আর তথ্যের অতিরিক্ততা দিয়ে বাড়িয়ে তুলতে চাইনা। মোদ্দাকথা হল - জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিকের মতোই - সুধীনদত্ত, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে এদের সকলের প্রগতি লেখক সঙ্ঘের মতামতের সঙ্গে নানান সময় যুদ্ধ বেঁধেছে।

এছাড়া বিশেষত ১৯৬০ সাল থেকে ২০০০ সালের সাহিত্যচর্চা – মার্ক্সবাদী অর্থনৈতিক নির্নয়বাদের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্যিক মূল্যগুলির তর্ক-বিতর্কে গড়ে উঠেছে বলেই আমাদের ধারণা। কারণ ঐতিহাসিক ভাবে উত্তর মহাযুদ্ধকালীন বিশ্ব, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মধ্যেকার ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠা একটি সময়। সেই পরিসরে মার্ক্সবাদী দর্শন এবং অন্যান্য মতের মধ্যে যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার বিতর্ক যে, চালিত হবে, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব আমরা যে তর্ক দিয়ে আমাদের গবেষণার সূত্রপাত করেছি – 'লেখার শ্রম' তা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একেবারে কেন্দ্রের তর্ক এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় কারণ – রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী, বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে প্রগতি তথা মার্ক্সবাদ এবং তার বিরোধিতা – সাহিত্যের অতিলৌকিকতা বনাম কলম পেষা মজুরের তর্কই যেন এক ভাবে সাহিত্যের বিতর্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে গেছে। এরই ভিত্তিতে কেউ হয়ে উঠেছেন কট্টর মার্ক্সবাদী, কেউ হয়ে উঠেছেন নরমপন্থী মার্ক্সবাদী কেউ কেউ আবার প্রগতিবাদীদের চোখে বুর্জোয়া তৃতীয় পক্ষ।

এই তর্কের মধ্যে দিয়েই যেন সমগ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে পড়ে ফেলা সম্ভব। এমনকি ক্রমে যখন আশীর দশকে, আমরা বাংলা ভাষায় লেখকের লিখন প্রক্রিয়া বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ - অমিয়ভূষণের 'লিখনে কি ঘটে' গ্রন্থটিকে প্রকাশিত হতে দেখছি। তখনো অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রধান তর্ক – সমাজবাস্তবতা, ব্যক্তি-লেখক, লেখকের মন, চেতনা, সমষ্টি-জীবন ইত্যাদি – সেই একই তর্ক যা বারং বার অর্থনৈতিক ও সমাজবাস্তবতাবাদী সাহিত্যতত্ত্বকে – কৌমজীবন, আধ্যাত্মবাদ কিংবা ব্যক্তির মনের তত্ত্ব দিয়ে অথবা ভাষার তর্ক দিয়ে বিরোধিতা করার চেষ্টা করছে। ভাষার মধ্যে দিয়ে কমিউনিকেশন বা সংবিত্তি-র সম্ভাবনাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে – সাহিত্যের অর্থময়তাকে আঘাত করছে, যেন একপ্রকার প্রতিরোধই প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রতিরোধ বিষয়ে আমরা তৃতীয়

[১৮৬] সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ধারা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০, পৃ- ২৯৯

অধ্যায়ের আলোচনায় আরও খানিকটা গভীরে আলোচনা করব। প্রকারান্তরে এই অধ্যায়ের নানান তর্কের সুতো তৃতীয় অধ্যায়ের তর্কে গিয়ে একত্রে গাঁথা হবে।

মোটের উপর উনিশ-শতক, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ থেকে শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জনের – সাহিত্য সমালোচনা তথা সাহিত্য-চিন্তার মূল প্রবণতাগুলির যে আবছা রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম এই অধ্যায়ে, তার প্রধান সূত্রটি ছিল – সাহিত্য বলতে সমকালীনতা যা বোঝে, সাহিত্যের সেই বদ্ধমূল, গণ্ডীবদ্ধ সংরূপের ধারণাগুলিকে ঠেলে, লঙ্ঘন করে দিয়ে – লিখনের সীমাহীনতায় উন্মুক্ত হওয়ার এক প্রক্রিয়া যেন। ক্রমাগত একই সঙ্গে লেখাকে মতাদর্শকেন্দ্রীক ও আঙ্গীকগত ভাবে বিচূর্ণ, বিমূর্ত করে তোলার যুদ্ধই যেন লিখনের রাজনীতিগুলির মধ্যে স্পষ্ট। বারং বারং কোন না কোন সংকীর্ণতা থেকে, মুখ হয়ে এসে – লিখনকে মুক্ত করে দেওয়ার এই গভীর প্রয়াস আসলে একভাবে, পূর্বোল্লিখিত সম্বন্ধ বা সংযোগেরই আকাঙ্ক্ষা বিশেষ । সহিতত্বের দ্যোতনায় অবিচল, লেখার এই নিগূঢ় এক কাজ। এত বিপুল ইতিহাস কে যদিও কয়েকটি পাতায় আঁটিয়ে তোলা অসম্ভব, তবু মৌলিক কয়েকটি প্রবণতাকে ছুঁয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে – আমাদের গবেষণার মূল তর্কটিই কিভাবে বিশ-শতকের বাংলা সাহিত্য চিন্তার মধ্যে বিচরণশীল সেই বিষয়টি তুলে ধরার প্রচেষ্টা করলাম আমরা এই অংশে।

উপসংহার

অধ্যায়ের শেষে, ডেরেক অ্যাট্রিজ তথা দেরিদার যে সাহিত্য আলোচনার প্রসঙ্গটিকে সামনে রেখে আমরা এই অধ্যায়ের সূচনা করেছিলাম সেখানেই আবার ফিরে যাব আমরা। একাধারে আমরা বুঝে নিতে পারছি – মানিক ও রবীন্দ্রনাথে পূর্বোক্ত তর্কটি কেন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই তর্কই বাংলা আধুনিক সাহিত্যের প্রধান তর্ক। লেখার কাজ-কে বুঝতে গিয়ে আমরা অবধারিত ভাবে এই তর্কে পতিত হলাম। তাহলে প্রারম্ভেই মানিক যে কথাটা বলছেন যে, তিনি জানেননা প্রগতি সাহিত্য কি হবে - তার কারণ আমার মনে হয় প্রগতি সাহিত্য যেহেতু কোন ব্যাক্তিমনের আত্ম-জাগরণের কাজ করবে না, তাই তিনি এমন একটা লেখা খুঁজছেন যেটা শ্রেণী বাস্তবতায় বদল আনতে পারে। যেটা নতুন, এই লেখা কিভাবে হবে তিনি জানেন না, এমনকি সে লেখা কেমন তা আগের থেকে বলা ক্ষতিকর। এটাই কি লেখার কাজের প্রধান শর্ত? মানিকের এই একটা লেখার সন্ধান - কি কেবল মাত্র আঙ্গিকের প্রশ্ন? বা রীতির প্রশ্ন? যা কেবল বৈপ্লবিক একটা বিষয়ী অবধি পৌঁছানোর বা তাকে জাগানোর এবং বিপ্লবের রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ করবে বলে মানিক মনে করতেন? অথবা লেখা কি আদৌ তেমন কোন কাজ করে? মানিক হয়ত লেখাকে কতকটা সেভাবে ভেবেছেন, আমরা মনে করি এটা লিখনের নিজস্ব একটা প্রশ্ন, লিখন তো কেবল বাস্তবের বাহক নয়, বা উপস্থাপক নয় বরং সে এক ভয়ঙ্কর বিকল্প, সে নিজেকে বার বার উদ্বৃত্তের জন্য উন্মুক্ত করে, আবিষ্কার করে এবং অকল্পনীয় সম্ভাবনার সৃজন করে চলে। এই বক্তব্যই আমাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে

যায়, আমাদের প্রধান প্রশ্ন লেখার কাজ ও অ(ন)ভিজ্ঞতার লিখনের প্রসঙ্গে। যে জর্জ বাতাই-র কথা উল্লেখ করলাম, দেরিদা তাঁর রাইটিং এন্ড ডিফারেন্স গ্রন্থে, বাতাই নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে – লিখনের সংকীর্ণ ও সামান্য অর্থনীতির কথা বলেছেন। অর্থনীতি এখানে খুব উল্লেখ যোগ্য চিন্তা। বিশ শতকের প্রথমার্ধের মার্ক্সবাদী আন্দোলন, চিন্তার বা আদর্শের অর্থনৈতিক লঘুকরণের দ্বারাই বিপর্যস্ত – অথচ অর্থনীতির একটি অর্থ তো কাঠামোও বটে বা যাকে বলতে পারি ব্যবস্থা, ছক ইত্যাদি। ফলত সংকীর্ণতা থেকে সামান্যে মুক্ত লিখনের ধারণা - একে কি আমরা মানিকের সেই লেখার সঙ্গে পড়ে নিতে পারি, যা স্থির করা হয়ে ওঠেনি এখনও, যাকে স্থির করা উচিৎ নয়, যা আগমনী - এই লিখনই কি ছিন্ন-পত্রাবলীর সেই লিখন যা সাহিত্যের ঘেরাটোপ লঙ্ঘন করে, লিখনের সামান্যতায় (তুচ্ছ ও সমগ্র উভয় অর্থেই) নিজেকে উন্মুক্ত করে। আবার এটা কি আদৌ কোন বিশেষ একটি লেখা বা লেখার ধরণ ? তাহলে সাহিত্য এবং লিখন নিয়ে এত মতামত কেন সমাজে? এই লেখার জন্য নানাবিধ আহ্বান থাকতে পারে বলে দেরিদা, অ্যাট্রিজকে তাঁর সাক্ষাতকারে জানিয়েছিলে। এটা কি আদৌ কোন বিশেষ লেখা, নাকি এটাই লেখার ধাত্রী-বিজ্ঞান ? অবশ্যই এটা একটা প্রশ্ন আমাদের কাছে। একটি প্রশ্নের বিপক্ষে আমরা গভীর ভাবে ভাবলে, আরেকটি প্রশ্নই করে উঠতে পারি কেবল, এটাই ভাবনার তথা দর্শনের প্রধান কাজ। সৃজন, উন্মোচন, সামান্যীকরণের দিকে ধাবমাণতা – ইত্যাদির সম্ভাবনা আমরা দেরিদার সাহিত্য-দর্শনের সূত্রে পাঠ করছি, এ নিয়ে ইতিপূর্বে দেশী কিংবা বিদেশী দর্শনে নানাবিধ আলোচনা হয়ে এসেছে। এর মধ্যে একটি গভীর ভবিষ্যৎ দর্শনের সম্ভাবনা নিহিত আছে। যাকে ইংরেজি ভাষায় আমরা বলি – 'Futurity'. মানিকের ইঙ্গিতেও আছে, রবীন্দ্রনাথ কে যেভাবে আমরা মানিকের সঙ্গে পড়ছি তার মধ্যেও আছে আর দেরিদার লিখন-চিন্তার মধ্যে তো আবশ্যিক ভাবে আছেই – সে বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে যথা সময়ে ফিরব। এই অধ্যায়ে কেবল বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের আলোচনার প্রসঙ্গে 'লেখার কাজের' তর্কটিকে ঐতিহাসিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করলাম। পাশাপাশি যে বিষয়টি আমরা উল্লেখ করতে চাই – যে অর্থে আমরা এখানে বিশেষ একটি লিখনের কথা ভাবছি – যে অর্থে আমরা তাকে আলাদা করে নিতে চাইছি – যে অর্থে আমরা খানিকটা যাকে বলে, authenticity-র তর্ক তুলে আনছি – তার সঙ্গে অবধারিত ভাবে জড়িত মূল্যের প্রসঙ্গ। গত অধ্যায়েও এর উল্লেখ করেছিলাম। এই অধ্যায়ে আবারও সেই প্রসঙ্গে ফিরে এলাম - যে সাহিত্যে, লেখার কাজ আসলে কোন সাহিত্যিক মূল্যের দিকে প্রকৃত অর্থে ধাবিত হয়? সেই সাহিত্যিক লিখনের শ্রমের মূল্যের উদ্বৃত্ত ও শিল্পের নিজস্ব তর্কে উদ্বৃত্তের সম্বন্ধ বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছিলাম গত অধ্যায়ে – যেখানে আমরা মার্ক্সের Surplus Value- র তর্ক দিয়ে, মূল্যের বিতর্কটিকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ের অন্তে আমরা নতুন এক আগমনী লিখনের ধারণায় উপনীত হলাম। অর্থাৎ সাহিত্য সমালোচনার নানাবিধ তর্কে উঠে আলোচিত হল, যে সত্য – সকলের তর্ক ও আদর্শের মধ্যেই, কোন না কোন ভাবে, অন্যতম মূল্যের কোন এক লিখনকে সাহিত্য-রূপে প্রতিষ্ঠা করতে – সেই নিরিখেই 'লেখার কাজ'-কে ভাবতে চাইছে – সেই অর্থে সকলের কাছে কোন এক আগমনী লিখন আছে, যা ভবিষ্যতের কৌটোর ভিতর রাখা। সেই আদর্শ লিখন। 'আদর্শ' শব্দটিকে কেবলমাত্র বোঝানোর সুবিধায়

ব্যবহার করলাম – আদর্শ শব্দের নানাবিধ দার্শনিক অভিধা আছে – সেসকল এখানে বিচার্য নয়। তাহলে এই মুক্ত অর্থে আদর্শ লিখন কোন না কোন বিশেষ (নির্দিষ্ট অর্থে বৃহৎ) মূল্যের কথা বলতে চায়। সেটাই তার প্রতিপাদ্য ও লক্ষ্য। একে স্বাভাবিক ভাবেই, আমরা সাহিত্যিক মূল্য হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। সুতরাং প্রকারান্তরে লিখনের যে তর্কে মানিক, রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের গবেষণার চৌহদ্দিতে দেরিদা, অ্যাট্রিজ ও অন্যান্যরা অবতীর্ণ হচ্ছেন – সেই তর্ক আরেকদিক থেকে দেখলে, সাহিত্যিক মূল্যের তর্কও বটে। প্রথম অধ্যায়ে যেভাবে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত-মূল্য নিয়ে আলোচনা করলাম (শিল্পের উদ্বৃত্ত বিষয়েও আলোচনা করেছি আমরা কিন্তু সরাসরি 'সাহিত্যিক মূল্য' বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি), তার চেয়ে – সাহিত্যিক মূল্যের এই তর্ক আরেকটু ভিন্ন – চিন্তার আরও অন্য পরত উন্মোচনে সক্ষম। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা, এই 'সাহিত্যিক মূল্যের'- তর্কের মধ্যে দিয়েই আমাদের লেখার কাজ সংক্রান্ত আলোচনার বা গবেষণার পরিশেষে গিয়ে উপনীত হব। দুটি অধ্যায়ের মধ্যে যে যে তর্কগুলিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সুতোর মত উল্লেখ করে করে এগিয়েছি – তাদের একরকমের গ্রন্থনা সম্পন্ন করার চেষ্টা করব শেষ অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভূমিকা

দুটি অধ্যায় জুড়ে আমরা লেখার শ্রম, লিখনের সামান্য অর্থনীতি, সৃজনশীল সাহিত্য ও শিল্পে উদ্বৃত্তের ধারণা, বাজার অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের ধারণা, সাহিত্য-বস্তুর ধারণা, সাহিত্যের নানাবিধ ধারণা – ইত্যাদির দার্শনিক ও সাহিত্যিক আলোচনার শেষে অবধারিত একটি প্রশ্ন – "'সাহিত্যের মূল্য' কী?" - এই প্রশ্নটিকে কোনভাবেই এড়িয়ে যেতে পারিনা। কোন লেখা কিভাবে সাহিত্য হয় বা হয়না এই বিচারের মূলে যেমন আছে, সাহিত্যের সংজ্ঞা কি এই প্রশ্নটি বা লিখনের 'অর্থনীতি' কেমনতর এই প্রশ্নটি – তেমনি একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। সাহিত্যের মূল্যের আলোচনা এবং অবশ্যই এই আলোচনা 'মূল্য'-এর ব্যাপক আলোচনা ব্যতিরেকে সম্ভব পর নয় – এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে লেখার কাজ বিষয়ক আলোচনার অসম্পূর্ণ ধারণা-বৃত্তটি সম্পূর্ণ হবে বলে আমার ধারণা।

এই অধ্যায়ের প্রথমেই আমরা, সাহিত্যের মূল্য বিষয়ক আলোচনাকে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও প্রগতিশীল মার্ক্সবাদীদের মধ্যবর্তী বিতর্কের মধ্যে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব। সাহিত্যের মূল্য সংক্রান্ত তর্কটিকে নানা ভাবে আলোচনা করা সম্ভব। বিশেষত বাজার অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক মূল্যের ভিত্তিতে বা শ্রমের মূল্যের তর্ককে আশ্রয় করে সরাসরি এই আলোচনায় প্রবেশ করা যায়। পরবর্তীকালে আমরা দেখব রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মতন চিন্তকেরা মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব আলোচনার সূত্রে শিল্পের ক্ষেত্রে, উৎপাদন ও নির্মাণের পার্থক্য বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কিভাবে উৎপাদনের শর্ত দিয়েই ক্রমে ক্রমে নন্দনতত্ত্বকে বোঝা সম্ভব – সে বিষয়ে এদেশে এবং বিদেশে তো অবশ্যই মার্ক্সবাদীদের মধ্যে নানাবিধ আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক আছে। আবু সয়ীদ আইয়ুব মূলত শৈল্পিক আধ্যাত্মবাদের প্রেক্ষিত থেকে, প্রগতিশীল মার্ক্সবাদীদের নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পের ধারণার বিরোধিতা করার প্রচেষ্টা করেছেন। আমরা আইয়ুবের মত মেনে নিয়ে অন্যমতকে বাতিল করছি বা অন্যমতকে মেনে নিচ্ছি – বিষয়টা এরকম একেবারেই নয়। আমরা এই অধ্যায়ে মূলত তর্ক করছি। আমাদের মতে আইয়ুবের বক্তব্যের একটি জোরের জায়গা ছিল – যেটা তাঁর তত্ত্বের অনেকানেক ভ্রান্তি সত্ত্বেও ভীষণই প্রাসঙ্গিক এবং বিচার যোগ্য। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে আমরা আইয়ুব ও মার্ক্সবাদীদের মধ্যেকার সাহিত্যিক মূল্য সংক্রান্ত তর্ককে মাথায় রেখে – এই তর্কের সঙ্গে ভবিষ্যৎ চিন্তার সম্বন্ধ বিষয়ে অনেকখানি আলোচনা করব। কারন প্রকারান্তরে সেই তর্ক আমাদের গবেষণার মূল যুক্তির সঙ্গে যথাযথ অর্থে সম্পর্কীত।

কিভাবে সম্পর্কীত সেটাই ক্রমে প্রমাণিত হচ্ছে – আইয়ুব ও মার্ক্সবাদীদের মূল্যের তর্ক থেকে দেরিদার ভবিষ্য-বাদ সংক্রান্ত ড্রুসিলা কর্নেলের লেখা এবং সেই সূত্রেই জিল দেলেউজের সৃজনের ধারণার সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং

ক্রমে সেখান থেকে মূল্যের সাধারণ তর্কের মধ্যে দিয়ে গিয়ে – আমরা আমাদের মূল্যের তর্কের সঙ্গে ভবিষ্য-বাদ, সৃজন, কাজ, সম্বন্ধ, উপহার এবং অনভিজ্ঞতার সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি। বলা বাহুল্য – গবেষণায় উঠে আসা, টুকরো টুকরো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সমস্ত তর্কগুলিই যেন এই অধ্যায়ে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাত করছে।

মার্ক্সবাদ, আইয়ুব ও সাহিত্যের মূল্য

গত অধ্যায়ে, মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনার মূল দিকগুলি নিয়ে আলোচনার সূত্রে আমরা আবু সয়ীদ আইয়ুব ও অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ও শীতাংশু মৈত্র নামে দুজন মার্ক্সবাদীর 'সাহিত্যের মূল্য' বিষয়ক বিতর্কের কথা উল্লেখ করেছিলাম। এখানে সেই বিতর্ককে বিস্তারিত ভাবে একবার পুনর্লিখনের চেষ্টা করব। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের পরিচয় পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় আইয়ুবের *বস্তুবাদী সাহিত্য বিচার ও অন্যমত : সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য* নামক লেখাটি প্রকাশিত হয়। সেখানে আইয়ুবের মূল বক্তব্য - নির্জনতার কবি সাহিত্যিকদের আক্রমণ করছেন মার্ক্সবাদীরা। যে সকল সাহিত্য 'বিপ্লব'-এর প্রয়োজনে লাগেনা, সেই সকল সাহিত্যকে তারা বর্জন করার কথা বলছে। এই বিষয়ে লেনিন, লেনিনের আধুনিক ভাষ্যকার লুনাচারস্কি, ডিমিট্রিয়ফের উদ্ধৃতি তুলে দেখাচ্ছেন যে কিভাবে মার্ক্সবাদীরা সাহিত্যকে কেবলমাত্র বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে দেখতে চাইছেন বা বলা চলে তার মধ্যেই লঘুকৃত করছেন। তাঁর লেখা থেকে লেনিনের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য :

"Down with non-party writers! Down with literary superman! Literature must become a part of the proletarian cause as a whole, part and parcel of a single whole, of the entire social mechanism set in motion by the whole conscious vanguard of the entire working class. Literature must become an integral part of an organized, planned, united social-democratic party work."[১৮৭]

১৯০৫ সালের লেনিনের এই উক্তিটিকে পরে পুনরায় প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেন লুনাচারস্কি। আইয়ুব দুটি যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেন মূলত একটা হল মার্ক্সবাদীরা অর্থনৈতিক সাম্যের কথা ভাবছেন। এই অর্থনৈতিক সাম্য যেমন একদিকে একটা ঐতিহাসিক যাত্রা সেরকম অন্যদিকে এটা এক ভাবে মানুষের 'শ্রেয়োবোধ' বা নীতি-বোধের কাছে একটা গভীর আবেদনও বটে। ঠিক এখানেই একেবারে 'বৈজ্ঞানিক' পর্যালোচনায় উঠে আসা ভবিষ্যৎ বানীর থেকে এটা আলাদা।

---

[১৮৭]ধণঞ্জয় দাশ (সম্পা), *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (অখন্ড)*, করুণা প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ-৬১৮

"কিন্তু মার্ক্সবাদ তো কেবল ভাবী-কথন নয়, মানুষের শ্রেয়-বোধের কাছে একটি গভীর আবেদনও বটে। বিজ্ঞানী যেমন নানা তথ্য পর্যালোচনা করে ভবিষ্যত বানী করেন অমুক দিন নৈর্ঋত কোণ থেকে ঘূর্ণিবায়ু উঠবে, মার্কসবাদীর কাছে সমাজ-বিপ্লব তেমন একটি সম্ভাব্য ঘটনা মাত্র নয়। সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তা চায়, প্রাণপাত করেও তা ঘটিয়ে তুলতে প্রস্তুত।"[১৮৮]

আর ওনার দ্বিতীয় যুক্তিটা হল - অর্থনৈতিক সাম্যই কি মানব মুক্তির একমাত্র পথ? অর্থ পেলেই কি মানুষ সুখী হতে পারবে? আর কোন বৃহত্তর আনন্দের কি প্রয়োজন নেই মানুষের? এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে অন্য আরেকটি কথা - মার্ক্সবাদী বৈপ্লবিক মুক্তি যে শ্রেয়সের দিকে বা নৈতিক কোন শুভের দিকে নিয়ে যাবেই সে বিষয়েই বা কেন নিশ্চিত হচ্ছি আমরা? এটাও আইয়ুব ওনার মত করে বলতে চাইবেন। আরও বলবেন –

"সমাজমানসের ক্রমবিকাশে শ্রেয়-বোধের উত্থান-পতন, শ্রেয়-জ্ঞানে ভুলভ্রান্তি ঘটে থাকতে পারে - বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা ঘটছে - কিন্তু আমরা যদি শ্রেয়সের কোন যুগ ও শ্রেণী-নিরপেক্ষ প্রতিমানের অস্তিত্ব না মানি তবে কোন ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে বলব ধণতন্ত্রের চেয়ে সমাজতন্ত্র উৎকৃষ্ট, এবং কিসের জোরে সাধু সংকল্পের কাছে দোহাই পাড়ব ধনপ্রাণ বিসর্জন দিয়ে সমাজ-বিপ্লবের প্রচেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করতে?"[১৮৯]

নৈতিকতা বা শ্রেয়োবোধের ধারণা থেকে অর্থনৈতিক সাম্যের ধারণাকে আলাদা করার ক্ষেত্রে উনি আবার মিলের তত্ত্বের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন এবং সেই তত্ত্ব বিতর্কের মধ্যে দিয়ে পরিশেষে কি রূপ ধারণ করে তার কথা বলেন -

"এই সমস্ত আপত্তির চাপে পড়ে মিল তাঁর সূত্রটিকে কিছু বদল করতে বাধ্য হলেন, বললেন, আমাদের কাম্য প্রচুরতম আনন্দ নয়, উচ্চতম আনন্দ।"[১৯০]

এই সুতো ধরে চলতে চলতে আইয়ুব আনন্দের বাছ-বিচারে নেমে ধীরে ধীরে ওনার নিজের মূল বক্তব্যটিকে ক্রমে খোলসা করেন এবং বলেন -

"মূল্যজ্ঞানে কিছু হেরফের পাওয়া গেলেও মোটের উপর তাতে খুব বেশি গড়মিল দেখা যায়না। মানব-সমাজে যারা গুণী-জ্ঞানী বলে যুগে যুগে মান পেয়েছেন তাঁরা প্রায় একবাক্যে শারীরিক সুখের স্থান নিচের দিকে নির্দেশ করেছেন। আজীবন অভিজ্ঞতা ও সাধনার ফলে যে তিনটি মূল্যকে তাঁরা সকলের উপর মর্যাদা দান করেছেন সেগুলি আমাদের দেশে সত্য-শিব-সুন্দর নামে বিদিত।"[১৯১]

---

[১৮৮] ধণঞ্জয় দাশ (সম্পা), *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (অখন্ড)*, করুণা প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ-৬১৯

[১৮৯] তদেব, পৃ-৬১৯

[১৯০] তদেব, পৃ- ৬২১

[১৯১] তদেব, পৃ-৬২২

এই ধারণার ভিত্তিতে আইয়ুব শিল্প এবং বিজ্ঞান উভয়েরই ক্ষেত্রে একটা ফলিত এবং একটা বিশুদ্ধ মূল্যের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। ফলিত বিজ্ঞানই যেমন একমাত্র বিজ্ঞান হতে পারেনা তিনি বলেন, তেমনি তিনি বলেন ফলিত (Instrumental বা Utilitarian) সাহিত্যই একমাত্র সাহিত্য হতে পারেনা। এক্ষেত্রে আইয়ুবের যুক্তি প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র বিষয়ক। আইয়ুব বলছেন –

"দশ পনেরো হাজার বৎসর পূর্বে আলতামিরার গুহা-গাত্রে নানা জন্তুজানোয়ারের মূর্তি খোদাই করা হয়েছিল। পাথরের গায়ে এমন আশ্চর্য সজীব মূর্তি যে-আদিম কারিগররা রেখে গেছেন তাঁদের কলাকৌশলের তারিফ না করে আমরা পারি না। কিন্তু বিজ্ঞজনেরা বলেন এগুলির উদ্দেশ্য দর্শককে আনন্দ দেওয়া ছিলনা, কারণ সে-সব গুহা অত্যন্ত দুরধিগম্য এবং ঘুটঘুটে অন্ধকার। এগুলি একান্তভাবে তাদের ম্যাজিকের অঙ্গীভূত ছিল -উদ্দেশ্য বদ্ধ জন্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করা।...সভ্যতার শেষ পর্যায়ে আবার তার উপকরণ-মূল্যকে সর্বেসর্বা ঘোষণা করে কি আমরা ইতিহাসের চক্রগতির প্রমাণ দিতে চাই?"[১৯২]

এখানে আইয়ুব গুহাচিত্রগুলিকে ফলিত শিল্পের ধারণার সঙ্গেই তুলনা করবেন এবং বলতে চাইবেন যে সভ্যতার যাত্রা আসলে 'বর্বরতা' থেকে 'নীতি'র দিকে যাত্রা এবং মানব চেতনার ক্রমে সেই নীতির পথে উন্নীত হওয়া উচিৎ। যদিও খেয়াল করলে দেখা যাবে, আইয়ুব অন্য প্রশ্নের অবতারণা করছেন। আগেই উনি বলছিলেন, ইতিহাসের গতি অনিবার্য ভাবে মার্ক্সবাদী বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেয়সের পথে যাবেই এরকম কোন নিশ্চয়তা আছে কি? আর এখানে উনি একভাবে বলছেন যে আসলে মানবের যাত্রা নীতির দিকেই একটা যাত্রা। অর্থাৎ দুটো জিনিস -

১। উনি বলতে চাইছেন ইউটিলিরিয়ান যে আনন্দ বা আনন্দকে নেহাত কোন কেজো অর্থে যদি ধরা হয় তাহলে সেই আনন্দ ফলিত সেটা শিল্পের বিশুদ্ধতা হতে পারেনা। সেটাকে আমরা যেন চলতি ভাষায় মনোরঞ্জন (Entertainment) বলেও বুঝে নিতে পারি।

যেটা গুহাচিত্রের ক্ষেত্রে সম্মোহন।

২। অন্যদিকে উনি আবার বলছেন যে মহৎ শিল্পে বিশুদ্ধতা থাকবে, যা কেজো মূল্যের ঊর্ধ্বে। তাহলে মহৎ শিল্পে কি সম্মোহনী কোন গুণ থাকবেনা? সেগুন যদি না থাকে তাহলে তা পাঠককে অন্য কোন উচ্চতর স্তরে উন্নীত করবে কি করে? আর উনি যে বিশুদ্ধ শিল্পের বিশুদ্ধতার সঙ্গে - শ্রেয়নীতি বা Ethics - কেও একই ভাবে দেখছেন সেখানে গিয়ে তো গুহাচিত্রের সম্মোহন বা বিশুদ্ধ শিল্পের সম্মোহন আর নীতির প্রসঙ্গকে একসঙ্গে পাঠ করা যাচ্ছে না। বুঝে নিতে গিয়ে বিরোধ তৈরি হচ্ছে।

[১৯২] তদেব, পৃ-৬২৩

এই বিরোধ-ই আসলে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। কারণ এখানে, আমার মতে আইয়ুব সাহিত্য বা শিল্পের মূল্যের মধ্যে পরিমেয় আর অপরিমেয়কে জ্ঞানে বা সজ্ঞানে আলাদা করে নিচ্ছেন। সম্মোহন সত্যিই শিল্প বা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় একটি উপাদান (মতাদর্শের তত্ত্বের ভিত্তিতে দেখলে তো বটেই) কিন্তু গুহাচিত্রে সেটাকে একটা ফাঁদের মত করে ছকে নেওয়া আছে যেনবা। যেনবা নান্দনিকতার অকারণ লীলাকে একটা আরোপিত নির্ণয়ের মধ্যে বেঁধে দেওয়া আছে। উল্টোদিকে যখন নীতির কথা আসছে তখনো যেন আবার মতাদর্শের অন্য আরেকটা ভ্রান্ত বিশ্লেষণের সম্ভাবনাকে আইয়ুব মনে করিয়ে দিতে চাইছেন (অজান্তেই)। তিনি বলতে চাইছেন যে - শ্রেয়স বা নীতিকে যদি কেবল ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শে বেঁধে ফেলা হয় তাহলে আবার একটা সাময়িক পরিমেয়তা আরোপ করা হবে যেন।

উপরোক্ত দ্বিবিধ লঘুকরণের সম্ভাবনাকে উনি সত্য-শিব-সুন্দর -এই মূল্যত্রয়ের মধ্যে দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন সম্ভবত। আইয়ুবের এই প্রবন্ধের বিরুদ্ধে যে দুই মার্ক্সবাদীদের প্রবন্ধের কথা আলোচনা করব, আমার মতে তারা হয়ত সমস্যাটাকে ঠিক এতটা জটিলতায় দেখতে চাননি, তাদের ক্ষেত্রে আইয়ুবকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিক হিসেবে প্রমাণ করাটাই ছিল তাৎক্ষণিক প্রয়োজন।

গত দুই অধ্যায়ে, শ্রমের মূল্য এবং লিখনের অর্থনীতির যে জটিল আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই উপরোক্ত বিরোধের পুনর্লিখন ও নির্দিষ্ট অর্থে, আমাদের গবেষণায় সেই বিরোধের সঙ্গে একরকমের মোকাবিলার দিকে পা বাড়িয়েছিলাম - এই অধ্যায়ে সেই যুক্তি-পথ ধরে আমরা আবার ফিরব, কিন্তু আপাতত আইয়ুব ও মার্ক্সবাদীদের মধ্যবর্তী বিতর্কের পুনর্লিখনকে সমাপ্ত করি।

১৩৫৪ বঙ্গাব্দের পরিচয় পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় আইয়ুবের প্রবন্ধটির সমালোচনা করে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র *সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য* নামের একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে ওনার গর্বের জায়গা এটাই ছিল যে আইয়ুব মার্ক্সবাদী বিপ্লবের ধারণাটিকে মেনে নিয়েছেন সেখানে উনি আইয়ুবকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বাকি পুরো প্রবন্ধটিতেই উনি আইয়ুবকে যাচ্ছেতাই সমালোচনা করেছেন। ওনার মূল বক্তব্য এটাই ছিল যে - আইয়ুবের লেখায় আসলে বাম বিদ্বেষ অন্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে। অমরেন্দ্রর ভাষায় আইয়ুব সাহেব বামপন্থী শিবিরে লাল জুজুর ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন। অমরেন্দ্র লিখছেন -

“অতএব আইয়ুব সাহেব আহ্বান জানিয়েছেন, সাহিত্যিকরা মার্ক্সিস্ট -লেনিনিস্ট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বিশুদ্ধ সাহিত্যের ও সত্য-শিব-সুন্দর মার্কা উচ্চতম মূল্যত্রয়ের সাধনা করুন। তাহলে 'বিপ্লব' সার্থক হবে, সোশ্যালিস্ট সমাজ আর পেট-পূজায় পর্যবসিত হবে না, সেখানে সভ্য মানুষের উপযুক্ত বাসস্থান রচিত হবে।”[১৯৩]

[১৯৩] তদেব, পৃ-৬২৪

অমরেন্দ্র-র মতে বিপ্লব কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের কর্মকাণ্ড নয়। সেটা 'সাংস্কৃতিক' বা 'আধ্যাত্মিক' মূল্যের প্রশ্নটাকে কখনই সম্পর্কহীন মনে করেনা। অমরেন্দ্র লিখছেন -

"সুতরাং আইয়ুব সাহেব যখন বলেন বিপ্লবের অর্থ শুধুই একটা আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা, যার সঙ্গে আধ্যাত্মিক বা সাংস্কৃতিক মূল্যের কোন সম্পর্ক নেই, তখন একথার কোন মানে খুঁজে পাই না।"[১৯৪]

তিনি আরও বলেন,

"আইয়ুব সাহেবের মূলগত ভ্রান্তি হল, বিপ্লবকে শুধু আর্থিক ব্যবস্থা চালু করার মেকানিজম হিসাবে কল্পনা করা।"[১৯৫]

এবং তিনি মার্ক্সবাদী সাহিত্যকে ফলিত সাহিত্য বলতে নারাজ হন। তাঁর মতে -

"মার্ক্সিস্ট লেখক যে-সাহিত্য রচনা করেন বা করতে চান, বিপ্লবের আগেই হোক বা পরেই হোক সেটা আদৌ ফলিত সাহিত্য নয়। সেটা শুধুই সাহিত্য, শিল্প-ধর্মী ও প্রগতিশীল।"[১৯৬]

অমরেন্দ্র মিত্র মার্কসবাদী সাহিত্যকে ফলিত সাহিত্য এই অর্থে বলতে চাইবেন না যে আলাদা করে বিশুদ্ধ সাহিত্য আবার কি হবে, মার্কসবাদীরা বিপ্লবের জন্য লিখছেন - তাহলে সেটা কি বিশুদ্ধ নয়। বিপ্লবের সাহিত্যের মধ্যেই বিশুদ্ধতা আছে। এরকম একটা যুক্তির বলে তিনি আইয়ুবকে খারিজ করতে চাইবেন। কিন্তু, একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, অমরেন্দ্র মিত্র-ও প্রগতির সাহিত্য ও অগ্রগতির সাহিত্যের মধ্যে তফাত করছেন। অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়েই আমরা আরেকবার মনে করে নিতে পারি যে এখানে দুপক্ষেরই একটা যথাযথ সাহিত্য আরেকটা অযথার্থ সাহিত্যের ধারণা আছে। উভয়েই উভয়ের সাহিত্য মতকে অযথার্থ প্রমাণের প্রচেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু প্রকারান্তরে যেনবা উভয়েই সাহিত্যের একটা অনির্ণায়ক মূল্যের দিকে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত জোর দিচ্ছেন। এই বিষয়টিতে অন্য এক ভাবে আমরা ফিরব পরে এবং মার্ক্সবাদ ও আঙ্গীকবাদের পুরাতন বিতর্কের সূত্র ধরেই আবার অমরেন্দ্র মিত্র আইয়ুবকে একই প্রশ্ন করছেন যে - আঙ্গিকবাদের প্রশ্ন দিয়েই কি একমাত্র বিশুদ্ধ মূল্যের বিষয়টিকে নির্দেশ করা সম্ভব? এটা কি 'বস্তুবিশ্লিষ্ট আইডিয়াল সম্পর্ক' - কেই আবার করে বলা নয়? এই জন্যেই কি লেনিন-কে বলতে হয়নি 'Down with non-party writers!, Down with literary Supermen!' - ইত্যাদি[১৯৭]। অর্থাৎ এটা কি কেবল একই ছকের পাশ-বদল নয় ? ওনার প্রবন্ধ পাঠ করলে, ওনার যুক্তিটি আরও বেশি করে

[১৯৪] তদেব, পৃ-৬২৫

[১৯৫] তদেব, পৃ-৬২৫

[১৯৬] তদেব, পৃ-৬২৬

[১৯৭] তদেব, পৃ-৬২৬

স্পষ্ট হয়। আমরা এখানে কেবল সিদ্ধান্তটুকুই উদ্ধার করছি, মূল লেখায় আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এই তর্ক লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এবং তার সঙ্গে এটাও পরিষ্কার করে বলছেন যে -

"সে যাই হোক পার্টি-নেতৃত্ব লেখককে আঙ্গিক, টেকনিক, craftsmanship, এসব কলাকৌশল অবজ্ঞা করতে বলে না। একথাও বলে না যে শুধু প্রচারবাদী সাহিত্য রচনা কর। বিপ্লবের হাতিয়ার রূপে সাহিত্য কাজ করবে মানব-চৈতন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে।"[১৯৮]

অমরেন্দ্র মিত্র এখানে এমন এক ধরণের লেখার কথা বলছেন যা যেন একভাবে সমাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম। মার্ক্সবাদী সাহিত্যের ধারণার মধ্যে এটা সবসময়েই ছিল। এই বিষয়টা আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা এই মানব-চৈতন্যে প্রভাব বিস্তারের প্রসঙ্গটার দুটো দিক দেখবার চেষ্টা করি। ১৮৮৮ খ্রীঃ Margaret Harkness-কে লেখা ফ্রেড্রিক এঙ্গেলসের একটি বিখ্যাত চিঠির কথা যদি আমরা মনে করি - যেখানে এঙ্গেলস বালজাককে যে কোন ইতিহাস, অর্থনীতিবিদ বা সমাজনীতি-বিদের থেকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। কারণ এটা নয় যে বালজাক বিপ্লবের সাহিত্য লিখছেন বরং কারণ এটাই যে বালজাক সমাজের এমন একটা বাস্তব চিত্রকে ফুটিয়ে তুলছেন লেখায় যেটা অনেক 'বৈপ্লবিক' লেখায় অনুপস্থিত। বালজাক একেবারে নিপুণ হস্তে সমাজকে তাঁর নিজের সাহিত্যের মধ্যে খোদাই করে দিচ্ছেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে উক্ত তর্কে, সাহিত্যে একধরণের বাস্তবতাবাদ বা আরো নির্দিষ্ট করে বললে সমাজবাস্তবতাবাদকেই একমাত্র প্রগতির চিহ্ন বলে নির্দিষ্ট করতে চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে এই কথাটাকেও খারিজ করা হচ্ছে যে একটা সাহিত্য যদি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মানব-চৈতন্যে প্রভাব বিস্তার করতে চায় তবেই সে প্রগতিশীল সাহিত্য হবে বা তবেই সে বৈপ্লবিক হবে বা তবেই সে একমাত্র মানব-চৈতন্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। অর্থাৎ কেমন করে একটা লেখা প্রভাবিত করে ফেলবে, ছুঁয়ে ফেলবে তার অভিপ্রেতকে – তা লেখকের প্রোপাগান্ডা বা উদ্দেশ্যের উপর প্রায় নির্ভরশীল নয় বললেই চলে – লেখার কাজের তেমন কোন সুলিখিত পাটিগণিত সম্ভব নয়। অর্থাৎ বিপ্লবের জন্য লিখছি বলে লিখলেই সে লেখা প্রগতিশীল বা অন্য অর্থে সাহিত্য মূল্য অর্জন করতে পারবে এরকম মানে নেই। এখান থেকে যে দুটো দিকের কথা প্রসঙ্গ উল্লেখ করছিলাম, সেই দুটো দিক বা বৈপরীত্য স্পষ্ট –

যে একদিকে বালজাক প্রগতিশীল হতে না চেয়েও এক অর্থে সাহিত্য মূল্য পেয়ে যাচ্ছে, আর আরেক দিকে অনেকেই নিম্নশ্রেণীর মানুষের কথা লিখতে গিয়েও প্রগতিশীল হতে পারছেনা - সাহিত্যের থার্মোমিটারে, তার পারদ চড়ছে না। এক্ষেত্রে কমলকুমার মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বারোঘর এক উঠোন রচনার সমালোচনা উল্লেখ্য। এরকম উদাহরণ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে অসংখ্য আছে যদিও, যাইহোক -

---

[১৯৮] তদেব, পৃ-৬২৭

১৩৬৪ বঙ্গাব্দের চতুরঙ্গ পত্রিকার মাঘ-চৈত্র সংখ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘ বারোঘর এক উঠোন ’-গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে কমলকুমার লিখছেন –

‘এ কথা আমরা অতি সহজেই বলিতে পারি যে এই পটভূমিকায় কতিপয় সগোত্রীয় চেনা-অচেনা লোক আনিয়া ভেল্কী লাগাইবার চেষ্টা না করিয়া সত্যই যদি বস্তিবাসীর দৈনন্দিন জীবন লইয়া লিখিতেন তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টি সাহিত্যের গর্ব হইত ’[১৯৯]

অর্থাৎ, ভেল্কি লাগানো বলতে এখানে কমলকুমার বোঝাতে চাইছেন, বস্তিবাসী নিয়ে লিখবার রাজনীতির তত্ত্বটা বড় না হয়ে, যথাযথরূপে যদি বস্তিবাসীর কথা লেখা যেত, অর্থাৎ বস্তিবাসীর জীবনের প্রতি যাথার্থ্য যদি দেখানো যেত তাহলে যে কেবল বস্তিবাসীদের বেশি করে চেনা যেত, বিপ্লবের সুবিধা হত ইত্যাদি নিয়ে কমলকুমারের কোন মাথা ব্যথাই নেই। ওনার মতে তাহলে সাহিত্যিক মূল্যে উত্তীর্ণ হতে পারত লেখাটি। তাহলে যা নিঃসন্দেহে একটি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিশীলতা যেন সাহিত্য-রূপে শ্রেষ্ঠ হত। এটাকে বেশ ঘুরিয়ে পাঠ করা সম্ভব অর্থাৎ যাকে আমরা বস্তিবাসীর জীবন নিয়ে আশ্চর্য সৃষ্টি বলে উত্তেজিত হচ্ছি, তাকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ হতে গেলে কিন্তু যাথার্থ্যের গণ্ডী পের হতে হবে। অর্থাৎ সৃষ্টি যা খুশি হতে পারে কিন্তু যথার্থ হতে গেলে তাকে ব্যক্তির সংকীর্ণতা থেকে বাস্তবতায় বা যাথার্থের পাল্লায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আবার যে তর্ক আমরা আগেই উল্লেখ করেছি সে নিয়ে বলা চলে, সাহিত্যের নামে যা খুশি লেখা হতে পারে, বাস্তব বর্ণনা করে কাজ সেরে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু সেই শিল্পকর্মের কোন সৃষ্টিশীলতা, উত্তরণধর্মীতা না থাকলে তাকে যথার্থ শিল্প বলা চলেনা। এই সূক্ষ্ম বিচারের তারতম্যেই অসংখ্য লেখালিখির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া লেখা এবং যথার্থ লিখনের পার্থক্য বিস্তর। সাহিত্যের এই মূল্য আসলে, লিখনের ন্যায়েরও প্রশ্ন। ন্যায় সাধন না হলে লিখন তাঁর সংকীর্ণতা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেনা। এই ন্যায় সাধনের স্বপ্নেই তো বিভাজিত হয়ে যায়, সাহিত্য নিয়ে নানাবিধ দল, মত ইত্যাদি। কমলকুমার আরও লিখেছেন,

‘ পূর্বেই বলিয়াছি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অনেক কথাই আপনার অজ্ঞাতসারে লেখেন, সে কথা লইয়া যদি চিন্তা করিতেন তাহলে সত্যই নতুন দিক লাভ করিতেন[২০০] ’

কমলকুমারের বক্তব্য – প্রকারান্তরে একই। বস্তিবাসীর জীবনের রাজনৈতিক গুরুত্ব, বাজারের প্রেক্ষিতে তার প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রভৃতি নানা কিছুর তথাকথিত আধুনিক সাহিত্য-বোধের বোঝা কাঁধে নিয়ে লেখক যখন লিখতে গেছেন, তখন কমলকুমারের মতে নতুন কথা হয়ে পড়েছে গৌণ এবং গৌণ কথাগুলিই যেন প্রধান হয়ে পুনরাবৃত্তি কিংবা অযথা ভেল্কী লাগানোর কাজে নেমেছে। যাথার্থ্য থেকে দূরে সরে গেছে। আমাদের মনে হতে পারে এখানে, রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যের পাঠকের আশা আকাঙ্ক্ষা, সাহিত্যের তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে, একেবারে যথাযথ প্রকাশটুকু ইন্দিরাদেবীর কাছে করতে চেয়েছেন সেও কি এই যাথার্থ্যরই ধারণা? আবার, রোসিঙ্কা চৌধুরী - বঙ্কিমের উক্তি টেনে এনে প্রমাণ করছেন, ঈশ্বর গুপ্ত যাহা আছে, তাহার কবি – তাহলে কমলকুমার কি যাহা আছে, তাঁহাকে নিপুণভাবে বলা

[১৯৯] কমলকুমার মজুমদার ,‘ বারো ঘর এক উঠোন ’, *অগ্রন্থিত কমলকুমার* ,অবভাস , ২০০৮, পৃ-৪৪

[২০০] তদেব

কেই যাথার্থ্য বলছেন? আধুনিকতার ভেল্কি সরিয়ে উনি আদত বাঙলার যথার্থ স্বরূপ চাইছেন – এটা কি সেই অর্থের যথার্থতা? তাহলে আবার সেই তর্ক - কাকে বলব যথার্থ? একেবারে কেঠো বস্তুবাদের মর্মই কি যথার্থতা নাকি অতিলৌকিক আধ্যাত্মিক কিছু, নাকি কমল মজুমদারদের মতন – কৌম ও প্রকৃতিবাদের আধুনিকতাবাদী চর্চাই কি যথার্থতা – ন্যায়ের প্রশ্নটিকে কিভাবে বুঝব? একবাক্যে যে বোঝা যাবেনা – সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তবু যে সংযোগ, উদ্বৃত্ত, লিখন, শ্রম ইত্যাদির তর্ক দিয়ে এতদূর আলোচনা এগিয়ে নিয়ে এসেছি তার ভিত্তিতেই আমাদের বুঝে নিতে হবে কি অর্থে ন্যায়ের কথা ভাবছি। আমরা যদি কমলকুমারের ঐ তর্কটিকে প্রশ্ন করি যে - কোন নতুনত্বের কথা বলতে চাইছেন, কমলকুমার? কোন নতুনত্ব জ্যোতিরীন্দ্রের লেখায় নেই? বা আরও অস্পষ্ট করে বললে, কোন অন্যায়টা আছে ওর উপন্যাসে? কমলকুমার তার স্বভাবোচিত ভাষায় লিখবেন –

‘ এক-এক সময় এত হাওয়া থাকিতেও আমরা হাঁপাইয়া উঠি, নিজেদের জন্য অতিকায় দুঃখ আসিয়া দেখা দেয়...এই সত্যটুকু বুঝিতে বড় প্রাণে লাগে যে দীর্ঘশ্বাসের অস্তি দিয়া তৈয়ারি আমাদের জীবন । এ জীবন চিরদিনই মৃত । এ কথা স্মরণ করিয়া মুরশেদ হই না । এই মৃত জীবনকে লইয়া ছেলেখেলার অন্ত নাই; কে সেই ছেলেখেলায় প্রমত্ত এ কথা লইয়া বহু তর্ক আছে কিন্তু এখানে তার মীমাংসা নাই ।

লেখক এই সত্যের মীমাংসার দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আধুনিক হিসাবে নিজের অক্ষমতায় লজ্জা পাইলেন[২০১] ’

আধুনিকের সাহিত্যের সমস্যার বদলে, প্রাগাধুনিকের চেতনা, চোখ, সংকেত, জীবনযাপন ইত্যাদির আদত উপাদান দিয়ে সাহিত্যের নির্মাণ চাই। কমলকুমারের এই আধুনিকতাবাদী তথা প্রগতি-বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থানের কথা ইদানিংকার পাঠকের কাছে অবিদিত নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল আধুনিকের সমস্যাটা কি? আর প্রাগাধুনিকের সমাধানটা কি? সেটা উপরের উদ্ধৃতিতে কমলকুমার স্পষ্ট করেছেন। বিষয়ীর প্রশ্ন, দুঃখের থেকে উদ্ভূত সংকটময় অস্তিত্বের প্রশ্নকে আধুনিকতা বিস্তর তর্কাতর্কির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে কিন্তু তার মীমাংসা করতে আধুনিক হিসেবে, যৌক্তিক, বৈজ্ঞানিক হিসেবে লজ্জা পেয়েছে। এটাই মূল সমস্যার কথা – কমল মজুমদারের রাজনৈতিকতার কথা। তাহলে প্রশ্নটা সেই একই আকারে আসছে – এই বিষয়ীর মীমাংসা তথা, আধুনিকতার মধ্যস্থ সংকীর্ণতার বর্জনের মধ্যে দিয়েই সাহিত্যের উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। সেটাই একই সঙ্গে কমলবাবুর ক্ষেত্রে ন্যায়ের সম্ভাবনা। সেই একই প্রশ্নে ফেরা যাচ্ছে – আধুনিকতার পরিমাপ তর্ক-বিতর্ক, লেন-দেন, অর্থনীতি ভেলকি – এসব ছাপিয়ে, এসব থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে, এসকলকে লঙ্ঘন করে সাহিত্যের যথার্থ মূল্যে পৌঁছানো। এখানে কমলকুমার অনেকটাই কাব্যিক ভাবে বিষয়ীর প্রসঙ্গে যাচ্ছেন। আমরা আমাদের আলোচনায় পেয়েছি মূলত ন্যায় এবং সম্বন্ধ ও সংযোগের তর্ক। আমরা সেভাবেই ভাবার চেষ্টা করছি।

---

[২০১] তদেব, পৃ-৪১

যথার্থের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা হল যে - সমাজবাস্তবতার বিশ্লেষণ যথাযথ হচ্ছে না বলে লেখার গুরুত্ব থাকছেনা। কিন্তু কমলমজুমদার কোনভাবেই, মার্ক্সবাদী বিতর্কের প্রেক্ষিত থেকে 'বারো ঘর এক উঠোন'-এর সমালোচনা করছেন না সে নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। বরং কিছুটা উল্টো দিক থেকে, অ-প্রগতিশীল অথচ প্রান্তিক মানুষের জীবন বিষয়ে নিপুণ এবং দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দৃষ্টিতে নিবদ্ধ, যাপনে নিমগ্ন একজন লেখকের প্রেক্ষিত থেকে – সাহিত্যের একধরণের অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন। একধরণের ভ্রান্তিকে চিনিয়ে দিতে চাইছেন। আধুনিক, নাগরিক লেখকের যে নগর সর্বস্বতা – তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামীণ, অনাগরিক মূল্য, চিহ্ন, সংকেত বিষয়ে নির্বিকার, অসচেতন, উদাসীন এমনকি অনেকক্ষেত্রেই অহংকার বসত, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জ্ঞানে – সজ্ঞানেই খাটো দৃষ্টির অভ্যাসে দুষ্ট। শিক্ষার অহংকার, জ্ঞানের অহংকার ইত্যাদি নাগরিক-গ্রাম্যতার সমস্যা। কেন্দ্র ও প্রান্তের সমস্যা বিষয়ে আমরা আধুনিক সাহিত্য থেকে যথেষ্ট জানতে এবং বুঝতে পারি। এখানেও কমলমজুমদার কিন্তু যথাযথ উপস্থাপনের প্রসঙ্গটিকে বেশি মূল্য দিচ্ছেন, তথাকথিত রাজনৈতিক বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টির সাপেক্ষে। বালজাককে যে কারনে এঙ্গেলস বাহবা দিচ্ছেন, কমলমজুমদার ঠিক সেই কারণেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমালোচনা করছেন। প্রশ্নটি একই, যথার্থ হয়ে ওঠার প্রশ্ন, সাহিত্যের ন্যায্য মূল্যে উত্তীর্ণ হয়ে ওঠার প্রশ্ন। কি এই ন্যায্যতা, কিসে ন্যায্যতা হয়, তা আপাতভাবে উপরোক্ত তর্কে পরিষ্কার মনে হলেও বিষয়টি অসম্ভব জটিল, সন্দেহ নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তর্কেও এই বিষয়টা স্পষ্ট যে মানিকের ভবিষ্যৎ দর্শন নিয়ে অনেকের আপত্তি থাকছে। এটাই উঠে আসছে যে - সমাজবাস্তবতার বিশ্লেষণ না করে কি ছাইপাঁশ ভবিষ্যৎ দর্শন হবে ইত্যাদি। কিন্তু এখানে একটা মজার বিষয় হল বাজাকের লেখা বিষয়ক তর্ককে আমরা এভাবেও পড়তে পারি যে - একজন লেখক আসলে নিজের একটা বিশেষ মতাদর্শ থাকা স্বত্বেও লেখার কাজে নিজেকে খুলে দিচ্ছেন, মেলে ধরছেন এবং তার ফলে তাঁর রচনার মতাদর্শ বা এক অর্থে সামাজিক সিদ্ধান্ত (মার্ক্সবাদীরা বলবেন শ্রেণী-অবস্থান) গ্রহণযোগ্যতা হারালেও সমাজকে দেখবার যে গভীর নিপুণতা সেইটা কখনোই অপ্রাসঙ্গিক হতে পারছেনা। খানিকটা এইভাবে বলা যেতে পারে যে - এখানে যেন একটা লেখা একটা বিশেষ মতাদর্শের প্রারম্ভ বিন্দু থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেকে মেলে দিচ্ছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে। বাজাকের বহু লেখা বার বার ফরাসী চিন্তার আকর হয়ে উঠেছে কিন্তু কখনোই প্রত্যক্ষভাবে কোন মতাদর্শকে মানবসমাজে চালান করার প্রয়াস হিসেবে নয়; বার বার আলোচিত হয়েছে অমেয়, অসম্ভব কিছু একটার দিকে দুয়ার খুলে দেওয়ার অতুলনীয় কাজ হিসেবে। লেখাকে তার নির্ণীত, যাচিত অবস্থান থেকে খুলে দেওয়ার অজানা মগ্ন চর্চা হিসেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিখ্যাত ফরাসী চলচ্চিত্র – 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোস' সিনেমার বাচ্চা ছেলেটি যখন একাকী বালজাকের একটা উপন্যাস পড়ে তখন তার জীবনের শত শত অসংগতি ও অপূর্ণতা সত্বেও সেই পাঠের মুহূর্তটি সিনেমায় অনির্বচনীয় এক ধরণের স্থিরতা এনে দেয়। দর্শককে মগ্ন করে। একধরনের অসহায়তা থাকে যেন সেই দৃশ্যের মধ্যে। মনে হয় এই অনুভূতির মধ্যে দিয়ে আসলে এক অমেয়তার হদিশ আছে হয়ত। হয়ত কথাটা খুব জরুরি কারণ বালজাককে কেউ এভাবে নাই পড়তে পারেন।

এরকম অপরিপেক্ষিতের তর্কের আলোতে নাও পাঠ করতে পারেন। যদিও এ-প্রসঙ্গে আমরা যেন ভুলে না যাই রোঁলা বার্থের বিখ্যাত লেখা, যা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বিগত দুই-দশক ধরে উত্তরকাঠামোবাদী ফরাসী তত্ত্বের প্রতিনিধি স্থানীয় লেখা হিসেবে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় – “Death of the author’ এবং ‘S/Z’ – নামক লেখাগুলি বালজাকের সাহিত্য নিয়ে লিখিত দুটি লেখা। বাজাকের সাহিত্যে এতটাই বেশি অ-পরিপেক্ষিত-কে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, যে ‘অথরের মৃত্যু’[২০২]-কে যথাযথ বিশ্লেষণে দেখানোর ক্ষেত্রে, বালজাক অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে বার্থের। রোঁলা বার্থের “Death of the Author” – লেখাটি অন্তত বাংলা বিদ্যাচর্চা মহলে বেশ অনেকখানি পরিচিত একটি লেখা। যে কোন লেখার কি অর্থ – তা আসলে লেখকের বা এক্ষেত্রে Author-এর উপরে নির্ভর করে না, লেখাটিকে কেমন করে পাঠ করা হচ্ছে, লেখাটির আখ্যান কিভাবে লেখার অথের বিকেন্দ্রীকরণ করে দিতে সক্ষম - মূলত সেই বিষয়েই বার্থের ঐ লেখা। কিন্তু এই লেখার মধ্যে দিয়ে এরকমও একটা ধারণা উঠে আসতে পারে – তাহলে বোধহয় লেখক বলে আর কোন বিষয় নেই। যে কোন লেখাই আসলে অনাথ এবং কেবলমাত্র লেখা আর পাঠক (পাঠ্য আর পাঠক) – এর বাইরে পঠনের সন্দর্ভে আর কিছুরই প্রয়োজন নেই। বলাই বাহুল্য লেখকের জীবনীকেন্দ্রীক সমালোচনার বিরুদ্ধে, পাঠ্যের একমাত্রিক কর্তৃত্ব প্রধাণ অর্থের বিরুদ্ধে – বার্থের লেখা অমোঘ দাওয়াই হিসেবে কাজ করেছিল কিন্তু মুক্ত বাজারের উপমার মত মুক্ত পাঠের একটি দ্বায়হীনতার পরিসরও খুলে দিয়েছিল যেন। এই লেখাটির পাশাপাশি একই সময়ে লিখিত আরেকজন ফরাসী তাত্ত্বিক মিশেল ফুকোর “What is an Author”[২০৩] – নামক লেখাটির কথাও আমাদের উল্লেখ করা উচিৎ। এই লেখাটি আসলে – “Discource” বা সন্দর্ভের ধারণার প্রেক্ষিতে “Author-function” – কে বোঝার চেষ্টা করেছে। বলা যেতে পারে – Author-এর এক ধরণের আবশ্যিক ক্রিয়াশীলতার একটি দিককে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছে। Author-এর সঙ্গে যে এক অর্থে কোন সন্দর্ভের অনুসন্ধানও জড়িয়ে থাকতে পারে সে বিষয়ে ফুকো আমাদের অবগত করেছেন। কিন্তু Author-এর কর্তৃত্বশীলতা ও তার দ্বারা পাঠ্যের একমাত্র অর্থের শিল মোহর সৃষ্টির বিরুদ্ধেই আসলে ফুকোও - বার্থের মতই একই ভাবে সচ্চার। তিনিও প্রকারান্তরে আসলে কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধেই লিখেছেন। এই মতামতের সঙ্গে স্বভাবতই আমাদের তর্কের আলাদা কোন বিরোধ নেই। আমাদের গবেষণার সামগ্রিক তর্ক-বিন্যাসের নিরিখে লেখকে আমরা বার আলোচনা করছি লিখনের প্রক্রিয়া ও তার দর্শণের নিরিখে। তফাতের জায়গা বলতে এইটুকুই। এছাড়া আরও একবার স্মরণ করে নেওয়া যায় বার্থ বা ফুকো নয় – আমাদের গবেষণায় লিখণের দর্শণ আসলে জাক দেরিদার চিন্তার দ্বারাই মূলত প্রভাবিত।

এই অংশের আলোচনা থেকে যদি সমাজ ও সংবিত্তির আলোচনার প্রসঙ্গটিকে স্মরণ করি – তাহলে অন্তত এটা বলা যেতে পারে - সমাজ বাস্তবতার বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা হোক, মগ্নতাই হোক বা দেখাই হোক, আসলে এর মধ্যে দিয়ে লেখা সরাসরি কোন বিশেষ মতাদর্শের পথে কোন সংবিত্তি বা সংযোগ আলাদা করে না চেয়েও হয়ত

[২০২] Roland Barthes, *Image Music Text*, Fontana Press, London, P-148

[২০৩] Foucault Michel, *The Focault Reader*, Pantheon Books, New York, 1979, P- 101-120

কোথাও কোথাও একভাবে সংযোগ ঘটিয়ে ফেলে। অর্থাৎ সেই অপরিমেয়ের দিকে চলে যাওয়ার মধ্যে কি লেখার কোন সংযোগের সম্ভাবনাও কাজ করে? সবক্ষেত্রে যে করেনা সে বিষয়টা আমরা বুঝতে পারি। কারণ ভিন্ন ভিন্ন, কখনও বা পরস্পর বিপরীত ধারণার মধ্যে দিয়ে হলেও আইয়ুব বা মার্কসবাদীরা উভয়েই যেন একভাবে একটা ধরণের লেখার পরিবর্তে আরেক ধরণের লেখার কথা ভাবছেন। যথার্থ ও অযথার্থ দু-ধরণের লেখার কথা ভাবছেন – তার মানদণ্ড, যাই হোক না কেন – এই দ্বিবিধ লেখা বিষয়ে দু-পক্ষেরই এক মত এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই সাহিত্য-মূল্য অর্জনের - নজিরগুলো হয়ত ভীষণ স্পষ্ট কিন্তু সেই সাহিত্য লেখার কাজটা ঠিক কেমন সে বিষয়ে উভয় পক্ষেরই নানা রকমের মতানৈক্য, বিচার, বিভেদ, স্ব-বিরোধ রয়েছে। যেটা থাকাটাই স্বাভাবিক। আমরা এখান থেকে শীতাংশু মৈত্রের লেখাটির দিকে যাওয়ার আগে, একটাই কথা স্পষ্টাক্ষরে বুঝে নিচ্ছি তাহলে যে, উভয় পক্ষের ক্ষেত্রেই সাহিত্যের সঙ্গে বা সাহিত্যের মূল্যের সঙ্গে জড়িত সংযোগের একটা জটিল রহস্য আছে। সেটা আইয়ুব, আঙ্গিকবাদ বা রসবাদ অর্থেই বলি কিংবা মার্ক্সবাদী আলোচনায় যে জটিল একটা প্রগতি ও মানব-চৈতন্যে প্রভাব বিস্তারের ধারণার কথা বললাম যে অর্থেই বলি - উভয়ের ক্ষেত্রেই যেন একটা লেখার একটা বিশেষ রকমের না হওয়া এবং একটা অজানা কিছু হওয়ার প্রসঙ্গ আছে। এর মধ্যে দিয়ে আমরা এই দুই বিবদমান পক্ষের ভিতর যেন একটা সংযোগের আভাসও পাচ্ছি। সংযোগ কথাটির চেয়েও সম্বন্ধ কিংবা সম্পর্ক শব্দটি বেশি উপযুক্ত বলে মনে হয়। এই সবকটি শব্দেরই হয়ত ধাতুগত কিছু না কিছু গুণাগুণ থাকবে, বিনির্মাণবাদীরা শব্দের ধাতু-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিভাষা নির্ণয়ের পক্ষপাতী – আমি এক্ষেত্রে কোন শব্দকেই নির্দিষ্ট অর্থে পরিভাষা হিসেবে দাবি করতে চাইনা – সম্বন্ধ, যোগ, সংযোগ, সম্পর্ক – এই নানান শব্দ যে ধরণের ধারণা আমাদের দিতে পারে – সেই ধারণাটুকুকে আমাদের তর্কের মধ্যে দিয়ে ধরিয়ে দেওয়াই, আমাদের লক্ষ্য। সংযোগের নির্ণায়ক কোন তর্ক আমরা কতখানি তুলে ধরতে পারি তা বলা শক্ত – আমাদের গবেষণা আসলে সম্মিলনের ইশারা নির্দেশক। নির্ণায়ক কোন কিছু নয়, কিন্তু সেই ইশারার শর্তে বাংলা আধুনিক সাহিত্য তথা, লেখার কাজের বিশ্বজনীন তর্ককে পাঠ করার মধ্যে কিছুটা হলেও নতুনত্ব থেকে যাবেই বলে আশা করি। আমাদের আলোচনা ক্রমশ এই প্রশ্নটাকেই উদ্দেশ্য করতে করতে চলেছে। নিজেকে একটা বিশেষ ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে সংকীর্ণ করা নয়। নিজেকে একটা বিশেষ ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে মেলে ধরা। অর্থাৎ এ যেন কোন একটা লেখার একটা নির্দিষ্ট সংযোগের উদ্দেশ্যেই যাত্রা কিন্তু সে যাত্রার উদ্দেশ্যে সে নিজেকে পথহারা করে দেয়, খুলে দেয় - এমন করে খুলে দেয়, যেন লেখক-ই আর না থাকে।

শীতাংশু মৈত্র তার 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' - লেখায় সেই স্বাভাবিক প্রশ্নটি করেছেন যেটা আইয়ুবের লেখার ক্ষেত্রে খুব অনায়াসেই আসে সেটা হল যে একটা সাহিত্য - ফলিত না চরম মূল্যের অধিকারী সেটা বিচার করা প্রায় দুঃসাধ্য একটা ব্যাপার। ধারণাগত ভাবে এরকম একটা বিভাজন করলেও আসলে কি ওরকম হাতে নাতে দেখানো সম্ভব ? কোন সাহিত্য কিভাবে পঠিত হচ্ছে, কোথাও সেই দিকটার কি কোন মূল্যই নেই। এই

প্রশ্নটাকেই শীতাংশু মৈত্র অন্যভাবে রাখার চেষ্টা করছেন যে আসলে সাম্যবাদীরা ওরকম কোন মূল্য বিভাজনকে মানেননা - ওগুলো বুর্জোয়া নির্মাণ। বলতে চান জনতা নিজের সাহিত্য চিনে নেবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ওনার লেখা এখানে উদ্ধৃতি হিসেবে রাখছি -

"সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং কোন ক্ষেত্রেই তাই উপকরণ এবং পরম মূল্যে সাম্যবাদীর পক্ষে পার্থক্য না থাকায় আইয়ুব সাহেব এবং রসবাদীদের উদ্ভট আবিষ্কার 'বিশুদ্ধ' সাহিত্য সাম্যবাদীর বিচারে কর্মবিমুখ, প্রতিক্রিয়াশীলদের গণজাগরণকে পর্যুদস্ত করবার, চিরন্তনের দোহাই পেড়ে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের অপচেষ্টা মাত্র। তবে তাঁরা বিশুদ্ধ সাহিত্য-রসের ধোয়ায় সত্যের, শিবের সুন্দরের মূর্তি দেখতে থাকলেও জনতা তার নিজের তাগিদেই সাহিত্যের সত্যিকারের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হবেই।"[২০৪]

যে কথাটা আমরা আগেই বলছিলাম যে এখানেও আসলে প্রগতি সাহিত্য ও প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের একটা বিভাজন তলায় তলায় অস্পষ্টভাবে রয়েই গিয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা উপরেই অনেকখানি আলোচনা করেছি। শীতাংশু বাবুর প্রবন্ধটি আইয়ুবের চরম ও উপকরণ মূল্যের জল অচল বিভাজনের পুণর্বিশ্লেষণ হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই দুই প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর হিসেবে আইয়ুব বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য বলে আরেকটি প্রবন্ধ লেখেন। এখানে আইয়ুবকে যেন বড্ড বেশী একপেশে রকমের রসবাদী বা আঙ্গিকবাদী বলে মনে হতে পারে। উনি লিখছেন -

"মানবধর্মী কোনো শিল্পীর রচনায় সমাজগত ও শিল্পগত মূল্যের সাযুজ্য ঘটতে পারে; যদি ঘটে তবে তেমন রচনা আমাদের কাছে অত্যধিক সমাদরের বস্তু হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাই বলে আমি মানতে প্রস্তুত নই যে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক মূল্যবিচার একই জিনিস।"[২০৫]

আইয়ুব আরও কঠিন হয়ে বলবেন,

"বিশুদ্ধ সাহিত্যের অনুরাগীরা শেষপর্যন্ত ফলিত সাহিত্যের (উপকরণ) মূল্য স্বীকার করে নেবেন বলেই আমার বিশ্বাস। তবে হয়ত তাঁরা সাহিত্য নামে তাকে অভিহিত করতে রাজী হবেন না - "ফলিত" বিশেষণ দ্বারা গন্ডীবদ্ধ করা সত্ত্বেও। এতে আমার আপত্তির কারণ নেই, অধিকাংশের সম্মতি আছে এমন একটি নাম বাছাই করে নিলেই হবে।"[২০৬]

---

[২০৪] ধনঞ্জয় দাশ, *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, করুণা প্রকাশণী, ২০১৩, পৃ-৬৩১

[২০৫] ধনঞ্জয় দাশ, *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, করুণা প্রকাশণী, ২০১৩, পৃ-৬৪২

[২০৬] ধনঞ্জয় দাশ, *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, করুণা প্রকাশণী, ২০১৩, পৃ-৬৪২

কিন্তু একই সঙ্গে আইয়ুব এখানে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলিরও যথাযথ জবাব দিচ্ছেন –

"আমি কোথায় কবে অনড়, অচল চরম মূল্যের কথা বললাম ?...আমার প্রবন্ধের যা বক্তব্য তার পক্ষে চরম ও উপকরণ মূল্যের পার্থক্য নির্দেশ করাই প্রাসঙ্গিক ছিল। চরম মূল্য অচল কি চলিষ্ণু সে প্রশ্ন তুলবার দরকার বোধ করি নি।"[২০৭]

আরো বলছেন,

' "মার্ক্সিস্ট সাহিত্য = ফলিত সাহিত্য =অসত্য অশিব অসুন্দর সাহিত্য, এই equation টা কাগজে কলমে লিখে ফেললেই স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে?" হয়ে ওঠে না বলেই তো আমি এমন কোন ইকুয়েশন লিখি নি; অমরেন্দ্রবাবু কার লেখা থেকে সেটা উদ্ধার করলেন?"[২০৮]

কিন্তু আইয়ুব যাই বলুন উনি আসলে কেজো সাহিত্য হিসেবে একটা সাহিত্যের কথা বার বারই বলতে চাইছেন। এবং সেটাকে পরিশেষে মার্ক্সবাদীদের দিকেই ছুঁড়ে দিচ্ছেন। বলছেন -

"...যে কোনো সার্থক শিল্প-রচনা শ্রেণীসংগ্রামে সাম্যবাদী দলের কাজে লাগল কি না? রাজনৈতিক বিচারে তার প্রাধান্য থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের বিচারে সেটা গৌণ।"[২০৯]

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত থেকে আবারও দুটো সমস্যা বেরিয়ে আসছে, একটা হল যে রাজনীতিকে তাহলে কেবলমাত্র দলীয় রাজনীতির পরিসরেই আইয়ুব সীমাবদ্ধ হিসেবে দেখতে চাইছেন আর দ্বিতীয়ত রাজনীতিকে যদি একটা বৃহৎ অর্থে সংযোগের শর্তে দেখি, সম্পর্কের শর্তে দেখি তাহলে এখানে আমরা আগে যে এঙ্গেলসের পত্র বিষয়ক আলোচনাটিতে একরকমের অজানা সম্বন্ধ সাধনের কথা বলছিলাম সেই প্রসঙ্গের কথা আবার উল্লেখ করতে পারি। আমরা একভাবে জানি যে অবস্থানের শর্তে যে কোন শিল্প বা সাহিত্যেরই একটা শ্রেণীগত অবস্থান থাকতে পারে এবং এই অর্থে সেই শিল্প রাজনৈতিক। সেই অর্থে রাজনৈতিকতা তো বটেই, কিন্তু একটা অজানা সম্বন্ধ সাধন অর্থেও কি বিশুদ্ধ শিল্প রাজনৈতিক নয়? রাজনীতি কি এক অর্থে সম্পর্ক বিন্যাসের হদিশ নয়? এভাবেই ঘুরে-ফিরে আমরা আবার এই প্রসঙ্গটিতে আসব। আইয়ুবের অবস্থান নিয়ে আলোচনা শেষ করার আগে একটি কথা আমাদের স্মরণ করে নেওয়া দরকার, যে কথা আমরা আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি - তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে আইয়ুব - 'আধুনিকতাবাদী'-দের বিপরীতে রবীন্দ্রনাথের মঙ্গল-এর ধারণাকে রেখেছিলেন এবং সেই লেখায় আধুনিকতাবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষত বোদলেয়ারের লেখা বিষয়ে তাঁকে

---

[২০৭] ধনঞ্জয় দাশ, *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক,* করুণা প্রকাশণী, ২০১৩, পৃ-৬৪৫

[২০৮] ধনঞ্জয় দাশ, *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক,* করুণা প্রকাশণী, ২০১৩, পৃ-৬৪৫

[২০৯] ধনঞ্জয় দাশ, *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক,* করুণা প্রকাশণী, ২০১৩, পৃ-৬৪৬

অনেকখানি বাঁকা সমালোচনা করতে দেখা যায়। আপাতত এখানে কেবল এইটুকু বলে রাখা হল - এই প্রসঙ্গে আমরা পরে আবার ফিরব। আমরা সম্বন্ধের বিষয়ে বলছিলাম, সেটা নিয়েই আপাতত আমরা প্রবেশ করব জাক দেরিদার একটি লেখা-প্রসঙ্গে। এই লেখার কথা আমরা আগেও ছেঁড়া সুতোর মতো উল্লেখ করেছি। লেখাটির নাম *Psyche : Invention of the other.* এই লেখার প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে, আমরা আলগাভাবে ১৯৬৮ সালের এক্ষণ পত্রিকার, 'কার্ল মার্ক্স' সংখ্যার সম্পাদকের কথা অংশের দিকে তাকাই – কেন তাকাবো? কারণ আইয়ুব ও মার্ক্সবাদীদের ভবিষ্যৎ দর্শন ও মূল্য সংক্রান্ত তর্কাতর্কির মাঝখানে, আমাদের মনে করে নেওয়া প্রয়োজন – মার্ক্সবাদীরা কোন বিপ্লবের ধারনাকে তাত্ত্বিকভাবে অন্তত সামনে রেখে তর্ক করছিলেন?

'"I call revolution the conversion of all hearts and the raising of all hands in behalf of the honor of free man." - Karl Marx.

"The whole of Marx's world outlook is not a doctrine but a method. It does not yield any readymade dogmas, but shows the starting points for further inquiry and a method for this inquiry" – Friedrich Engels.'[২১০]

সমস্ত হৃদয়ের রূপান্তর এবং সমস্ত হস্তের উত্তোলন - মানুষের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বের স্বার্থে ঐ নির্দিষ্ট দুটি কর্মের কি অর্থ ? সেখানেই বিশ্লেষণ বা না বিশ্লেষণের অসংখ্য সম্ভাবনা। যেভাবে মার্ক্স বিপ্লবকে কল্পনা করেছেন – তাকে পড়লে মনে হয় – আপাদমস্তক উপমাবাচক কাব্য যেন। অথচ কাব্য সাধারণত না বলা কথার দোসর, মার্ক্সের এই বাক্যটি কিন্তু কথনে পরিপূর্ণ অথচ বার বার পড়তে থাকলে, পঠনের পুণঃপৌনিকতায় লিখনের শব ভেসে ওঠে – অর্থ হয়ে চলে ক্রমশ জটিল ও অস্বচ্ছ। মার্ক্স তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদের প্রাককথণে উল্লেখ করেছিলেন – ফরাসীরা কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করে[২১১] - কিন্তু ক্যাপিটাল পাঠ করার একটাই শর্ত – জটিলতাকে জটিলতার মধ্যে দিয়েই অনুধাবন করা, বুঝতে চেষ্টা করা – যেমন করে কোন এক পর্বতারোহী অসংখ্য নিরবচ্ছিন্ন সাধনার শেষে আলোকিত চুড়ায় উপনীত হয়। যেভাবে বিজ্ঞান অন্তহীন সাধনায় ব্রতী – তেমন করেই ক্যাপিটালকে পড়তে হবে। যে দেরিদার দর্শন নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, গত অধ্যায়ে – তাঁর মার্ক্স সংক্রান্ত গ্রন্থেও আমরা দেখতে পাই – উনি মার্ক্সের পাঠকে বেশি মূল্য দিচ্ছেন – মার্ক্স কিভাবে শেক্সপিয়ারের সাহিত্য পড়ছেন – কিভাবে হ্যামলেটের ব্যাখ্যা করছেন – সেই পাঠকে মার্ক্সের নিজস্ব অর্থনৈতিক তর্কের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা যায় কিনা – এমন এক নিবিড় জটিলতায় দেরিদা চলে যাচ্ছেন। আমরা তার ফলস্বরূপ কার্ল মার্ক্সের 'Commodity fetishism' – বিষয়ক অনুপুঙ্খ একটি তর্ককে পাচ্ছি দেরিদার গ্রন্থে। কাজেই যে কোন বিষয়কে কিভাবে একজন পাঠ করছেন – তার ভিত্তিতেই যেন মার্ক্সের

[২১০] এক্ষণ পত্রিকা, কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যা, ১৯৬৮ (পুণর্মুদ্রণ ২০১৮) পৃ- ৩৫৮

[২১১] Marx Karl, *Capital* (Vol-1), Foreign Language Publishing House, Moscow, P-21.

ক্যাপিটালের দর্শন, অর্থনীতির নজরটান, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং বিপ্লবের ধারণাও নির্ভরশীল। অর্থাৎ, দেওয়ালে লিখিত একটি স্লোগান – 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' – একেবারেই অর্থহীন একটি বামপন্থার বাতিক বলে মনে হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না, সেই কাজের যথাযথ বিশ্লেষণ, জটিলতা প্রেক্ষিত ইত্যাদির সন্দর্ভ রচিত হচ্ছে। রচনা শব্দটি এক্ষেত্রে লিখন বা লেখার থেকে বেশি শক্তিশালী। সন্দর্ভ বা ডিসকোর্স আসলে রচিত হয়, তার নানাবিধ রূপ থাকতে পারে – সংগ্রাম কিংবা থিয়েটার কিংবা সাহিত্য – যাই হোকনা কেন। সুতরাং এঙ্গেলস যে বিষয়টিকে নির্ধারণ করে দিতে চাইছেন – তা খুব গুরুত্বপূর্ণ – মার্ক্সের বিপ্লবের যে কল্পনা – তা মুক্ত কল্পনা – তাকে তার জটিলতার মধ্যেই পুণঃপুণঃ বিচার করতে হবে, কোন নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত নয়, কোন পাথুরে লিখন নয়। বিজ্ঞানের মতই এই কল্পনা ক্রমাগত মুক্ত-শীল, মুক্তিকামী। যদিও উল্লেখ্য যে, যেহেতু কোন বাঁধাধরা দার্শনিক পাথুরে লিখন বা গন্তব্য স্থির করে ফেলা মুশকিল – ফলত নানাবিধ জটিলতা ও সমস্যা বিপ্লবের ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মার্ক্স যেখানে যেখানে যতটুকু বিশ্লেষণ করেছেন – তার ভিত্তিতেই একটা 'ডগমা' তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এবং যথারীতি কমিউনিজম বিশ্বজুড়ে নানাভাবে ব্যর্থ হয়েছে, হয়েই চলেছে। সুতরাং শোধণবাদী মার্ক্সবাদীদের মত, আমাদের গবেষণা বিপ্লবের নতুন পথ খুঁজতে নামবে – এরকম দুঃসাহসিক কোন সদিচ্ছা আমাদের নেই। যারা সেগুলি নিয়ে ভাবেন – সেই ভার তাঁদের উপরে ছেড়ে দেওয়া যাক। আমরা আবার ফিরে যাই, আমাদের তর্কে। তাহলে মার্ক্সের ভবিষ্যৎ চিন্তার মধ্যে যে ধোঁয়াশা তথা খামতি সেই খামতি থেকেই প্রকারান্তরে, নানা বিধ মার্ক্সবাদী তর্ক বিতর্ক এবং সেই বিপ্লবচেতনাকে মাথায় রেখেই আইয়ুবের সঙ্গে মার্ক্সবাদীরা তর্ক করছেন – সে বিষয়ে আমরা আরও নিশ্চিত হচ্ছি এখানে এবং মানবতা বিষয়ে পূর্বের অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি – মানবতাবাদের স্বীকৃতি কিংবা অস্বীকৃতি কোন সহজ সরল সমীকরণ নয় – নানাবিধ তর্কের সমাহার বিশেষ – যে তর্ক আকারে কিংবা প্রকারে মানবতার প্রেক্ষিতকে জিয়িয়ে রাখতে বাধ্য হয়।

দেরিদা ও ভবিষ্যৎ-চিন্তা

যেখান থেকে সরে গিয়ে উপরোক্ত আলোচনায় প্রবেশ করেছিলাম সেই লেখাটির নাম *Psyche : Invention of the other.* এই লেখার ক্ষেত্রেও সম্বন্ধ হল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিচার্য বিষয়। সিসেরোর পিতাপুত্র সংলাপ, পল ডি ম্যানের অ্যালিগরির আলোচনা এবং কবি ফ্রান্সিস পঁজ-এর 'ফেবেল' নামক একটি রচনার আলোচনাই হল এই লেখার প্রধান বিষয়বস্তু। এর মধ্যে দিয়েই দেরিদা আসলে বলছেন আবিষ্কার ও নতুনত্ব বিষয়ে। সাহিত্যের একটি বড় মাপকাঠি থাকে নতুনত্বের হাতে। হয়ত আইয়ুব যে বিশুদ্ধতার কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে এই নতুনত্বের ধারণাগত একপ্রকারের মিলও আছে। এই লেখায় দেরিদা তথাকথিত আবিষ্কারের ধারণাকে বলছেন - 'techno-

onto-anthropo-theological' এবং বলছেন যে - "Invention begins by being susceptible to repetition, exploitation, reinscription"[২১২]

আরও বলছেন -

'The very movement of this fabulous repetition can, through a merging of change and necessity, produce the new of an event'[২১৩]

নতুনত্ব বা পরিবর্তন প্রসঙ্গে দেরিদার iterability-র ধারণা কারুরই অবিদিত নেই। এই ধারণা অনুসারে প্রতিটি পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রেই একটা অপরতার একটা নতুনত্বের সম্ভাবনা খুলে যায়। কিন্তু ঐ 'merging of change and necessity' কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওর মধ্যেই আসলে দেরিদার বিখ্যাত দিফেরঁস-র ইঙ্গিত আছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল এই Invention -এর ধারণার সঙ্গে দেরিদা coming -এর ধারণাকে জুড়ে নিচ্ছেন - 'the action of coming upon or finding'. কিন্তু এটা করতে গিয়ে দেরিদা অবশ্যই ওনার নিজের দার্শনিক অবস্থান বা বলাচলে উপস্থিতের অধিবিদ্যার দর্শনের সমালোচনা বা বিরুদ্ধাচরণের কথা কখনোই ভুলছেন না। তিনি লিখছেন -

'If today it is necessary to reinvent invention, it will have to be done through questions and deconstructive performances bearing upon the traditional and dominant value of invention, upon its very status, and upon the enigmatic history that links, within a system of conventions, a metaphysics to techno science and to humanism.'[২১৪]

কিন্তু সেই মর্মে সচেতন থেকেও দেরিদা একটা আগমনের কথা বলছেন। কার আগমন এ? দেরিদা বলবেন অপরের আগমন। যেন এই আত্মানুসন্ধান একই সঙ্গে অপরানুসন্ধানও বটে। আত্ম আবিষ্কারের প্রশ্নটা, অপরাবিষ্কারের থেকে আলাদা কোন প্রশ্ন নয় এবং উভয়ের সংযোগের কথাই যেন দেরিদার আসলে বলবার কথা। যথারীতি আপন ভঙ্গিমায় তিনি বলেন -

“The other is indeed what is not inventible and it is then the only invention in the world, the only invention of the world, our invention the invention that invents *us*. For the other is always another origin of the world and we are (always) (still) to be invented. And the being of the *we* and Being itself. Beyond Being."[২১৫]

---

[২১২] Derrida Jacques, *Acts of Literature*, Stanford University Press, 2007, P-316

[২১৩] Derrida Jacques, *Acts of Literature*, Stanford University Press, 2007, P-340

[২১৪] Derrida Jacques, *Acts of Literature*, Stanford University Press, 2007, P-339

[২১৫] Derrida Jacques, *Acts of Literature*, Stanford University Press, 2007, P-341

ঠিক এখানেই We-র কথাটা আলোচিত হল। এটাই দেরিদার বলার কথা ছিল। বিষয়ীর তর্ক আমাদের আলোচনার বিষয় নয়, কিন্তু আমরা সেই তর্কের আন্দাজ পেতে পারি খানিকটা এখান থেকে। যে আত্মানুসন্ধান আসলে অপরানুসন্ধানও এবং আরও যথার্থ করে বললে - 'আমাদের' অনুসন্ধান। লিখনের ক্ষেত্রেও কি এর ব্যত্যয় সম্ভব? না সম্ভব নয়। বরং দেরিদা বলবেন লিখনই যথার্থ (ভয়ঙ্কর) উদাহরণ এই বিষয়টিকে বুঝবার ক্ষেত্রে, জানবার ক্ষেত্রে। আগমনের যে প্রসঙ্গটাকে লিখন সংকীর্ণ অর্থে একটা পরিমাপের মধ্যে আঁটিয়ে নিতে চায়, তার বদলে উনি বলবেন যে কখনোই 'আগমন'-কে সংকীর্ণ সম্ভাবনার মধ্যে আঁটিয়ে তোলা উচিৎ নয়। কারণ যে আমরার আবিষ্কারের কথা আমরা ভাবতে পারি, সেই আমরা আসলে 'another we'-

'It is another we that is offered to this inventiveness' [২১৬]

দেরিদার ভাষ্যে যদি ভাবতে যাই তাহলে দেখব যে উনি হয়ত বলবেন - সাহিত্য আসলে অপরের জন্য দুয়ার খুলে দেওয়া - অপরকে , অজানা কে, আবিষ্কার করা। এমন করে অপরকে আবিষ্কার করে যেন এটাই জগতের একমাত্র আবিষ্কার, জগতের অন্য এক উৎস আবিষ্কার (another origin of the world কথাটা দেরিদা ব্যবহার করেন) এবং এর মধ্যে দিয়ে আসলে অন্য একটা 'আমরা'র আবিষ্কার। এই আমরা'র আবিষ্কার প্রসঙ্গেই যেন লিখনের সঙ্গে আগমনের একটা সম্বন্ধ এবং সেই অর্থে অবধারিত ভাবে ভবিষ্যতের একটা সম্বন্ধ। দেরিদার ভাষায় 'Future to come'. যাইহোক আসল যে কথাটা বলার সেটা হল - আমরা আইয়ুবের বিশুদ্ধ সাহিত্যের ধারণার ভিতর যে অবধারিত অজানা সংযোগের কথা বলছিলাম, সেটা কিন্তু আসলে দেরিদার এই লেখায় একভাবে ধরা যাচ্ছে। আইয়ুব হয়ত বেশ খানিকটা সংকীর্ণ অর্থে এরকমই একটা কিছু খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু উনি যে জিনিসটা বুঝতে পারেননি বা নির্দেশ করতে পারেননি, যেটা মার্কসবাদীদের তর্কের মধ্যে যথার্থ ভাবে ছিল এবং তা নিয়ে আমরা আগের অধ্যায়ে এবং এই অধ্যায়ের শুরুর দিকে বেশ খানিকটা আলোচনা করেছি সেটা হল - ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ। দেরিদা তাঁর লেখায় একভাবে সাইকি প্রসঙ্গে বলার চেষ্টা করছিলেন আমরা লিখনের ক্ষেত্রে সেটা একভাবে বুঝবার চেষ্টা করলাম। এবার এই পর্যন্ত যতটুকু আলোচনা হল তা থেকে লেখার কাজের সামগ্রিক একটি চিত্র আন্দাজ করবার ক্ষেত্রে - আরও কয়েকটি অনুষঙ্গের পুনরায় আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে - ১. সৃজন ২. ভবিষ্যতের আগমন ৩. সম্বন্ধ বা সংযোগকে অন্যভাবে দেখার প্রচেষ্টা এবং সেই অর্থে মূল্যতত্ত্বের দু-একটি দিকের আলোচনা। ৪. অ(ন)ভিজ্ঞতা ও লিখনের শ্রমের পারস্পরিক সম্পর্ক। ৫. অবশ্যই লেখকের ভূমিকার প্রসঙ্গ। এটাকেই দেরিদার অন্য আরেকটি লেখা দিয়ে আরেকভাবে বুঝবার চেষ্টা করি - লেখাটার নাম *Given Time : The Time of the King.* যদি বলি যে লেখা কিভাবে অসম্ভবের দিকে উন্মুক্ত হতে পারে তাহলে এই লেখার প্রারম্ভের উদ্ধৃতিটি নিয়ে আলোচনা করতে হয় –

---

[২১৬] Derrida Jacques, *Acts of Literature*, Stanford University Press, 2007, P-342

দেরিদা তার বিশ্লেষণের শুরুতেই rest শব্দটা ধরে এগোতে চাইবেন, বলবেন যে সব কিছু দিয়ে দেওয়ার পরেও কিভাবে কিছু এটা বাকি থাকতে পারে? এখানে আমরা দুটো খুব অদ্ভুত প্রশ্নের সম্মুখীন হই -

১। rest- দান করার অর্থ আসলে কি? কিভাবে কেউ বাদবাকিটুকু গ্রহণ করতে সক্ষম হতে পারে যখন সবটুকুই দান করা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে? এখানেই দেরিদা আসলে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণার কথা একই সঙ্গে বলবেন, আসলে তাঁর তর্কটা এখানে একভাবে চলছিল লাকাঁর ভালোবাসার ধারণার সঙ্গে। কিন্তু তা বাদেও মার্সেল মস এর উপহারের ধারণাটিই এখানে প্রধান আলোচ্য। যেন এই দান, একভাবে প্রকৃত উপহার দেওয়ার মতই। উপহার যেন দেওয়া নেওয়া সম্বন্ধের বাইরের একটা কিছু । এই বাইরের বলতে উনি আসলে বলতে চাইবেন, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান বৃত্যের বাইরে। কিন্তু কিভাবে উপহার দেওয়া নেওয়ার বাইরে চলে যেতে পারে? হতে পারে যদি একমাত্র যে দিচ্ছে এবং যে নিচ্ছে উভয়ের কেউই উপহার বিষয়ে সচেতন না থাকে। দেওয়া নেওয়ার অর্থনীতির অজান্তেই এমন এক দানের খেলা খেলা হয়ে যায়, যার পরিমাপ হয়ে ওঠেনা যেন। দেরিদা লিখছেন –

"For there to be gift, not only must the donor or donee not perceive the gift as such, have no consciousness of it, no memory, no recognition; he or she must also forget it right always...and moreover this forgetting must be so radical that it exceeds even the psychoanalytical category of forgetting"[২১৭]

এই তত্ত্বায়নের মধ্যেই আসলে অসম্ভবের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। একটা অসম্ভব কিছুর দান। এর সঙ্গে আবার ভবিষ্যতের আগমনের প্রসঙ্গটাকেও মিলিয়ে পড়তে অসুবিধা হয়। যেন একটা অসম্ভবের আগমন।

যাইহোক, আমরা আলোচনা করছিলাম দেরিদার দান বিষয়ে। এ নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ তর্ক আছে দেরিদার লেখায়। কি দান করা হচ্ছে? সময় দান করা হচ্ছে। সব সময়টা দান করার পরে যা পড়ে থাকে, সেটা দান করা হচ্ছে। সমস্ত সময় দান করার পর কিভাবে সময় পরে থাকতে পারে? সময় যদি না পড়ে থাকে তাহলে কি পড়ে থাকছে - দেরিদা প্রশ্ন করেন কি পড়ে থাকে -

"Here Madame de Maintenon is writing, and she says in writing, that she gives the rest. What is the rest?"[২১৮]

একজন ‘নারী’ - সে তাঁর সমস্ত সময় একজন সন্ন্যাসীকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। তাঁকে তার সময়টা রাজাকে দিতে হয়েছে। আর বাদবাকি সময়টুকু, সমস্ত সময় দিয়ে দেওয়ার পরে যেটুকু বেঁচে থাকে, তাই তিনি দিয়েছেন সন্ন্যাসীকে। কি সেই বাকী? কি বাকী থাকে সব দিয়ে দেওয়ার পর ? সেই অজানা বাকীটুকুই যেন

[২১৭] Derrida Jacques, “Given Time : Time of The King”, trans. Peggy Kamuf, *Critical Inquiry* 18, no. 2(1992), P-174

[২১৮] Derrida Jacques, *Acts of Literature,* Stanford University Press, 2007, P-161

অপরিমেয় সময় এখানে। যে সময় পরিমিতির বাইরে চলে গেল। এখান থেকে সরাসরি একটা আলোচনা চাইলেই মার্ক্সের উৎপাদন ও মূল্যের আলোচনায় চলে যেতে পারে - উদ্বৃত্ত মূল্য ও 'বাকী'-র সম্পর্কের আলোচনায় চলে যেতে পারে। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি – দুটি তর্ক নিজের নিজের অবস্থানে থাক – মিলিয়ে দেওয়াটা আমাদের কাজ নয়। আমরা প্রকারান্তরে আন্দাজ করে নিতে পারছি যে -ইশারাটা কোন দিকে যেতে চলেছে। তবু দেরিদার যুক্তিতে আসলে অপরের আগমন, অসম্ভবের আবিষ্কার, ভবিষ্যতের উপহার সমস্তটাই একধরণের ধারণা রূপকের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে যেন। একধরণের অপরিমেয়তার দিকে নির্দেশ করতে থাকে যেন। লেখার কথা উঠে আসে একই সঙ্গে , Madame de Maintenon -আসলে লিখছেন। লেখার অর্থনীতিতে সময়ও কি এমনি পরিমেয়-অপরিমেয়ের দ্বন্দ্বে ছিন্ন-ভিন্ন - যেমনটা শ্রমে, যেমনটা ভালোবাসায় কিংবা সৃজনে ? এই অসম্ভাব্যতাকে নির্দেশ করা হয় বা লেখায় নিজেকে মেলে ধরার প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করা হয় - 'Transcendental' দর্শনের দিক থেকেই। দেরিদা এই বিষয়টিকে দেখতে চাইছেন কিন্তু প্রচলিত অর্থে একেবারেই নয়[219]। কি অর্থে উৎক্রান্তীধর্মী তা প্রথম অধ্যায়ে খানিকটা আলোচনা করেছি – ইহুদি দার্শনিক ইমানুয়েল লেভিনাসের দর্শন ও দেরিদার অপরের দর্শন প্রসঙ্গে উত্তরণধর্মীতার প্রসঙ্গ আমরা পুনর্লিখনের চেষ্টা করব আবার।

তাহলে এখানে একদিকে যেমন উপহারকে সম্ভবপর করে তোলার জন্য ভুলে যাওয়ার বিষয়টা জরুরি হচ্ছে ঠিক তেমনি জরুরি হচ্ছে - অপরাবিষ্কারের প্রসঙ্গে সংযোগের কথাটাও। অন্য আমরার আবিষ্কারের কথাটাও। অর্থাৎ এই আবিষ্কার দেওয়া নেওয়া, চাওয়া পাওয়া, ইত্যাদি চেনা জানা অর্থনীতির বাইরে বা বলা চলে, তেমন বিপরীতযুগ্মপদ-শালী কর্তৃত্বপ্রধাণ অর্থনীতির প্রকৃষ্ট বি-নির্মাণের মধ্যে দিয়েই সাক্ষাত-যোগ্য। আর যেহেতু তা পরিমাপের 'অতীত', সেহেতু তা অসম্ভব, অনির্ণেয় – কখন কেমন ভাবে আগমন হয় – তা অজানা। তাহলে লিখনের এই উন্মুক্ত হওয়ার দিকে যেমন সংযোগের সম্ভাবনার কথাটা থাকছে অপরদিকে তেমনি ভবিষ্যতের অসম্ভাব্যতার দিকটিও একভাবে থাকছে। শর্ত হিসেবে কেবল একটাই জিনিস থাকছে যে লিখনকে ঐ কেনা-বেচার গণ্ডীর থেকে উপহারের দিকে বা সংকীর্ণ অর্থনীতি থেকে সাধারণ অর্থনীতির দিকে নিয়ে যাওয়ার দায় থেকে যাচ্ছে লেখকের। ধারণাটি ভীষণ বিমূর্ত – তাই লেখার কাজ, রোজকার ফ্যালনা বড়লোকি আলস্যের কাজ নয়, মানিক একে বলেছেন – "সাধনার শ্রম"– সত্যিই এ এক সাধনা। 'দায়' কথাটা দেরিদার দর্শনে নানা জায়গায় নানা ভাবে ফিরে এসেছে, গত অধ্যায়ে অ্যাট্রিজের আলোচনার প্রসঙ্গেও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি আমরা। দেরিদা বার বারই বলবেন – 'Responsibility for the other' -এর প্রসঙ্গে। লেখার কাজের ক্ষেত্রে সে দায় ঠিক কেমনতর, তা আমরা একরকম করে বুঝতে পারছি হয়ত এখানে। লেখকের, সাহিত্যিক উদ্বৃত্তের প্রতি দায়, নিজেকে উন্মুক্ত করার দায়। এপ্রসঙ্গে আমরা একটু পরে ফিরব আবার এখানে যে Self of the writer –এর প্রসঙ্গ –

---

[২১৯] অর্থাৎ, উপস্থিতির অধিবিদ্যক বিজ্ঞাণে যেভাবে ধর্ম কিংবা অন্যান্য আধ্যাত্মবাদে উত্তরণের নানাবিধ ধারণা আছে, দেরিটা ঠিক তেমন করে হয়ত ভাবতে চাইবেন না। কারণ অধিবিদ্যার প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধেই দেরিদার দর্শণের প্রধাণ যাত্রা।

বোদলেয়ারের আলোচনা প্রসঙ্গ, আইয়ুব কি অর্থে বোদলেয়ারের সমালোচনা করেছিলেন এবং আমরা কিভাবে আইয়ুবের সীমাবদ্ধতাকে পড়ছি সেটা দেখব পরে - ঐ self of the writer প্রসঙ্গেই সে তর্ক উন্মোচিত হবে। আমাদের তর্কগুলি ক্রমশ একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে – এটা বি-নির্মাণবাদী চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । যত যুক্তি এগিয়ে যেতে থাকে, ধারণা রূপকগুলি একে অন্যের স্থান বদল করতে করতে তফাৎ এবং থাকবন্দিশ মুছে ফেলে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করে ক্রমাগত।

আপাতত দেখেনি যে উপহারের সম্ভাবনার সঙ্গে অপরের আবিষ্কারের সম্ভাবনাকে যেভাবে এক সূত্রে পাঠ করছিলাম, ঠিক সেইভাবে কি করে - ভবিষ্যতের আগমনের বিষয়টিকে পাঠ করতে পারি লিখনের ধারণার সূত্রে। Drucilla Cornel-এর 'Derrida : The Gift of the Future' লেখাটির কথা। এখানে আসলে Drucilla, দেরিদার Future to come -এর ধারণাটিকে আরও খানিকটা ভেঙে নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। Drucilla নেলসন ম্যান্ডেলার ন্যায়ের ধারণা আলোচনার প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন 9/11-র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের ঘটনা। যার পর, দেরিদার উপদেশে – শান্তি কমিটি গঠনের স্মৃতিকেও ফিরে পাঠ করেছেন। এই অংশে কর্নেল - নেলসন ম্যান্ডেলার সমর্পণ ভঙ্গিমার কথা বলেছিলেন এবং একটা অসম্ভব কিছুকে পারফর্ম করার কথা বলেছেন -

"By not exercising our responsibility, we can politically and ethically foreclose what is philosophically impossible to disavow"[২২০]

কর্নেলরা যে 'Peace group'-এর কথা ভাবছিলেন, দেরিদা বার বার বলতে চান যে – সেই group-এ Future শব্দটা যেন অবশ্যই থাকে -

"Derrida insisted that we must somehow incorporate the word 'future' into the name of the group."[২২১]

এবং সেই Future-টা ধারণাগত ভাবে ঠিক কিরকম? একদিকে যদি Given Time- লেখাটির সঙ্গে আমাদের লিখনের ধারণাটিকে আমরা পড়ে নিতে চাই তাহলে অন্যদিকে ভবিষ্যতের ধারণাটি কেমন করে তার সঙ্গে এসে জুড়তে পারে? এই বিষয়ে -

"a timeliness still in making"[২২২] কথাটা বলেন কর্নেল।

---

[২২০] Cornell Drucilla, (Ed.Costas Douzinas), *Adieu Derrida* (Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007), P-103

[২২১] Cornell Drucilla, (Ed.Costas Douzinas), *Adieu Derrida* (Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007), P-103

[২২২] Cornell Drucila, (Ed.Costas Douzinas), *Adieu Derrida* (Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007), P-107

এই বাক্যটিই হয়ত সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বাক্য। ভবিষ্যৎ আগমনের ক্ষেত্রে এবং লিখন যেন একভাবে এর প্রতিই দায়বদ্ধ। সচেতন ভাবেই যে তা নাও হতে পারে - উপহারের মত, উদ্বৃত্তের অনুষঙ্গকে উদ্দেশ্য করে, General economy of writing -এর দিকে বার বার ধেয়ে যেতে চেয়ে। এক অজানা সংযোগ আবিষ্কারের দায়বদ্ধতাই যেন লিখনের একমাত্র শর্ত। লেখার একমাত্র কাজ। এ যেন এক অ(ন)ভিজ্ঞতার দায়ভার। আরেকটি সূক্ষ্মতর ব্যাখ্যায় এভাবেও ভাবা যেতে পারে – যে, এই 'timeliness' শব্দটি কি – সময়ের সত্তা বোঝাতে? অর্থাৎ 'timeliness' – বলতে কি 'essence of time'- বোঝানো হচ্ছে ? সেটা কি? ভীষণই বিমূর্ত কিছু হয়ত। যদি এভাবে পাঠ করি, তাহলে এই তর্ক আমাদের পরিমাপের উদ্বৃত্ত শ্রম সময় অথবা অ(ন)ভিজ্ঞতা – ইত্যাদির দিকে ঠেলে দেয়।

এখানে কর্নেল একধরনের নৈতিকতার প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে Kant - এর Critique of Judgment এর প্রসঙ্গ বলছেন এবং একভাবে এই Futurity-r ethics -এর প্রকৃতিটাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন।

"But he does not present himself in the view of a justification, which will follow his appearance. The presentation of the self is not in the service of the law, it is not a means. The unfolding of this history is a justification; it is possible and has meaning before the law. He is only what he is, he, Nelson Mandela, he and his people, he has presence only in this movement of justice."[২২৩]

ম্যান্ডেলার একটা ethical, submissive gesture -এর কথা বলবেন এখানে ড্রুসিলা। এটার মধ্যে যেন একভাবে অজানা সংযোগের প্রতি submission-এরও একটা gesture আছে। ভবিষ্যৎ দর্শন আছে যেন। এখানে ড্রুসিলা মর্লিউ পন্টির কথাও বলবেন -

"What is visible a trace of the invisible"[২২৪].

কর্নেল দেখাচ্ছেন, যে দেরিদা লিখেছিলেন –

'It is this injunction that "we must act now", that is perhaps to forcefully felt at the moment of his death. For this now this injunction we must act immediately, is inseparable from Derrida's own thinking on death. As derrida writes:

---

[২২৩] Cornell Drucila, (Ed.Costas Douzinas), *Adieu Derrida* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), P-104

[২২৪] Cornell Drucila, (Ed.Costas Douzinas), *Adieu Derrida* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), P-106

'Only a mortal can speak of the future in this sense, a god could never do so. So I know very well that all of this discourse - an experience, rather - that is made possible as a future by a certain imminence of death.'[২২৫]

উপহারের সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্কের কথা আমরা দেরিদার অন্যান্য লেখায় অনেকবার পাই এবং এই মরণশীল কিছু একটাই বোধহয় পারে নিজেকে general economy-র দিকে সংযোগের দিকে মেলে ধরতে। সেটা দেরিদা বার বার বলবেন। এই প্রসঙ্গে writer এর self এর কথাটা আমরা মনে করতে পারি। নশ্বর কিছু একটা, উদ্বৃত্তের তরে নিজেকে যে হারিয়ে ফেলতে চায়, তারই মধ্যে দিয়ে যেন তার একটা এমন ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা যার নৈতিক আগমন লিখনের ভয়ঙ্কর বৈকল্পিক চরিত্রের মধ্যে ঝলসে ওঠে। এতেই তার মহত্ব, এই যেন তার অতিলৌকিকতা। কিন্তু একেবারে হাতে কলমে একজন লেখক তাহলে কি করেন? এ বিষয়ে মানিক তার লেখকের কথায় নানা রকমের সমালোচনা করেছেন, লেখকের অলৌকিক কোন ক্ষমতার বিরুদ্ধে বা মহত্ত্বের বিরুদ্ধে। তার জন্য লেখক কেবল একটা নিমিত্ত মাত্র। তার পরিশ্রম, তার নানা বিবিধ গুনাগুণের কথা বলে থাকলেও মানিক কোন লেখকের কোন অলৌকিক শক্তির কথা মানতে চাননি। 'লেখকের কথা'-র থেকে কিছুটা আলোচনা আমরা প্রথম অধ্যায়ে করেছিলাম, উক্ত প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের প্রেক্ষিতে লেখকের আত্মসত্তার নিরিখে, গ্রন্থটিকে আরেকবার ফিরে দেখা যাক। বলাই বাহুল্য আমরা এখানে মানিককে তাঁর মার্ক্সবাদী প্রেক্ষিত থেকে কিছুটা ছিঁড়ে নিয়ে, আমাদের মতন করে পাঠ করবার প্রচেষ্টা করব –

"বাড়িতে লুকিয়ে লেখার চেষ্টাও আমি কখনো করিনি। আমার অধিকার নেই বলে।"[২২৬]

অথবা,

"ওই মুখগুলো আমার মধ্যে মুখর অনুভূতি হয়ে চেঁচাত – ভাষা দাও – ভাষা দাও আমি কি জানি ভাষা দিতে?"[২২৭]

লিখনের প্রতি লেখকের এই নিবেদন, এই ব্রতী মনোবৃত্তি – সাধারণ নয় একেবারেই। খেয়াল করে দেখার - লেখক এখানে অসাধারণ কিন্তু তা ঠিক এই কারণে নয় যে, তিনি ছেলেবেলা থেকেই পাতার পর পাতা মহাকাব্য লেখার ক্ষমতা রাখেন। একধরণের চেতনা, একধরণে আবশ্যিকতা ও বিপন্নতার বোধ। এ যেন এক গত্যন্তরহীনতা – যা মানিক স্বীকারও করেছেন। পাশাপাশি, মুখে ভাষা দেওয়ার তর্ক যেন একই সঙ্গে সেই প্রান্তিক বা নিম্নবর্গের প্রতি দায়। তার চেয়েও বেশি করে যেন – ইমানুয়েল লেভিনাসের 'অপর'-তত্ত্বের অপরের মতন, যেখানে উনি বলেন পৃথিবীর প্রথম কথনই হল একধরণের আর্তি। অপর একজন মানুষ বলছে – তাকে যেন হত্যা না করা হয়।

[২২৫] Cornell Drucila, (Ed.Costas Douzinas), *Adieu Derrida* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), P-106

[২২৬] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-৫

[২২৭] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-৫

এই কারুণ্য, বিপন্নতা, আবশ্যিকতা, প্রয়োজন থেকেই লিখন উঠে আসছে। এই প্রয়োজন গভীর - চাওয়া-পাওয়া, দেওয়া-নেওয়ার অতিরিক্ত কিছু। এখানে আবশ্যিকতার বোধ আছে, কিন্তু প্রতিভাবানের মত অলৌকিকতা নেই, মানিক লিখছেন –

"হঠাৎ কি কেউ লিখতে শেখে, না পারে? সাহিত্য সাধনার জিনিস।"[২২৮]

যে কথা তিনি বার বার বলতে চান, তা হল –

"লেখার ঝোঁকও অন্য দশটা ঝোঁকের মতই।"[২২৯]

লেখার ও লেখকের মহিমাকে চূর্ণ করে মানিক লেখেন –

"কলম-পেষা যদি তার কাজে না লাগে তবে রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক।"[২৩০]

এই বক্তব্যই 'লেখকের কথা'-র মূল বক্তব্য। সমগ্র গ্রন্থ জুড়েই এই তর্ক। লেখকের জীবনদর্শন থাকাটাই বাধ্যতামূলক। তাহলে যে লেখক নয়, যে কায়িক শ্রম দেয় তার তার জীবনদর্শন? তার পক্ষপাত? সে প্রসঙ্গে আমরা গবেষণার প্রথম দিকের অংশে খানিকটা উল্লেখ করেছি – আবার অন্তিম অংশেও উল্লেখ করব। তথাপি মনে রাখা প্রয়োজন ভাষার ভয়ঙ্কর বিকল্পরূপে লিখনের কাজ – অজানা কারণেই তাঁর এককত্ব দাবী করে – যদিও সে লিখন আরও ব্যাপক, আরও বিপুল। দেরিদার দর্শনেই এই তর্ক আছে। আমারা এখানে আর নতুন করে উল্লেখ করব না।

মানিকের উল্লেখিত "পক্ষপাতিত্বের মূল্যের" কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছিলাম। সেই মূল্যের ভিত্তিতেই মানিক লেখকের আত্মসত্তাকে চিনে নিতে চাইবেন। বলবেন –

"নিজস্ব একটা জীবন দর্শন ছাড়া সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব নয়..."[২৩১]

মানিক লিখবেন,

"বিরামহীন জীবনদর্শন"এর সপক্ষে। মনে রাখার মতন, যে জীবনকে দেখা এবং জীবন-বিষয়ক মতাদর্শ, দর্শনকে মানিক প্রায় একপাল্লায় মাপতে চাইছেন। বলতে চাইছেন - লেখকে যদি তেমন কোন দেখার চোখ, অভ্যাস,

---

[২২৮] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা,* নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-৯

[২২৯] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা,* নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-১১

[২৩০] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা,* নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-১২

[২৩১] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা,* নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-১২

সংযোগ না তৈরি হয় – তাহলে সে লেখকই নয়। এই চোখ কি জন্মগত কিছু ? মানিক তো তেমন কিছুতে ভরসা রাখেননা। তিনি বলবেন –

"শ্রম যার ধাত সেই লেখক"[২৩২]

জীবনকে এই বিরামহীন দর্শনের শ্রমকে কি বলব আমরা? আমাদের কাছে কি এর জন্য কোন পরিভাষা আছে? মানিক বলবেন – এ শ্রম, "সাধনার শ্রম"| "পক্ষপাত" ও "সাধনার শ্রম" – এই দুটি জটিল তত্ত্বায়ণের নিরিখেই – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গড়ে দিলেন – বাংলা সাহিত্যের লিখনের দর্শন| পক্ষপাত সেই ভবিষ্যতের জন্য – যা চিন্তাতীত, যা অসম্ভব, যাকে ধরে বেঁধে নির্ণয় করে দিতে গেলেই গণ্ডগোল হবে। যার জন্য আমাদের ভাষায় কেবলই লেখকের নিজস্ব লিখনকে অপরের জন্যে, অপরের আহ্বানে – উন্মুক্ত করে যাওয়া। ক্রমাগত লেখার সংকীর্ণতা থেকে লিখনের সামান্যে জটিল থেকে জটিলতম প্রক্রিয়ায় নিজেকে বিলিয়ে যাওয়া।

অন্য দিকে আইয়ুব হয়ত লেখকের আত্মসত্তাকে ততটা অলৌকিক না মানলেও লিখনের মধ্যে শুদ্ধ অশুদ্ধের বিভাজন করেছেন| যেটা স্বাভাবিক ভাবেই মানিকের বস্তুবাদী পরিভাষা তথা বিশ্লেষণ থেকে ভিন্ন এবং তার সঙ্গে মঙ্গলের ধারণাকে যোগ করতে গিয়ে আসলে আধুনিকতাবাদীদের লিখন সাধনার শতকরা অংশ বাতিল করেছেন তাদেরকে অমঙ্গল বা Evil -এর সাধক বলে| মানিক এই যুক্তি পড়ে নিশ্চয় প্রাথমিক ভাবে মৃদু হেসেছিলেন খানিক, বলে আমরা অনুমান করে নিতে পারি - কারণ মানিকের সাহিত্য প্রথম থেকেই অমঙ্গলের উদাহরণে জর্জরিত| যাইহোক তা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়| বোদলেয়ার বিষয়ে আইয়ুবের যদিও একটা প্রচণ্ড একপেশে মন্তব্য ছিল যখন তিনি বোদলেয়ারের লেখাকে 'Automatic writing' -এর সঙ্গে তুলনা করেন| এটা কিন্তু যেকোনো আধুনিকতাবাদীদের বিরুদ্ধেই একটা সমালোচনা হতে পারে| কিন্তু সাহিত্য লিখন যে কোন মনঃসমীক্ষণের কক্ষে বসে লেখা কোন 'Automatic writing' –নয়, এই বক্তব্য অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর| অর্থাৎ সাহিত্যকে যেকোনো কিছু হলে হবে না, বরং যে কোন কিছুর অতিরিক্ত হতে হবে – তবেই সে লেখা সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হবে| বোদলেয়ারের সাহিত্য কি সাহিত্য নয়? আইয়ুব মনে করতেন সাহিত্য নয়, বুদ্ধদেব বসু মনে করতেন একমাত্র এটাই সাহিত্য – সে আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়| কিন্তু সাহিত্য আর মনঃসমীক্ষণের প্রলাপ-লিখন এক নয় - একথা আমরা আইয়ুব থেকে বুঝতে পারি| লেখক কি অর্থে লিখনের প্রক্রিয়ায় মেলে ধরার কাজটা করেন সে বিষয়ে আমরা গত অধ্যায়ে Attridge -এর আলোচনা সূত্রে কোয়েৎজির কথা বলেছিলাম এবং সেই সূত্রে সৃজনের কথা| কেন সৃজনকে আসলে উৎপাদন দিয়ে পুণঃস্থাপিত করতে পারিনা তার কথা বলেছিলাম| মাশেরের বক্তব্য নিয়ে আমার সমস্যাটা কোথায় সেটাও বলেছিলাম| কিন্তু এখানে বোদলেয়ার ও gift-এর আলোচনা থেকে আরেকটা জিনিস উঠে আলোচিত হল, যে তাহলে একভাবে পরিমিত বা

[২৩২] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-৩৮

পূর্ব-স্থিত নির্দিষ্ট কোন নির্ণায়ক নৈতিকতা ছাড়াই, লিখনের নিজস্বতার মধ্যে দিয়ে একভাবে অসম্ভবের দ্বার উন্মুক্ত করা যেতে পারে যেভাবে বোদলেয়ার করছেন সেভাবে। হ্যাঁ অবশ্যই সেটা Automatic psychoanalytical writing-এ লঘূকৃত করা না গেলেও, যেন একভাবে লিখনের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য এখানে পাওয়া যায় । যার মধ্যে দিয়ে হয়ত একরকম করে লিখন নিজেকে উন্মুক্ত করে ভবিষ্যতের তরে, অপরের তরে। যদিও অভিমুখটা স্থির থাকে তবু যাত্রাটা স্থির থাকেনা। সেখানটায় যেন লিখনকে নিজস্ব লীলায় খেলতে দিতেই হবে। সেটাই একমাত্র শর্ত। তাহলে এখানটায় যেন আমরা একভাবে আইয়ুবের সংকীর্ণ শ্রেয়সের ধারণার সঙ্গে, প্রগতি সাহিত্যের উদগ্র ভবিষ্যৎ-বাসনাকে মিলিয়ে একটা পাঠ করতে পারি। খানিক গভীর ভাবে ভাবলে বোঝা যায়, দেরিদার future to come-এর না বলা একটা ইঙ্গিত হয়ত কতটা এরকমই ছিল। সেই ভবিষ্যৎ দর্শনের মধ্যেই হয়ত এরূপ অসম্ভাব্যতার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্নরূপে বর্তমান। বিষয়টা ঠিক এরকম নয় যে, সেই ভবিষ্যতটা আইয়ুবের অবস্থান দিয়ে সুস্পষ্টরূপে বুঝে ফেলা সম্ভব। সেই অর্থে আইয়ুবের তেমন কোন ভবিষ্যৎ চিন্তা আছে কিনা কিংবা কতটুকু আছে – তা তর্কের বিষয়। কিন্তু ছকে ফেলা, বুঝে ফেলা, সর্বজ্ঞ কায়দার ভবিষ্যৎ গণনা, যা প্রগতিবাদী তথা মার্ক্সবাদ তথা আরও অন্যান্য মতবাদেও অনেকক্ষেত্রে স্পষ্ট – সেই নিশ্চয়তার সীমাবদ্ধতাকে যেন একপ্রকারের প্রত্যাখ্যান করে উপরোক্ত আলোচনা। অজানা ভবিষ্যৎ-তত্ত্বের অসম্ভাব্যতা হানা দেয় দেরিদার দর্শনে এবং আমাদের মূল্য সংক্রান্ত এতাবৎ যে তর্ক তার সম্ভাব্য মীমাংসার মধ্যে। অনিশ্চিত, অজানা, চূড়ান্ত কোন এক ভবিষ্যতের নিরিখ দিয়ে আমরা আমাদের আলোচনা এখানে যেন সার্থক-রূপে পাঠ করে ফেলতে পারি।

সৃজন, ভবিষ্যৎ ও মূল্য

গত অধ্যায়েই আমরা বলার চেষ্টা করেছিলাম - লিখনের এই উন্মুক্ততার যাত্রায়, নিজেকে খুলে দেওয়ার যাত্রায় যে সৃজনের অনুষঙ্গ আছে তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ আগমনের গভীর সম্বন্ধ আছে। হয়ত বলা যেতে পারে যতবার লিখন তার সংকীর্ণতা থেকে উন্মুক্ততার দিকে যায় - অজানা সংযোগটা আবিষ্কারের দিকে যায় - ততই যেন যথার্থ (নৈতিক) কোন ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করে। একভাবে যেন তাকে সৃজন করতে চায়। নীতি নিয়ে কর্নেলের লেখা প্রসঙ্গে বেশ কিছুটা কথা বলেছি ইতিমধ্যে - এবারে যথার্থ শব্দটা সেই প্রসঙ্গে ব্যবহার করলাম। দেরিদা দিফেরঁসের প্রসঙ্গে Justice -এর কথা বার বার বলেছেন সে বিষয়ে অনেক আলোচনা আছে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আইয়ুব যা বলছেন, দেরিদাও তাই বলেছেন। আইয়ুব যখন মঙ্গলের ধারণার কথা বলেন তখন তার মধ্যেও যেন একটা নীতি, একটা Justice-এর কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুই নীতির ধারনা কখনোই এক নয় – দেরিদার নৈতিকতার প্রাথমিক জোরের অংশটাই আসলে অমঙ্গলের ধারণা, অন্যদিকে রবীন্দ্রানুসারী আইয়ুব, বোদলেয়ারের অমঙ্গলের দর্শনকে কখনই মেনে নেবেননা। কিন্তু বোদলেয়ার ও লিখনের ধারণাকে এর সঙ্গে

মিলিয়ে পাঠ করলে বুঝতে পারি যে - হয়ত সেই নৈতিকতাকে খানিকটা সংকীর্ণতার গণ্ডিতে বোঝা হয়েছে নানা সময়। হয়ত সব ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই। Transcendental দর্শনের দিক থেকে - লিখন, সৃজন ও উন্মুক্ততার প্রসঙ্গে ভবিষ্যতের ধারণাটিকে উপরোক্ত অর্থে দেখা যায়। আগের অধ্যায়েই আমি সেটা Attridge ও Derrida-র সূত্রে আলোচনার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বোদলেয়ারের 'Automatic writing'-এর ব্যাখ্যাকে আমরা মেনে নিতে চাইছিনা তার কারণ - ভবিষ্যতের সঙ্গে একটা উদ্দেশ্যেরও সম্বন্ধ আছে। লেখার কেবলমাত্র নিরুদ্দেশ, অকারণের চরাচর থেকে ভবিষ্যতের যেন একটা হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার দিকও আছে। তাই এই উদ্দেশ্যের সাপেক্ষে সক্রিয়তার একটা প্রসঙ্গ আছে। এই কারণেই - সৃজন করা বা সাহিত্য করা মধ্যে একটা সক্রিয়তার অংশও আছে। এই করা বা কাজ বিষয়টিকে Action অর্থে - দেরিদা যেখানে Acts কথাটি ব্যবহার করবেন, ধর্মের ক্ষেত্রেও তিনি সেটা করবেন। এই Action-এর ধারণা আসলে ভীষণ ভাবেই রাজনৈতিক একটি ধারণা । আসলে এর মধ্যে দিয়ে দেরিদা আইন-কানুনের সঙ্গে জুড়ে থাকা Acts -এর ধারণাকেও একই সম্পর্কে পড়তে চাইবেন - Law অর্থে এবং সেরকমই একটা সম্পর্কে, সেরকমই একধরণের সম্বন্ধে - লিখন এবং ভবিষ্যতের ধারণারও পারস্পরিক সম্বন্ধকে বোঝা সম্ভব।

এই সক্রিয়তার প্রসঙ্গ আবার দেলেউজের ক্ষেত্রেও এসেছে বিশেষত সৃজন প্রসঙ্গে। সৃজন ও সক্রিয়তার দার্শনিকতা - দেল্যুজের চিন্তার ক্ষেত্রে আরও বেশি তীক্ষ্ণ-মাত্রায় ক্রিয়াশীল বলে মনে করি। তাই - এ প্রসঙ্গে দেল্যুজের সৃজন সংক্রান্ত বক্তব্যের উল্লেখ, আমাদের গবেষণার তাত্ত্বিক অংশের সুস্পষ্টরূপে অনুলিপি করণের জন্য বাঞ্ছনীয়। দ্যলুজ বলেন creation-এর মধ্যে একটা Doing-এর কারবার আছে[২৩৩]। জিল দেলেউজের একটা বিরাট রচনা সম্ভারের মধ্যে একটু সামান্য লেখা - লেখাটির নাম - 'What is a creative act' - সামান্য হলেও ভীষণই জরুরি ও সম্ভাবনাময় লেখা এটি। এখানেই তাঁর সৃজন বিষয়ক মতামত খুঁজে পাওয়া যায় -

এখানে দ্যলুজ প্রাথমিক ভাবে বলতে চাইবেন যে আসলে সিনেমা, সাহিত্য, দর্শন এই প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই সৃজনের ধারণা আলাদা আলাদা (যদি ভুলে না যাই তাহলে দেরিদীয় চিন্তক Attridge-ও একভাবে সাহিত্যের Singularity-র কথা বলছিলেন এবং এই সৃজন এক ধরণের কর্ম অর্থে (Action) দ্যলুজ ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলবেন "We do create"[২৩৪] – এই করার বিষয়টা এখানে জরুরি। দ্যলুজ আলাদা আলাদা সৃজন কার্য হিসেবে কুরোশাওয়া, দস্তয়ভস্কির উদাহরণ দেবেন এবং একই সঙ্গে হলোকস্টের কথা বলবেন। চূড়ান্ত নির্মম ভাবে হলেও - সেটা একটা কাজ। কেন সৃজনের প্রসঙ্গে হলোকস্টের প্রসঙ্গ জরুরি? কেন – ঐ ঘটনাটির নিরিখেই দেলেউজের

[২৩৩] Deleuze Gilles, *Two Regimes of Madness: Texts and Interviews 1975-1995 ed. David Lapoujade*, trans. Ames odges and Mike Taormina(Semiotext(e) Foreign Agents distributed by Cambridge : MIT Press, 1976). - 320

[২৩৪] Deleuze Gilles, *Two Regimes of Madness: Texts and Interviews 1975-1995 ed. David Lapoujade*, trans. Ames odges and Mike Taormina (Semiotext(e) Foreign Agents distributed by Cambridge : MIT Press, 1976). - 321

সৃজনকে বুঝতে চাওয়া ? দ্যলুজ সেখানেও একটা সৃজন দেখাতে চাইবেন অসম্ভব রকমের একটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। আধুনিকতাবাদীদের অমঙ্গল ও সৃজনের কথাটা এখানে আমাদের মনে পড়তে পারে। সেই তথাকথিত 'passivity'-র প্রসঙ্গে আমরা আবার ফিরে আসবো পরে, আপাতত দেলেউজের যুক্তিটিকে আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাক। আমরা জানি নাৎসি জার্মানিতে, হিটলারের ইহুদি ক্যাম্পে (মূলত আউৎসুইচ-এ) – বিপুল পরিমাণ ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করা হয়েছিল এবং এই গণহত্যার বয়ান ও দলিল - সম্মিলিত প্রকাশের কোন চিহ্ন বা নজির প্রায় ছিলনা বললেই চলে। ইউরোপের ইতিহাসে এই গণহত্যা এক ধরণের শূন্যতা বিশেষ – যার তথ্যগত তেমন উপস্থিতি নেই। অথচ তার না থাকার শূন্যতা – যুদ্ধপরবর্তী পৃথিবীর চিন্তা-চৈতন্যকে আমূল ভাবে গ্রাস করেছে বলা চলে (আক্ষরিক-ভাবে বিষয়টি এরকম না হলেও ইউরোপীয় ইতিহাসে হলোকস্টকে দেখার এইরকম একটি প্রবণতা আছে)। ভয়াবহ বিভীষিকা যেন শয়তানের হিংসার মত অকল্পনীয়, চূড়ান্ত যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট এবং বিশ্লেষণের অতীত। একধরণের অমঙ্গল অর্থে – হলোকস্ট-কে দ্যলুজ আশ্চর্য সৃজনশীল ঘটনা হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চাইবেন। তাহলে এখানে সৃজনকে কিভাবে বুঝব ? এখানে সবটাই তো ধ্বংসের আয়োজন । এখানে সৃষ্টি কোথায় ? যে সৃষ্টি ঐশ্বরিক, যে সৃষ্টি সত্য-শিব-সুন্দরের মত স্বস্তিক - সেই সৃষ্টি কোথায়? দ্যলুজের প্রেক্ষিত থেকে পাঠ করলে আমরা দেখতে পাব – ঐ সৃষ্টিশীলতা আসলে সৃষ্টির ভীষণ সংকীর্ণ এক ধারণা। সৃষ্টির ব্যাপ্তিকে অনুধাবন করতে গেলে আমাদেরকে সৃজনের লঙ্ঘনাত্মক বর্বরতাকে বুঝতে হবে। এই মর্মের খুব কাছাকাছি আমরা পাব – বোদলেয়ারের নির্বেদ, বিবমিষার দর্শনকে। এই দর্শনের কথা গত অধ্যায়ে লিখছিলাম। দ্যলুজের মতামতকে সম্প্রসারিত করে আমরা বলতে পারি - সৃজন সেই কারণেই তথ্যের প্রামাণিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয় – তার উপস্থিতির মধ্যে সংকীর্ণ নয় বরং একরকমের Counter information বা প্রতি-তথ্য। সৃজন যেন একধরনের counter-information -এর প্রত্যক্ষ হওয়ার বিষয়। কিন্তু এই counter-information - আবার দুরকমের । অর্থাৎ যদি আমরা বলি counter-information -তো সবক্ষেত্রেই থাকতে পারে, তখন দ্যলুজ বলবেন যে -

"Counter-Information is only effective when it becomes an act of resistance"[২৩৫]

অর্থাৎ প্রতি-তথ্য যখন প্রতিরোধ হয়ে ওঠে, তখনি সে সৃজন। বাতাই কিংবা ব্লাঁসোর মধ্যেও লঙ্ঘনের ধারণা আছে। কাজের ধারণা আছে, অমঙ্গলের ধারণা আছে এবং সেই অর্থে ভাবলে সৃজনেরও দর্শন আছে। কিন্তু বিশেষত ব্লাঁশোর ক্ষেত্রে - যে Passivity বা নৈর্ব্যক্তিকতার দার্শনিক অন্তর্ঘাত আছে, সেই সূত্রে দ্যলুজকে আমরা খুঁজে পাবো না, তার বদলে বরং লঙ্ঘনের শর্তে এই তিন দার্শনিকই একই সৃজনশীলতার কথা বলবেন। তাহলে, প্রতি-তথ্য ও প্রতিরোধে কথা লিখেছি আমরা। কিন্তু কিরকম Resistance? এই প্রসঙ্গে দ্যলুজ আঁন্দ্রে মালো-র

[২৩৫] Deleuze Gilles, *Two Regimes of Madness: Texts and Interviews 1975-1995* ed. David Lapoujade, trans. Ames odges and Mike Taormina(Semiotext(e) Foreign Agents distributed by Cambridge : MIT Press, 1976). - 322

থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখাবেন যে সৃজন আসলে মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাতাই-র ক্ষেত্রের মৃত্যু এবং কাজের পারস্পরিক একধরণের প্রতিরোধেরই সম্বন্ধ ছিল)। এরই সঙ্গে আসলে দেরিদার মৃত্যুর উপহারের কল্পনাটা আমার খুব কাছাকাছি মনে হয় – কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। অন্য দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু খুব নিকটের দুটি কথা। যাইহোক, শিল্প এক অর্থে মৃত্যুর প্রতিরোধক। আর কিভাবে এই প্রতিরোধ ঘটে - দ্যলুজ বলবেন - counter-information সৃজনের মধ্যে দিয়ে। এটাও আবার আমার অনেকটা যেন অ(ন)ভিজ্ঞতার কাছাকাছি বলেই মনে হয়। দেরিদা যখন বলবেন অসম্ভব একটা কিছু সেরকমই যেন। অপরিমেয় একটা কিছু। তথ্য-পরিমাপের ভিত্তি ভেঙে দেওয়ার মত প্রতিরোধ-শীল কিছু একটা। এবার উপহার ও সময়ের সম্বন্ধ দিয়ে যেভাবে দেরিদা থেকে আমরা সৃজনের ধারণার কথা ভাবতে পারছিলাম, এখানে ঠিক একই পদ্ধতিতে নয় – কিন্তু প্রকারান্তরে উভয়ের তর্কের অভীপ্সাটুকু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একই।

দ্যলুজ ও দেরিদার চিন্তার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা হয়েছে পাশ্চাত্যে, এক্ষেত্রে দ্যলুজ ডিসজাংশনের কথা বলবেন ও নিজের দর্শনের ভাষায় বিষয়টাকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন। এখানে তিনি Paul clee-র লেখা আলোচনা প্রসঙ্গে, Human-নিয়ে কথা বলবেন, প্রকারান্তরে বোঝা যাবে যে এই ধরনের প্রতিরোধের মধ্যে একধরণের মনুষ্য-বাচকতা বিরাজমান, এক ধরণের মানুষতা বিরাজমান (ঠিক মানবতার মতো মহিমান্বিত কিছু নয়)। Deleuze, তাঁর বক্তব্যে counter-information-এর resistance হয়ে ওঠার প্রসঙ্গে বলেছেন, এবং কিসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তা ক্রমে যেন দেল্যুজের চিন্তায় বিমূর্ততর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দেরিদা, *Signature Event Context* -এ সংবিত্তিকে এক ধরণের প্রতিরোধের হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । এই একই কথা আমরা দ্যলুজের বক্তৃতাতেও পাব – সৃজনশীলতা আসলে সংবিত্তি বা Communicaton – এর সংবাদ প্রবণতাকে প্রতিরোধ করে (অমিয়ভূষণের আলোচনায় আমরা এই তর্ক পেয়েছি, যদিও ওনার চিন্তা কিছুটা মনঃসমীক্ষণ দ্বারা প্রভাবিত)। যাইহোক, তাহলে সৃজন সরাসরি কোন সংবিত্তি বা communication -এর কথা বলেনা বরং প্রতিরোধের কথা বলে, বিমূর্ত এক প্রতিরোধ যা, সংবিত্তিকে ব্যাহত করে, অসংবিত্তির দিকে নিয়ে যায়।

তার বদলে, আমাদের আলোচনা অনুসারে সৃজন যেটা বলে সেটা হল, অসম্ভব এক সংযোগের দিকে যাত্রার কথা। যার কথা আগেও বলেছি বার বার।প্রধান কথা হল - আমরা বলতে চাই লেখার কাজের ক্ষেত্রে এই সংযোগের আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে যাত্রা, উদ্বৃত্তের অনুষঙ্গ ও ভবিষ্যৎ সৃজনে সঙ্গেই যুক্ত আসলে লেখার কাজের অ(ন)ভিজ্ঞতা। অ(ন)ভিজ্ঞতার শ্রম। এটাই লেখার কাজের মূল শ্রম। অজানা সংযোগের শ্রম। পণ্য পরিধির অতিরিক্ত কোন অমেয় গমন। এইজন্য এই কাজকেও একভাবে সাধনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। মানিক করেছেন। এটা মার্ক্সবাদী নন্দনতত্ত্বের দিক থেকেও একভাবে পাঠ করা সম্ভব। অনেকেই করার চেষ্টা করেছেন - তার মধ্যে বাংলায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের লেখা উল্লেখযোগ্য - আগেই লিখেছি। কান্টীয় মহাদেশীয় দর্শনের চিন্তা এবং ইমানেন্ট

দর্শনের চিন্তার সংযোগ সূত্র আমরা পেতে পারি - দেলেউজের কান্ট আলোচনা থেকে যেখানে কান্টের দর্শনকে উনি ‘Transcendental Empiricism’ -বলে চিহ্নিত করছেন এবং পরবর্তীকালে আরও নানান জায়গায় এই নিয়ে আলোচনা করছেন। আমি আবার বলে নিতে চাই যে আমার আলোচনা Transcendental philosophy-র মধ্যে দিয়েই এবং তার বিশেষ অবভাসবিদ্যাগত ও বি-নির্মাণবাদী চর্চার মধ্যে দিয়ে সংগঠিত। ফরাসী দার্শনিক ক্যাথরিন মালাবু-র বিখ্যাত লেকচারের কথা স্মরণ করে বলা যায় যে Transcendental-কে ছেড়ে দেওয়ার মত কোন কিছু হয়নি (মালাবু - হেগেল, দেরিদা, হেইডেগার নিয়ে নানাবিধ চর্চা করেছেন – যদিও ওনার এই বক্তব্যটি মূলত ছিল নব্য-বস্তুবাদীদের বিরুদ্ধে। এর পরে নানা সময় উনি উত্তরণবাদ নিয়ে নানা কথা লিখেছেন, ‘transient’- এর ধারণাকে দর্শন-ভুক্ত করেছে। যে কোন দার্শনিকের মতই ওনার বক্তব্যও বিতর্ক-মুক্ত নয় একেবারেই, কিন্তু সেসব বিতর্ক - অন্য প্রসঙ্গ আরও দীর্ঘ ও গভীর আলোচনার বিষয়, এই গবেষণায় তেমন আলোচনার সুযোগ নেই)। একটা দর্শনকে খণ্ডন করে আরেকটা নিয়ে মেতে ওঠা তাকে স্বতঃসিদ্ধ ঘোষণা করার চাতুরী আসলে বাজারের, গ্রন্থ ও অ্যাকাডেমিক্স উৎপাদনকারী ক্ষমতার রাজনীতি ভিন্ন আর কিছুই না। সমস্ত বাজারেরই পণ্যবিক্রয়ের নানারকমের আদব কায়দা থাকে – বিদ্যাচর্চাও তার বাইরে নয়, স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু যেহেতু দেরিদার দর্শনই আমাদের তর্কের মূল – তাই আমরা কোনভাবেই নৈতিকতার দিকটি ছেড়ে যেতে পারিনা – আইয়ুবের মত করে না হলেও বি-নির্মাণবাদ একধরণের ন্যায় ও নৈতিকতার (যাথার্থ্যের) কথা বলে – যা মূলত আসে, ইমানুয়েল লেভিনাসের দর্শন থেকে– অ্যাট্রিজের তর্ক সূত্রে আমরা লিখেছি কিভাবে responsibility(দায়) কিংবা hospitality দেরিদার দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ। ‘সাইকি’-র বক্তব্যে কিংবা ড্রুসিলার উপহারের তর্কের মধ্যেও সেই একই নৈতিকতার কথা প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। অপরের প্রতি এই দ্বায় সর্বদাই যেন – একধরণের অনুরণন সৃজনের দ্বায় – অপরের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কোন ইশারায় নিজেকে সমর্পণ করার দ্বায়। ফলত যতই - দ্যলুজের সূত্রে হলোকস্টের উপমায় আমরা সৃজনকে বুঝতে চাইনা কেন – আসলে, সৃজন সাহিত্যিক বা শৈল্পিক মূল্য-প্রাপ্ত হয় তখনি – যখন তা প্রতিরোধ-শীল। যেন তখনই সে কেবলমাত্র কোন ঘটনা নয় – একটি কার্য-ঘটনা বা Act-event. একই সঙ্গে মতাদর্শের উদ্বেগ ও তার অতিরিক্তে চলে যাওয়ার ঘটনা। একই সঙ্গে পরিমাপের বন্ধন ও কার্যক্ষেত্রে সেই বন্ধনকে লঙ্ঘন করে যাওয়ার ঘটনা। দ্যলুজ যেমন, কুরোশোয়া বা দস্তয়ভস্কির শিল্পে, মানুষের কান্না, চিৎকার – এরকম যাতনা ময়, অস্ফুট বেদনার প্রকাশের কথা বলবেন। ঐটাই শিল্পের প্রতিরোধ। হলোকস্ট নিয়ে ইতিহাসে মানুষ কোনদিন কথা বলল না, আদর্ণোর মতো চিন্তক বলতে চেয়েছিলেন, হলোকস্টের পর কোন কবিতা থাকবেনা, একটা গোটা ইতিহাস – হলোকস্ট নিয়ে নীরব হয়ে রইল। এই শূন্য নীরব যাতনার চিৎকারেই যেন - সৃজনের কাজ । অর্থাৎ হিটলার সৃজন করছেন, এরকম ভাবার কোন কারণ নেই, হলোকস্ট নিজেই শয়তানের অন্তিম অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ। যুদ্ধপরবর্তী সমস্ত মনুষ্য সৃষ্টি যেন হলোকস্ট দ্বারা – আহত, সন্ত্রস্ত, সৃজিত। অর্থাৎ সৃজনের ভূমিই যেন এক শূন্যতা – সহ্যের অতীত চলে গেলে, ইন্দ্রিয়ের চেনা জানার অতীত

চলে গেলে – আচমকা, অনাবশ্যক জেগে ওঠে অতীন্দ্রিয়। অজানা, শূন্য আত্ম-পরের সম্বন্ধ-ক্ষেত্র। দেরিদার নৈতিকতাও যেমন ক্ষীণতম এক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা, তেমনি যেন অপরের প্রতি সাহিত্যিকের, সাহিত্য-পাঠকের সমর্পণের দায়। যা কিছু পরিগণিত, নির্ণীত, বিধিবদ্ধ – তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দায়। কোন এক স্থবির বিধানের বিরুদ্ধে, প্রতি-বিধানের নিশ্চিহ্ন সমর্পণের আর্তনাদ, বিধানের নির্ণায়ক ন্যায়ের গণ্ডী ঠেলে – বিধানের অনির্ণেয়তায় বিলয়। শিল্প বা সাহিত্য ছাড়া সেই বিলয়কে – বোঝা যায় কেমন করে? যেভাবে ফ্রান্স কাফকার 'বিফোর দ্য ল' – লেখাটিতে, গল্পের অন্তিমে দরজাটাই ভেল্কিবাজির মতো উবে যায় – ঠিক যেন সেভাবেই বোঝা যায় সংযোগের এই জটিল সম্পর্ককে। কাজেই, আমার মতে দেরিদা এবং দ্যলুজ দুজনের ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন কিংবা সমর্পণের দ্বিবিধ রাজনীতি একই রাজনৈতিকতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ – অর্থাৎ উভয়ের কাজ একই, প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন এবং এখানে অ্যাট্রিজের ভাষায় মার্ক্সের মতাদর্শের আলোচনা ভীষণই জরুরি। তিনি আসলে Context –অর্থে, মার্ক্সের মতাদর্শকে পড়ছেন – যেন মতাদর্শ এমনি কিছু এক - যার আধার প্রস্তুত থাকলেও – তা নির্ণায়ক নয়, তা ক্ষেত্র বিশেষে আলাদা আলাদা – এই মতাদর্শের চরিত্র । এটাই রাজনীতির অনন্ত সম্ভাবনাময়তা, অসম্ভাব্যতা। অথচ মতাদর্শ ভিন্ন কাজ আসলে কাজই নয়। লেখার কাজের যে অন্তিম দার্শনিক তর্কে আমরা উপস্থিত হলাম, সেখানে এসে বুঝতে পারছি – ক্ষেত্র ভেদে, লঙ্ঘন হোক কিংবা সমর্পণ অথবা এই দুই চূড়ান্তের নানাবিধ অনির্ণায়ক স্তর ও স্ববিরোধিতা – মানবিক সিদ্ধান্তের অসীম সম্ভাবনাময়তাই হোক অথবা মানব-বিমুখতা – লেখার কাজ আসলে আমাদের তর্কে কাজের এক সীমাবদ্ধ পুনরাবৃত্তি থেকে নিজেকে মতাদর্শের জটিলতার মধ্যে দিয়ে অজানার প্রতি, অমেয়র প্রতি, অপরের প্রতি উন্মুক্ত করা – তা লঙ্ঘনের প্রতিরোধই হোক কিংবা আত্মিক সমর্পণের মতো কোন প্রার্থনা বিশেষ। উন্মুক্ত, উন্মীলিত করার যে মতাদর্শ, বন্ধন খুলে ফেলার যে মতাদর্শ – যে বিষয়ীতা, তার স্ফুরণ ও বিচ্ছুরণই কাজের দায়। লেখার মত ভয়ঙ্কর এক বিকল্পের একমাত্র দায়। যতটা জটিল এর তত্ত্বায়ণ ততটাই জটিল এই কাজের প্রয়োগ সুতরাং – আমাদের এই আলোচনা কেবলমাত্র ইশারা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আলোচনার হয়ত তেমন কোন নির্দিষ্ট শেষ থাকতে পারেনা। এই জটিলতার মধ্যে দিয়েই আমাদের বুঝতে হবে – সাহিত্যের মূল্যকে। কোন লেখার সাহিত্য হয়ে ওঠার যাত্রাকে। লেখকের সাধনাকে, তার অ(ন)ভিজ্ঞতার শ্রমকে। লিখনের অর্থনীতিকে ও রাজনীতিকে।

মার্ক্সের Value-বিষয়ক স্পিভাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখার কথা আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি, স্বাতি ঘোষ, তাঁর 'The Gendered Proletariat' – গ্রন্থে অনুভবের শ্রম বা বোধের শ্রম হিসেবে 'affective labor'-কে আলোচনা করছেন, মার্ক্সের মূল্য তত্ত্ব থেকে শুরু করে, অর্থনীতি এবং নারী-শ্রম ও যৌনকর্মের প্রসঙ্গকে তুলে ধরছেন ভীষণ সূক্ষ্ম ও নিপুণ আলোচনার মধ্যে দিয়ে । স্বাতীর গ্রন্থ মূলত গায়ত্রী স্পিভাকের মূল্যের তর্ক দ্বারাই প্রভাবিত, ফলত স্পিভাকের আলোচনার অনুষঙ্গে এই গ্রন্থের মূল তর্ক আলোচনা করাটাই আমাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। স্পিভাক ওনার প্রবন্ধে মার্ক্সের মূল্য বিষয়ক যে আলোচনাটিকে টুকরো টুকরো চিন্তার

মধ্যে দিয়ে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, স্বাতী ওনার গ্রন্থে সেই তর্কটিকে ধাপে ধাপে আলোচনা করেছেন। আমাদের গবেষণায় 'মূল্যের' ধারণা ও চেতনার প্রায় সবটুকুই এই তর্ক দ্বারা প্রভাবিত। আমরা ওনার তর্কের প্রসঙ্গটিকে আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে কিছুটা অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করছি। প্রথম অধ্যায়েই আমরা উল্লেখ করেছিলাম, গায়ত্রী স্পিভাকের আলোচনায় আমরা ফিরে আসবো, মার্ক্সের 'Use value'-র প্রসঙ্গে। স্বাতি ঘোষ তাঁর গ্রন্থে, বিষয়ীতার বস্তুগত অনুমান প্রসঙ্গে, মার্ক্সের ব্যবহারিক মূল্যের প্রসঙ্গে প্রবেশ করছেন (স্পিভাক আলোচিত)। স্বাতি লিখছেন –

"In deploying the device of deconstruction in her analysis, Spivak takes up value in his function of difference : value as means of signifying labor and also of failing sort of representing labor (since representation depends on difference and not identification). This dual role of 'signification and simulacrum' of value in representing labor from 'which is not articulated and cannot be contained in `conventional Marxist construction of value' such as various forms of women's labor, children's labor, third world labor (Childers and Cullenberg 1999: 4)…'unmarked labor' that goes into the production of a variety of goods and serviced within the economy marked by international division of labor."[২৩৬]

স্বাতির তর্ক যে প্রেক্ষিত থেকে – যৌন-শ্রম – সেই প্রেক্ষিতে নারী দেহ এবং নারীর যৌন-চেতনা তথা উপলব্ধির শ্রম। বস্তুবাদী প্রেক্ষিত থেকে, উনি সেই তর্কের বাস্তবিক চিত্রটিকে খুঁজে পাচ্ছেন, নিপুণ ভাবে। বুঝতে পারছেন, যে শ্রমগুলি গণনার বাইরে থেকে যাচ্ছে তার মধ্যেই রয়ে যাচ্ছে – নারীত্বের অনির্বচনীয় অসম্ভব এক স্ফুরণের পরিকল্প। তাই তিনি ঠিক এই গণনার বাইরের ধারণা থেকেই, নারী-বিপ্লবের ধারণার দিকে সরে যাচ্ছেন গ্রন্থের পরবর্তী অংশে। যদিও এই বাইরে থাকা আর ভেতরে থাকার বিষয়টি নিয়েও স্পিভাকের সূত্রে স্বাতির আরও আলোচনা আছে। স্বাতি আরও লিখছেন –

"In value becoming 'non-derivative' and 'indeterminate' in Spivak's formulation, it creates an expense to understand the appropriation of surplus outside the capitalist organization of value, and problematize the world how we understand it. The expense opens up the space for intelligibility of the private usefulness of servile labor, unwaged contract labor, paid sex labor, and other forms of 'unremarked' labor and locate the dimensions of exploitation for each"[২৩৭]

শ্রমের অপরিমেয়তার সূত্রেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণের অবকাশ খুলে যায় এবং সেখান থেকেই তৈরি হয় বিদ্রোহের সম্ভাবনা – এই তর্ক আমরা বুঝে উঠতে পারি অনেকটাই, অসম্ভবের তর্ক-সূত্রে। তৃণা নীলিনা ব্যানার্জি,

---

[২৩৬] Ghosh Swati, *The Gendered Proletariat : Sex Work, Workers' Movement and Agency*, Oxford University Press, Delhi, 2017, P-73

[২৩৭] Ghosh Swati, *The Gendered Proletariat : Sex Work, Workers' Movement and Agency*, Oxford University Press, Delhi, 2017, P-74

তাঁর ‘Performing Silence’ গ্রন্থে, জুডিথ বাটলারের, ‘আন্তিগোনেস ক্লেইম’- লেখাটি আলোচনার সূত্রে ‘Pre-political[২৩৮]’ –এর সঙ্গে নারীর সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে – নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীর ‘কেয়া চক্রবর্তী’-র লেখা থেকে প্রায় কাছাকাছি একটি রাজনৈতিকতার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। সেখানে পুরুষতান্ত্রিক আচার ব্যবহার, শ্লীল-অশ্লীল, সভ্য ও উন্মাদের সামাজিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক বিভাজন ইত্যাদি (এখানে বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক নিয়ে অনেকের অনেক চিন্তা ভাবনা থাকতে পারে, ‘মার্ক্সবাদ সত্য কারণ উহা বিজ্ঞান’ – বিজ্ঞানের এই সর্বেসর্বা সত্য হওয়ার দিকটাও যেমন লঙ্ঘনীয়, আবার প্রামাণ্যতাহীণ যা খুশি দিয়ে আধুনিকতা এমনকি উত্তরাধুনিকতাও তার বাজারি চলতি তর্কের বাইরে নির্মিত নয়। যৌক্তিক সর্বস্ববাদীতার নানাবিধ বিরোধিতা ও বিতর্ক আছে, অন্য অনেককিছুর মতই – তার নমনীয়তার দিকটির বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকা উচিৎ নাহলে সেই দর্শনেরও বাজারি খেলায় মেতে উঠতে সময় লাগবে বলে মনে হয়না (যেমন গত অধ্যায়ে আমরা বঙ্কিমের চিন্তার বৈজ্ঞানিক তর্ক বিষয়ে উল্লেখ করেছি – তার নানাবিধ আলোচনা, বিতর্ক, তার ভিত্তিতেই উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি - চটজলদি ও বাজারি তর্কের পরিমাপে যে কোন মীমাংসাই ক্ষমতাশীলের বিকার মাত্র। এমনকি রাষ্ট্রবিরোধী তত্ত্ব, তর্ক লড়াইও – অজান্তে আবার কখনো কখনো সচেতনে সেই বাজারি ফাঁদে পড়ে যায়; এখানে আবারো মনে রাখতে হবে – এখানে আবার কূট-তার্কিক বাজারবাদীরা উঠে আসবেন, বলবেন বাজার মানেই খারাপ তা নয়, কিন্তু বাজার সর্বস্বতা যে কোন কিছুকেই রাষ্ট্রআধীপত্যের মধ্যে গিলে নেয় - যাইহোক সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়) কূটতর্কই যেন একভাবে পুরুষের আধীপত্যশীলতার সমস্তটুকু দিয়ে নারীকে ঘিরে রাখতে চায়। এই ঘেরাটোপের অর্থনীতির বিরুদ্ধেই কেয়া’র পারফরমেন্স নারীবাদী একটি লঙ্ঘণক্রিয়াকে সম্পন্ন করে ফেলে। নারীর, পুরুষতান্ত্রিক ঘেরাটোপ ছিন্ন ভিন্ন উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার তর্কে তৃণা প্রতিরোধের কথা বলেন। এই প্রতিরোধ কোন বিপ্রতীপ নয় বরং পৌরুষের কূট-তার্কিক আধিপত্যশীলতাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আমরা দ্যলুজের বিষয়ে আলোচনা করেছি পূর্বে – তৃণা এক্ষেত্রে দ্যলুজের সূত্রেই, রঁসিয়ের চিন্তার আলোকে, লঙ্ঘনের তর্ককে পাঠ করেন। তৃণার তর্কের পাঠের প্রসঙ্গে আমাদের ফিরে ফিরে মনে পড়ে দেরিদার লেশ সংক্রান্ত আলোচনার তত্ত্ব – লিখন আসলে কোন এক অজানার অকথিত, অনির্বচনীয়ের লেশ, এমন এক ভয়ঙ্কর বিকল্প, লেশ যা যখন লেশ রূপে উন্মোচিত হয় পাঠের প্রক্রিয়ায়, বিনির্মাণের তর্কে – তখন যেন, সেই উন্মোচনে কোন কিছুরই লেশ নেই, সে যেন নিজেই জগতের অন্য কোন এক উৎস - সে নিজেই নিজে; সে বারং বার উন্মোচনের উন্মাদনায় সত্যকে জয় করে নেয়। কাজেই সে কি তখন আদৌ কোন কিছুর লেশ! তৃণাও নারীর প্রসঙ্গটিকে এভাবেই অদ্ভুত বিমূর্ততায় ধরেছেন – এমন কিছু যা যেন লেশ বা যে কোন তত্ত্বের গণ্ডি ছাড়িয়ে চূড়ান্ত এক কর্মে উপনীত হয়। কাজ বা কর্মের ধারণা তৃণার তর্কে অসম্ভব রকমের প্রতিরোধকারী, লঙ্ঘনকারী, উন্মোচনাত্বক। আমাদের তর্কেও কাজ বা কর্ম একইরকম ভাবে অসম্ভবের স্ফুরণ। আমরা দেরিদার দর্শনের মধ্যেই

[২৩৮] Banerjee Trina Nileena, *Performing Silence: Women in The Group Theater Movement in Bengal* , Oxford University Press, 2021 P- 135-179

এই তর্কের বীজ খুঁজে পাই, যদিও একই সঙ্গে দেরিদাকে কিছুটা উত্তরণ করেই। একই সূত্রে তৃণা ব্যক্তির উৎপাদনশীল কর্ম ও লঙ্ঘনের তর্ককে বিপর্যস্ত করে অন্য লেখায়। একই তর্কের সূত্রে ভালোবাসার অমেয়তার প্রসঙ্গেও কথা বলে। কিন্তু স্বাতি ও তৃণা উভয়ের বক্তব্যেই ফরাসী চিন্তার ছায়ার সূত্রে – উদ্বৃত্তের অনুষঙ্গে এক দীনতা, পাশবিকতা, যন্ত্রণা, দুঃখের – মরণ-জর্জর মীমাংসার তর্ক আছে। যেমন আধুনিকতাবাদীদের লেখায় হামেশাই থাকে - এক অমঙ্গলের উদ্বোধন। যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব মঙ্গল চিন্তায় অক্ষম তাই – আধুনিকতাবাদ অপরিহার্য। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা আমাদের মত করে, আইয়ুব সূত্রে আলোচনা করেছি – এই ধারণাগুলির ঐতিহাসিকতা ও জটিলতা এবং অনির্ণেয়তার অন্ত হয়েছে বলে আমার মনে হয়না। মানিকও যেমন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি, ভুবনেশ্বরী ভাদুরি যেমন, পি সি জোশীও তেমনি, আদর্নো যেমন, ব্রেখট ও তেমনি – পৃথিবীর মনুষ্যজীবনের অশান্তির কথা অনুভব করছেন, তার জরাকে সর্বত্র খুঁজে পাচ্ছেন তবু মার্ক্স যাকে বলেন : এই জটিলতার মধ্যে দিয়েই জগত ও জীবনকে বোঝা (ক্যাপিটালের ফরাসী ভূমিকা অনুসারে - যা ফরাসীদের ধাতে খুব একটা নেই, কারণ ফরাসীরা চটজলদি সিদ্ধান্ত সন্ধানে উৎসাহী) ও এর থেকে উত্তরণের পথ উন্মোচনের প্রচেষ্টা করেছেন। ভবিষ্যৎ চেতনার এই দ্বিধা ও জটিলতা থেকে হাত ছাড়িয়ে চিন্তা করার উপায় নেই। স্বাতির তর্কের সূত্রে আমরা এই বিতর্কের প্রসঙ্গে ঢুকে পড়লাম যদিও, আসলে আমাদের এই তর্কের রাস্তা ধরে অবধারিত ভাবে উঠে আসে, ব্যবহারিক মূল্যের মৌলিক তর্ক, যেখানে স্পিভাক অন্তর বাহিরের সমস্যাটিকে জটিল করছেন বি-নির্মাণবাদী তর্কে, স্বাতি লিখছেন :

"In this value chain, use value is the origin of labor-power that transforms into commodities, to value and to capital in the end the chain is closed. In her discontinuist reading, on the contrary, Spivak points out that it is *use-value* that lends indeterminacy to the value chain. It is 'inside' because use-value takes on a value form in capitalism. Yet it is never entirely inside, because use-value of labor is not a thing, use-value of labor power is different from commodities and cannot be reduced to a homogeneous intangibility, bereft of its heterogeneity. It is impossible to represent , describe, or even reduce the innate characters of use-values. Confirming Spivak's idea that 'use-value is not a transcendental principle because it changes in each occasion or heterogeneous case' "[২৩৯]

স্বাতির এই অংশের আলোচনা নিঃসন্দেহে অসম্ভব জটিল - স্পিভাকের জটিলতম আলোচনাগুলির মধ্যে এটি একটি। থমাস কিনানের সঙ্গে জাঁক দেরিদার মার্ক্স আলোচনা এবং প্রেত ও দৈত্য বা অতিমানবের প্রসঙ্গের সাযুজ্য আছে - সে বিষয়ে আমরা অনেকেই অবগত। উভয়েই প্রায় একই ঐতিহাসিক সময়ে দাঁড়িয়ে, দুটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় প্রায় একই তর্কের মধ্যে দিয়ে মার্ক্সবাদকে পাঠ করেছিলেন – এ বিষয়ে আমরা একমত। কিন্তু আমরা

[২৩৯] Ghosh Swati, *The Gendered Proletariat : Sex Work, Workers' Movement and Agency*, Oxford University Press, Delhi, 2017, P-74

আগেই বলেছি দেরিদার যে উত্তরণ-ধর্মী দর্শনের ধারা – তার মধ্যে দিয়েই আমাদের গবেষণার প্রধান যাত্রা – জ্ঞানত বা অজ্ঞানত এই দর্শনের মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিকভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে বুঝতে অনেক সুবিধা হয়েছে আমাদের। কাজেই আমাদের প্রেক্ষিত থেকে আমি মনে করিনা – নানাত্বের সম্ভাবনা স্বত্বেও ব্যবহারিক - মূল্যের আলোচনা প্রসঙ্গে উত্তরণধর্মীতাকে সরিয়ে রাখা কিংবা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা সম্ভব। স্পিভাকের আলোচনায় ব্যবহারিক মূল্য বিষয়ে সুস্পষ্টরূপে অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত আছে, সেই ইঙ্গিতটিকে ধরেই আমরা মার্ক্সের ব্যবহারিক মূল্যের দুরূহতা ও অনির্ণেয়তাকে বুঝতে চাই। পাঠ করতে চাই, আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে চর্চা করতে চাই। এই অনিশ্চয়তাই যেন অন্যদিক দিয়ে লেন-দেনের অর্থনীতির যে সীমাবদ্ধতা - শিল্প, সাহিত্য, সৃজন ও উদ্বৃত্ত বিষয়ে যেসকল আলোচনা আমরা আমাদের গবেষণার সমস্তটুকু জুড়ে নানা সময় করে এসেছি - সেইসকল সীমাবদ্ধতার পরিমাপের অনিশ্চয়তার, অপূর্ণতার, অপরিমেয়তার সঙ্গে ব্যবহারিক মূল্যের অনির্ণেয়তার যেন সম্বন্ধ অনুমান করা স্বাভাবিক বলেই বোধ হয়। দুটি মূল্যের ক্ষেত্রেই একধরণের অপরিমেয়তা, অনিশ্চয়তা, অনির্ণেয়তার পরিসর আমাদের তর্কে সম্বন্ধের তত্ত্বকে প্রকট করে তোলে নতুন করে এবং সমগ্র আলোচনার সঙ্গে ভবিষ্যতের প্রতি উন্মুক্তি ও অজানা ভবিষ্যতের আগমনের তত্ত্বকে একত্রে গেঁথে নিয়ে চিন্তা করতে সাহায্য করে। মার্ক্সবাদী মূল্যের তর্ককেও কি তাহলে একভাবে আমরা - সংকীর্ণ এবং মুক্ত অর্থনীতির শর্তে ভাবতে পারি ? (অন্তত যে তর্ক বাতাই তথা দেরিদার লেখায় আমরা পেয়েছি) সেই তর্কের সূত্রে পাঠ করতে পারি? কেনই বা পারিনা? আমার মতে দেরিদার ভবিষ্যৎ চিন্তা আসলে মূল্যের মৌলিক তর্কের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। এই প্রসঙ্গটি অবশ্যই সিদ্ধান্ত-বাচক কিছু নয় - এ কেবলমাত্র আমাদের একধরণের অনুমান জাতীয় বিশ্লেষণ বিশেষ। আলোচনার অধিকারে ও অবকাশে এই প্রসঙ্গের এক অপরিচিত অংশটিকেও উল্লেখ করা গেল।

তবে একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা, দেরিদার মার্ক্সবাদ চিন্তা – যৌনবিভাজনের তার্কিক পরিসর থেকেই প্রধানত উঠে এসেছে। যদিও তা প্রেততত্ত্বের মধ্যে দিয়ে বিস্তারিত হয়েছে, তবু লিঙ্গ-বিভাজন ও মার্ক্সবাদের সম্বন্ধের প্রসঙ্গে দেরিদা স্বীকার করেছেন। তাঁর গ্রন্থে এবং আমরা উল্লেখ করেছি, তিনি এও স্বীকার করেছিলেন - উত্তরনবাদীতা থেকে আমরা সম্পূর্ণ হাত ছাড়িয়ে নিতে পারিনা কিছুতেই। এই তর্ক সহজ এবং স্বাভাবিক। এইধরনের জটিলতা দর্শন চিন্তার আবশ্যিক শর্ত। স্পিভাকের এই চিন্তা থেকে স্বাতি ক্রমে affective value coding –এর প্রসঙ্গে যান, লেখেন –

“Underlining the affective value coding, we call her gendered proletariat.”[২৪০]

এই অংশটাই স্বাতির গ্রন্থের নিজস্ব অংশ, বলাচলে এ যেন ওনার সিদ্ধান্ত বিশেষ। অনুভূতির আবশ্যিকতা, অনুভূতির রাজনৈতিক আবশ্যিকতা দিয়ে আমরা কিভাবে পড়তে পারি অর্থনৈতিক মূল্যের তর্ককে - সেটাই স্বাতীর

---

[২৪০] Ghosh Swati, *The Gendered Proletariat : Sex Work, Workers' Movement and Agency*, Oxford University Press, Delhi, 2017, P-77

গ্রন্থের মৌলিক দার্শনিক তর্ক। সেই তর্কের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত বরং সেই তর্ককেই আরও বেশি মৌলিক তথা মূল্যের প্রকৃষ্ট যুক্তি হিসেবে পাঠ করার জন্য তৎপর হয়েছি।

আমার কেবল একটি সন্দেহ থেকে যায় এই প্রসঙ্গে – অপরের একটি সত্ত্বা, যাকে আমরা নারীর লিঙ্গ-পরিচিতির মধ্যে দিয়ে চিনতে পারছি – তাকে মূল্যের তর্কে এসে হঠাৎ কেন – শ্রেণীর পরিচিতি ধারণ করতে হবে? সে নারী হিসেবে শ্রেণী-রাজনীতিকে অতিক্রম করে যেতে পারবেনা কেন? যেটা আমরা খানিকটা তৃণা চক্রবর্তীর তর্কে পাই। তৃণার লেখায় রাজনৈতিক কেয়া চক্রবর্তী আর কিছুই হয়ে উঠতে চায়না – সে যেন নারীর শূন্য এক পরিচিতি নিয়ে ধাক্কা মারে – যদিও স্বাতী কিংবা তৃণা উভয়ের ক্ষেত্রেই আধিপত্যের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে তবু - এই পার্থক্যটুকু নজরে পড়ার মতন। আমাদের আলোচনার সূত্রে, যে অর্থে আমরা মূল্যের প্রসঙ্গকে সম্বন্ধ, উদ্বৃত্ত ও অ(ন)ভিজ্ঞতার লিখনের সূত্রে পাঠ করছিলাম, তাকে আমরা কিভাবে তত্ত্বগত ভাবে বুঝতে পারছি – তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে বেশ কিছুটা স্পষ্ট হচ্ছে। এর চেয়ে বেশি দার্শনিক ভাবে খোলতাই করে আলোচনা করার পরিসর এটি নয়, আমরা প্রসঙ্গক্রমে দার্শনিক তর্কের মধ্যে দিয়েই আমাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেও – আমাদের তর্ক গূঢ় অর্থে ততখানি দার্শনিক হয়ত নয়, যত বেশি সাহিত্য-চিন্তামূলক কিংবা চিন্তা-মূলক। ফলত সম্বন্ধের দার্শনিক মীমাংসা অথবা মূল্যের দার্শনিক মীমাংসায় আমরা অবতীর্ণ হইনি – লেখার কাজের ধারণাকে তথা কাজের ধারণাকে পাঠ করতে নেমে যতখানি দার্শনিকতায় আমরা অবতীর্ণ হতে সক্ষম ততটুকু এনে হাজির করার চেষ্টা করেছি।

প্রসঙ্গত তাহলে সেই অজানা সম্পর্ক বা অমেয় সম্বন্ধের প্রসঙ্গটিই আবার ঘুরে আলোচিত হল। লিখন ও সৃজনের সম্মিলনে লেখার কাজের মধ্যে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির অজানা সম্ভাবনা থেকে যায় - বৃহৎ অর্থে কাজের মধ্যেই যেন একভাবে থেকে যায় - যেটাকে স্বাতি পাঠ করছেন, নারীবাদী বিপ্লবের প্রেক্ষিতে এবং একজন সত্যিকারের লেখক যে তা কখনই এড়িয়ে যেতে পারেননা। লেখার সংকীর্ণ অর্থনীতি থেকে লিখনের সাধারণ অর্থনীতির দিকে উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে - চেয়ে হোক বা না চেয়ে - আসলে তিনি একটা ভবিষ্যতকেই আহ্বান করে চলেন। তাহলে সেই অর্থে যেনবা একজন 'অরাজনৈতিক' লেখকেরও অপরের প্রতি আবশ্যিক একটা দ্বায় থেকেই যায় - সে যেভাবেই হোক। একজন বিশেষ ভবিষ্যতকামী লেখকও যে শুধু সেই ভবিষ্যতকে একটা ছক কষে লিখেই কাজ সারতে পারেন এমনটা নয় - তাকে আসলে নিজেকে উন্মুক্ত করতেই হয়। মানিকের সঙ্গে ভবিষ্যৎ বিষয়ে মার্ক্সবাদীদের তর্কের কথাও মনে করা যেতে পারে এখানে। ভবিষ্যতের প্রতি উন্মুক্ত থাকার প্রসঙ্গে আমরা গত অধ্যায়েও আলোচনা করেছিলাম এবং এই অধ্যায়ে মানিকের সেই বিশেষ এক ধরণের লিখনের স্বপ্ন - দেরিদার একধরণের লিখনের স্বপ্ন । সেই কল্পলিখন আসলে এক ভবিষ্যৎ কল্পনার মতই - যাকে অনেকেই কল্পলোক বলতে পারেন, মনে করতে পারেন কোন ভবিষ্যৎ আসার কথা লিখছেন দেরিদা। সেই সূত্রেই তিনি কিভাবে ভাবছেন - আগমনরত কোন লিখনকে। আসলে এই ভবিষ্যতের ধারণাকে আমি দেরিদার ‘without’- এর যুক্তি দিয়ে পাঠ করতে চাই।

যেভাবে দেরিদা বেঞ্জামিনকে পাঠ করেন – 'messianic without messianism'- সেভাবেই দেরিদার এই আগমনরত ভবিষ্যতকে আমরা পড়তে পারি – 'utopia without utopianism' রূপে। এ প্রসঙ্গে একটি খুচরো কথা বলে নেওয়া ভালো - এটা নিয়ে অনেক ধন্দ, বিতর্কের অবকাশ ছিল, আছে এবং থেকে যায় – কিন্তু এই ভবিষ্যতের আগমন প্রসঙ্গে দেরিদা তাঁর সাক্ষাতকারে বলছেন – ভবিষ্যতের সমস্ত পরিমাপের অতিরিক্ত কোন ভবিষ্যৎ আসবে – কেউ একজন আসবে। কেউ একজনের আসাটা ভীষণই রূপকার্থক – যেমন ভাবে রূপকার্থক জগতের অন্য কোন এক উৎস ইত্যাদি। দর্শনের এই ভঙ্গিমা যা দেরিদার লিখনে প্রায়শই সাহিত্য হয়ে ওঠে, কাব্যিক গদ্য হয়ে ওঠে – তাকে কিভাবে পাঠ করছি সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মানিকের লেখাতে আমরা পাই, কোন এক পরিপূর্ণ লিখনের দিকে যাত্রার কথা - আবার মানিক ঐ "লেখকের কথা" গ্রন্থেই অন্য আরেকটি জায়গায় লিখেছেন –

"আমিও সেই অনাগতের প্রতীক্ষায় আছি যিনি একদিন মহান সৃষ্টির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের নবতম রূপ সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পারবেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনা সেই অনাগত আকাশ থেকে নেমে আসবেন, বাঙালির জীবন ও সাহিত্যের বাস্তব যাত্রাপথেই তার আবির্ভাব ঘটবে।"[২৪১]

এই নবতমের ধারণার সঙ্গে দেরিদার ভবিষ্যতের আশ্চর্য সম্বন্ধ আছে এবং সাইকি-বিষয়ক লেখাটিতেই আছে। আবিষ্কার ও নতুনত্বের প্রসঙ্গই সেই আলোচনায় প্রধান বিষয়বস্তু – সে বিষয়ে বিস্তারিত না গিয়ে কেবল উল্লেখ করলাম মাত্র। মানিক ও দেরিদার দার্শনিক প্রেক্ষাপট এবং ঐতিহাসিক দূরত্ব উভয়কে মাথায় রেখে, আমরা কখনোই বলছিনা যে এরা উভয়েই এক কথা বলতে চেয়েছেন কিন্তু আমরা যেভাবে আমাদের গবেষণায় একটি তর্ককেই ক্রমাগত নানা দিক দিয়ে পাঠ করে এসেছি - একেও সেভাবেই পাঠ করতে চাই আমরা। বিষয়ীতার প্রশ্ন যেন ভবিষ্যতের প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। এ যেন এক আশ্চর্য চিন্তার গতি - যা ক্রমাগত সংকীর্ণ জরাগ্রস্ত চিন্তাপদ্ধতিকে ভেঙে ফেলে উন্মুক্ত হতে চায় ভবিষ্যতের অতিরিক্ততায়। ড্রুসিলা কর্নেল (অন্য আরেকজন নারীবাদী) - কাজ, রাজনীতি এবং দেরিদার ভবিষ্যৎচিন্তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন – সেকথা আমরা আগেই লিখেছি। সেখানে ভবিষ্যতের প্রতি দায়বদ্ধতা ও আজকের কাজের রাজনীতি তথা 'অর্থনীতি' বিষয়ে ড্রুসিলা একটি মন্তব্য করেছেন -

"The imminence here is that death may arrive at any moment. Heidegger discusses this brilliantly in *Being and Time* and the fact that death may arrive at any moment gives justice to the character of an immediate injunction. To be faithful to future, then is to open ourselves to the address. 'What are you doing today?' "[২৪২]

---

[২৪১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাব্লিসার্স, ১৯৫৭, পৃ-৯২

[২৪২] Cornell Drucila, (Ed.Costas Douzinas), *Adieu Derrida* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), P-107

যে অসম্ভব সম্বন্ধের প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায় থেকে সূত্র গেঁথে গেঁথে উল্লেখ করে এলাম সেই বিষয়ে বা বলা চলে লিখনের বা সাহিত্যের স্বত্বা-গত কোন মৌলিক বিষয়ে আমি সিদ্ধান্তস্বরূপ কিছু আবিষ্কার করব বলে গবেষণার কাজে আগ্রহী হইনি – আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল ‘লেখার কাজ’ বিষয়টি শ্রম ও অ(ন)ভিজ্ঞতার শর্তে কিভাবে এমন করে পাঠ করতে পারি – যার মধ্যে দিয়ে লেখকের লিখন প্রক্রিয়াটির মৌলিক স্বরূপ খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর হয়।

মূল্য ও ভবিষ্যতের যে তর্ক আমরা আইয়ুবের কথা প্রসঙ্গে লিখছিলাম - সেই তর্কটি থেকে মূল্যের সঙ্গে ভবিষ্যতদর্শনের প্রসঙ্গ উঠে আসে এবং সেখানেই নিজেকে উন্মীলিত করার ক্ষেত্রে লেখকের একটি মতাদর্শগত দ্বায় কাজ করেই চলে, সে মতাদর্শ যাই হোক – তার অভিমুখ থাকার কথা ব্যাপ্তির দিকে। কারণ সৃজন যা লিখনের সাহিত্যিক অর্থনীতির আবশ্যিক শর্ত – সেই সৃজনের, শিল্প হয়ে ওঠার মধ্যে আসলে প্রতিরোধ কাজ করে একথা আগেই লিখেছি। তাহলে একদিকে সৃজন আবার একই সঙ্গে সৃজনের প্রতিরোধ-শীল হয়ে ওঠা। একদিকে মুক্তির দিকে লিখনের আপন সংকীর্ণতা থেকে নির্গমন অন্যদিকে একই সঙ্গে দায়বদ্ধতার হিসেব নিকেশকে না ছেড়ে দেওয়া, উন্মীলনের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই দায়ের প্রেক্ষিতটিকেও ধরে রাখা। তাহলে এই যে মতাদর্শ, এই বিষয়ীতার উন্মীলন – কোন ভবিষ্যতের দিকে আমাদের নিয়ে যায় – সেই প্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ কি? এনিয়ে নানা মুনির নানা মত – সমস্ত মত রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু লিখনের উন্মীলন আসলে, আত্ম-অপরের মিলনের দিকে ধাবিত হয়, বিষয়ীর হদিশ উন্মোচনে ধাবিত হয়। লিখনের সংকীর্ণতা থেকে সামান্যে মুক্তির জন্যে ধাবিত হয় - কিন্তু কেবল অন্ধের মত নয়। দায়বদ্ধতার দৃষ্টিকে সজাগ রেখে, সেই পথের দিকে যাত্রাটিকে বজায় রেখে। এক বাক্যে দাগিয়ে দিতে চাইলে - এটাই লেখার কাজ। এই জটিলতম তর্কটি দিয়েই কি সাহিত্য আর কি সাহিত্য নয় - তার সেই বিচার সম্ভব বলে আমার মনে হয়। বিচারের অভিমুখ যদি অসম্ভব সেই অ(ন)ভিজ্ঞতার তরফে থাকে - যেখানে একই সঙ্গে অভিজ্ঞতার প্রতি সতর্কতা আছে আবার অভিজ্ঞতা থেকে উত্তরণও আছে - তবে লেখার কাজের বিচার নিশ্চয়ই সম্ভব বলে মনে হয়। সাহিত্য, শিল্প বৃহৎ অর্থে লিখনের তর্কে যাথার্থ্যের প্রশ্নকে নিরুত্তর ফিরিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয় – এই আমাদের গবেষণার মূল বক্তব্য। বাঙালি লেখকদের নিজস্ব লিখন-চিন্তনের জবানবন্দীগুলিতে প্রবেশ করবার পূর্বে ছোট্ট একটি আলোচনা সম্পূর্ণ করে দিতে চাই এই অংশে। পূর্বের দ্যলুজ আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের দুটি ভাবনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল – একদিকে যেমন দস্তয়ভস্কি, কুরোসাওয়া প্রমুখের সৃজনশীলতায় – স্বাভাবিক মঙ্গল-বাচক সৃষ্টি-র ধারণাকে ছাপিয়ে গিয়ে অনুভুতির রুক্ষ, ভয়াবহ, নৃসংশ প্রকাশের কথা আমরা জানতে পারি – ঠিক তেমনি অন্যদিকে প্রতিরোধের মধ্যে, অমান্যতার মধ্যে একধরণের নৈতিকতা বা বিচারের লেশও যেন সুস্পষ্ট থাকে। এই নৈতিকতার দিকটা আবার দেরিদা কিংবা ইহুদী চিন্তকদের মধ্যে আরও বেশি করে স্পষ্ট। ঠিক এই আলোচনার মধ্যে যেন আমরা অন্য আরেকটি একই ধরণের আলোচনার ছাপ দেখতে পাই। দস্তয়ভস্কি বিষয়ে গেয়র্গ লুকাচের যাবতীয় লেখার কথা আমাদের মনে পড়তে

পারে। Galin Tihanov – তার "Ethics and Revolution: Lukács's Responses to Dostoevsky"[২৪৩] – নামক প্রবন্ধে লুকাচের – দস্তয়ভস্কি বিষয়ক লেখাগুলির প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন (তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল – "On Dosteovsky's Legacy", "Dosteovsky") – এই প্রবন্ধের আলোচনার মূল বক্তব্য হল - একদিকে দস্তয়ভস্কির চরমভাবাপন্ন প্রবৃত্তিসুলভ, অনুভুতিময়তা ও অমঙ্গলবাচকতার মধ্যে দিয়ে – নন্দনতাত্ত্বিক সাধারনিকরণে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা (যেটা এক অর্থে কান্টিয় ঘরানার লক্ষণ) । অন্যদিকে লুকাচের মধ্যে যেন বার বার দৈনন্দিন তথা সবিশেষ নীতিগুলির মধ্যে দিয়ে একধরণের সামগ্রিকতায় উপনিত হওয়ার ঝোঁক। একজনের পাল্লা যদি নন্দনের দিকে বেশি ঝুঁকে আছে – তো অন্য জনের নীতি -রাজনীতির দিকে আরও বেশি। সেক্ষেত্রে, লুকাচের চোখে দস্তয়ভস্কিকে দেখলে – শ্রেনী শত্রু মনেই হতে পারে। দস্তয়ভস্কিকে শ্রেনী শত্রু বলা উচিত কিনা – সেসব মার্ক্সবাদীদের ভাবনা – সে নিয়ে আপাতত আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। কিন্তু সৃজনের সঙ্গে বা সৃজনের মধ্যে প্রতিরোধ বা একধরণের সচেতন নীতি ও বিচারের জায়গা আবশ্যক – এ বিষয়টি যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এখানে। এই প্রসঙ্গ উঠলেই আবার সেই পুরাতন ঝগড়ায় ফিরে যেতে হয় আমাদের। তাহলে তো "point-blank socialist novel" – লেখাটাই জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি তা না করা হয় তাহলে লুকাচের নিজের চোখে - একমাত্র বাস্তবতাবাদী উপন্যাসই যেন (বিশেষত "Theory of Novel"-এর ক্ষেত্রে এই তর্ক আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে) – সাহিত্য হিসেবে অনেক বেশি যথাযথ। সাহিত্যে যথাযথকে কিভাবে তুলে ধরতে হবে তাহলে? যেভাবে উপন্যাসের বাস্তবতা - জীবনের সামগ্রিকতাকে তুলে ধরে – সেভাবেই। আর সেটা মেনে নিলে আধুনিকতাবাদী উপন্যাসগুলি সব শ্রেনী-শত্রুদের লেখা – প্রায় তৃতীয়পক্ষ গোছের কিছু হয়ে দাঁড়ায়। ন্যায়হীন, নীতিহীন অসংযত প্রলাপ। না মার্ক্সবাদী যথার্থবাদ না আয়ুবের রাবীন্দ্রীকতা – কোন দিকেই তো তাহলে আধুনিকতাবাদীদের আর ঠাঁই মেলেনা। কারণ আয়ুব বলবেন – এসব লেখা অমঙ্গলবাচক এবং লুকাচ বলবেন – এই লেখাগুলি অযথার্থবাদী। আমাদের এই আলোচনায় যে কলহ-সুলভতার খোঁজ পাচ্ছি আমরা – আপাতত সেখান থেকে খানিকটা সরে এসে – আরও দুটি তর্কের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। দ্যলুজ তার সৃজন বিষয়ক আলোচনায় হিটলার ও আউসুইৎচ ক্যাম্পের নির্যাতনের বিষয়ে লিখেছিলেন। সেখানে সৃজনের যে নির্মমতার কথা আমরা পাই – সেই আলোচনার আরেকটু লেশ যেন দেখা যায় দ্যলুজের Cinema 2 গ্রন্থের "Hitler as information"[২৪৪] অংশে। সেখানে উনি একই সঙ্গে Walter Benjamin[২৪৫] -এর 'Inside Cinema[২৪৬] -র একটি আলোচনাকে কেন্দ্র করে বলতে চাইছেন যে – হিটলার নামক তথ্যটি, হিটলারের দাপুটে,

---

[২৪৩] The Modern Language Review, Vol. 94, No. 3 (Jul., 1999), pp. 609-625)

[২৪৪] Deleuze Gilles, *Cinema 2*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1989

[২৪৫] প্রসঙ্গত বেঞ্জামিনের "Work of Art in the Era of Mechanical Reproduction" – কিংবা "Marxism and Formalism" – নামক গ্রন্থের আলোচনা এক্ষেত্রে করা যেত, কিন্তু সেই সকল বহুআলোচিত বিতর্কগুলিকে – পুণরায় আলোচনা না করে আমরা গবেষণার প্রয়োজনে নিজেদের মত করে দু'একটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে তর্কগুলিকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করলাম।

[২৪৬] Deleuze Gilles, *Cinema 2*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1989

নৃসংশ চিত্রটি নির্মিত হচ্ছে আসলে মূলত সিনেমা বা চলমান-চিত্র মাধ্যমের একটি বিশেষ উপস্থাপনা বা আঙ্গিকের মধ্যে দিয়ে। যেখানে হিটলারের জীবনকে বার বার একটা সম্মুখ ও পশ্চাতবর্তী সময় রেখার মধ্যে আবদ্ধ করে করে – হিটলারকে আরও প্রকট এবং জাজ্বল্যমান করে তোলা হচ্ছে[২৪৭]। কিন্তু কেবলমাত্র হিটলার খারাপ বা হিটলার একজন মৌলবাদী, খুনী, শোষক – বলে দিয়ে আরেকটা সিনেমা বানালে বা আরেকটা বই লিখলেই কেবলমাত্র হিটলারের ভাবমূর্তি-কে ভাঙা সম্ভব নয়। তাকে ভাঙতে গেলে আসলে চলচ্চিত্রের বা সিনেমার আঙ্গিকের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই ভাঙতে হবে। অর্থাৎ, লুকাচ ও দস্তয়ভস্কির আলোচনায় যদি এটিকে ফিরিয়ে আনি তাহলে বক্তব্যটা এরকম দাঁড়ায় – (সেই একই) – যে কেবলমাত্র শ্রেনীশত্রু চিহ্নিত করে বা শ্রেনীশত্রু চিহ্নিত করার আসল আঙ্গিক হিসেবে বাস্তববাদী বয়াণকেই একমাত্র ধরে নিলে – ভুল হবে। মতাদর্শের সচেতন কর্ষণ এবং একইসাথে আঙ্গিকেরও উন্মোচনাত্বক, সৃজনশীল, পরীক্ষামূলক যাত্রা না থাকলে – যথাযথ সাহিত্যে (লিখনে) উপনিত হওয়া সম্ভব নয়। অন্য ভাষায় বললে – লিখনের মধ্যে যে যাথার্থ বা ন্যায়ের ধারণা – তা কিন্তু কেবলমাত্র বাস্তববাদের বিষয় নয়। যদি মার্ক্সবাদীরা সেটা মনে করে থাকেন – সেটা তাদের সীমাবদ্ধতা ছাড়া আর অন্য কিছুই না (যদিও এক্ষেত্রে খেয়াল রাখা উচিত – লুকাচের বা গভীর অর্থে মার্ক্সবাদী যথার্থবাদ কিন্তু একই সঙ্গে আধুনিকতাবাদের মধ্যস্থ “Naturalist” – সাহিত্যের যে প্রবণতা, সেটার বিরুদ্ধে যথার্থ ভাবেই সরব হয়েছিলেন) । এখন কেউ বলতে পারে – তাহলে কি আমরা বুঝে গেলাম বিষয়টা? এবার তো চাইলেই – কিছুটা মতাদর্শ আর কিছুটা পরীক্ষামূলক আঙ্গিক করে দিলে – সাহিত্য যথাযথ হয়ে যাবে। আবারও আমাদের মনে করে নেওয়া উচিত – লেখার কাজের – এই গবেষণা কিন্তু আদৌ লেখার কাজকে মেপে ফেলে দাগিয়ে দিতে চাওয়া নয় – বরং তার জটিলতাগুলির একটি মানচিত্র তৈরি করা (প্রসঙ্গত বাখতিনের দস্তয়ভস্কি বিষয়ক আলোচনার কথা মনে করা যেতে পারে[248] – লিখন কিভাবে বহুমুখীনতাকে একত্রে ধারণ করতে পারে – সেই লেখা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ)। লেখার কাজ – সৃজনশীল প্রতিরোধ হিসেবে আগেও অনেকখানি অপরিমেয় ছিল, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে – আমরা কেবল আবছা একটি অবয়ব খোঁজার প্রচেষ্টা করছি মাত্র।

কিন্তু যে তাত্ত্বিক বিচার আমরা লেখার কাজের ক্ষেত্রে করতে পারছি - কাজের সাধারণ দর্শনের সঙ্গে কি এর সম্পর্ক আছে কোন? শুধুমাত্র লেখার কাজ নয়, কাজকেই কি সাধারণ অর্থে এভাবে পড়তে পারি আমরা ? সেই সম্ভাবনাগুলি নিয়ে আমরা উপসংহারে আলোচনা করব। আপাতত নিম্নে আমরা বিভিন্ন বাঙালি লেখকের লিখন বিষয়ক চিন্তা পাঠের সূত্রে বুঝে নিতে চাইব - কেমন করে নানান প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমরা আসলে বুঝতে পারছি যে, আমাদের উপরোক্ত আলোচনার সারাৎসারই যেন লেখকদের নিজস্ব বয়াণের মধ্যেও ছড়িয়ে আ। এখানে লেখকদের নিজস্ব লিখন-চিন্তার সূত্রে আমাদের গবেষণার সিদ্ধান্তগুলোকে পাঠ করার চেষ্টা করা যাক।

---

২৪৭ Deleuze Gilles, *Cinema 2*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1989

২৪৮ Morris Pam(ed), *The Bakhtin Reader*, Arnold, London, 2003, P- 88-96

লেখকদের কথা

এই অংশের আলোচনায় প্রবেশ করার আগে আমরা স্মরণ করে নিতে পারি দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি অংশ - যে অংশে আমরা আমাদের গবেষণার পদ্ধতি বিষয়ে খানিকটা আলোচনা করেছিলাম। পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছিলাম আমাদের গবেষণা কেবলমাত্র বিখ্যাত লেখকদের সাহিত্য এবং তাদের নিজস্ব বক্তব্যের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে পারত কিংবা কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস ও বাঁকবদলগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারত অথবা কেবলমাত্র সাহিত্যের দর্শণকেন্দ্রীক নিবিড় আলোচনা হতে পারত – এইসমস্ত আলোচনার কোন একটা দিক নিয়ে মেতে উঠলে, হয়ত ‘লেখার কাজ’ – বিষয়টিকে যথেষ্ট বহুমাত্রিক পন্থায় আলোচনা করা সম্ভবপর হত না বলেই আমার ধারণা। সেই হেতু, অন্যান্য প্রসঙ্গগুলির পাশাপাশি – লেখকদের নিজস্ব লেখালিখি বিষয়ক আলোচনার মধ্যেও আমাদের গবেষণার আলোচনা থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলির এক ধরণের মূল্যায়ন প্রয়োজনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লেখকের কথা’ – গ্রন্থের ‘কেন লিখি’ অংশটি প্রথম ১৯৪৪ খ্রীঃ ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক সংঘের তরফ থেকে ‘কেন লিখি’ নামক সংকলনে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনটির সম্পাদক ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও প্রণব বিশ্বাস। এই সংকলনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি – লিখেছিলেন, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখেরা। এই বিশেষ সংকলনটি, পরবর্তীকালে পুণঃ প্রকাশিত হয়েছিল – সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়, ২০০০ সালে। পরবর্তী মুদ্রণে শ’খানেক লেখকের ‘লেখালিখি’ বিষয়ক লেখা সংকলিত হয় এই গ্রন্থে। বাংলার প্রায় সমস্ত সুনামি লেখকেরা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছেন – দক্ষিণারঞ্জণ মিত্র থেকে আরম্ভ করে কবি জয় গোস্বামী পর্যন্ত। সকল লেখকের মতামত বিষয়ে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে, যে সিদ্ধান্তগুলির উপর ভিত্তি করে, লেখার কাজের তর্কটিকে বাংলা সাহিত্যের গোঁড়ার তর্ক বলে দাবি করতে চেয়েছি, সেই সিদ্ধান্তগুলির কিছুটা বিস্তার এই গ্রন্থের মধ্যে খুঁজে দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য। সমগ্র গ্রন্থটি থেকে কয়েকটি প্রসঙ্গ আমরা উদ্ধার করে নেব কেবল পর পর, তার পর তাদের বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হবো –

১। লেখক শচিন সেনগুপ্ত ঠাট্টা করেই যেন, তাঁর আলোচনায় লিখতে চেয়েছেন, লেখকের যখন লেখা বের হয়না তখনই ‘কেন লিখি’ – প্রশ্নটা নাড়া দেয়।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, শচিন সেনগুপ্তের বক্তব্যের মধ্যে এক ধরণের বন্ধ্যত্ব এবং অনাবশ্যকতা ও দুর্বলতা, তদুপরি ‘অকারণে’র একটি যুক্তি আছে। অর্থাৎ লিখন তার সম্ভাবনাময় চলনগুলির প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে - ফুরিয়ে যেতে থাকলেই যেন সে সীমানায় গিয়ে ধাক্কা খায় এবং উন্মুক্তির তরে উদ্যত হয়। তখনি একজন লেখক তাঁর নিজের কাজের মৌলিক কারণটি বিষয়ে প্রশ্ন-শীল হয়ে ওঠে।

২। ধূর্জটিপ্রসাদ সেনগুপ্ত লিখেছিলেন,

"আমি অন্তত জানি আমি তৃতীয় শ্রেণীর লেখক, প্রাণপণে চেষ্টা করি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে। সেই জন্যই বোধহয় কেন'র চেয়ে কেমনের দিকে আমার পক্ষপাত। বলা বাহুল্য এটা আমার বিনয় নয় – কারণ চতুর্থ শ্রেণীর লেখক এখনও নির্মূল হয়নি বাংলাদেশ থেকে।[২৪৯]"

এই শ্রেণী বিভাজনের কাহিনীটিকে ব্যবহার করে, আমার মতে লেখক বলতে চাইলেন - সমস্ত লেখকের লেখার কারণ একরকম নয় তথাপি ওনার মধ্যে মধ্যমানের লেখক থেকে উচ্চমানের লেখক হওয়ার প্রচেষ্টা আছে, লক্ষ্য আছে। ঠিক কোন ধরণের শর্তাবলী - এই ধরণের লেখাগুলিকে একে অপরের থেকে পৃথক করে, সেটা নিশ্চিত করে বলা যেকোনো লেখকের পক্ষেই শক্ত আমরা জানি কিন্তু কোন এক অজানার টানে, সেই টানের প্রতি দায়বদ্ধতায় - প্রথম সারির লেখকেরা অন্যদের তুলনায় পৃথক হয়ে যান, হয়ত ঠিক যেমন করে কেরানীর লেখালেখি থেকে, সৃজনশীল লেখকের লেখা আদর্শগত ভাবে আলাদা হয়ে যায়। মানিক এখানেই গভীর জীবনদর্শনের কথা বলবেন হয়ত। আমরা বলব অ(ন)ভিজ্ঞতার শ্রমের কথা।

৩। অমিয় চক্রবর্তী তাঁর লেখায় চেতনা, মন ও রহস্যের প্রসঙ্গে লিখেছেন। লিখনের সঙ্গে এর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। লেখকের লিখনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে অপরের তরে উন্মুক্ত করার মধ্যেই রহস্য, চেতনা, লগ্নতা ও সম্বন্ধের তর্ক নিহিত আছে।

৪। মনোজ বসুর লিখন দর্শনে আমরা খুঁজে পাব ভবিষ্যৎবাদের স্পষ্ট তর্ক –

"কেন লিখি তবে ? ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখি তাই লিখি।[২৫০]"

৫। বিষ্ণু দে লিখেছেন,

"সুভাষ তোমার সরল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মোটেই সহজ নয়...তোমার এ প্রশ্নের জবাব রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব হত..."[২৫১]

বিষ্ণু দে'র এই বক্তব্য, আমাদের গবেষণার যৌক্তিকতাকে আবার মনে করিয়ে দেয়, কেন আমাদের আলোচনা রবীন্দ্রনাথ থেকে উঠে আসারই প্রয়োজনীয়তা ছিল, কেন রবীন্দ্রনাথের লিখন-চিন্তার সঙ্গে, আমাদের আলোচনা

---

[২৪৯] সুভাষ মুখোপাধ্যায়(সম্পা), *কেন লিখি*, মিত্র ও ঘোষ, কোলকাতা, ২০০০। পৃ-৮

[২৫০] সুভাষ মুখোপাধ্যায়(সম্পা), *কেন লিখি*, মিত্র ও ঘোষ, কোলকাতা, ২০০০। পৃ-২২

[২৫১] সুভাষ মুখোপাধ্যায়(সম্পা), *কেন লিখি*, মিত্র ও ঘোষ, কোলকাতা, ২০০০। পৃ-২৮

অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংযুক্ত। আমরা তথাকথিত ‘সম্বন্ধ’ আলোচনা প্রসঙ্গে - মার্ক্সের উৎপাদন গত সম্পর্ক এবং তথাকথিত নান্দনিক কিংবা শিল্পের উদ্বৃত্তগত সম্বন্ধের তফাৎ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। নানান সূত্রে কিভাবে এদের ভেদরেখাটুকু রহস্যজনকভাবে ক্রিয়াশীল সে বিষয়েও আলোচনা করেছি। বিষ্ণু দে যদিও কিছু মানবতাবাদী লঘুকরণের ফাঁদে পড়েছেন, তথাপি সম্বন্ধ বিষয়ে ওনার একটি বক্তব্য উল্লেখযোগ্য –

“লেখক ও পাঠকের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই human relation, production relation নয়। আর এই মানব-সম্বন্ধ একাধারে ব্যাপক ও গভীর, এর কাজ চৈতন্যে ও অবচেতনে, আশু ও সময়সাপেক্ষ, বিকাশ, আরোপ নয়।[২৫২]”

সম্বন্ধ বিষয়ে বিষ্ণু দে যে বক্তব্য রেখেছেন, তার মধ্যে কিছুটা ওনার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও প্রধানত – উনি সম্বন্ধ বিষয়ে গভীরতর আলোচনার হদিশ দিয়েছেন। সম্বন্ধ এবং উৎপাদন বিষয়ে আমরাও আলোচনা করেছি, কেন তা লেখার কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সে বিষয়েও উল্লেখ করেছি – যদিও সম্বন্ধ বিষয়ে ওরকম নির্দিষ্ট করে উৎপাদনের ভূমিকাকে আমরা সরিয়ে রাখতে পারিনা - যে কারণে উৎপাদন বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমাদের গবেষণায়। কিন্তু আমাদের আলোচনার খুব উজ্জ্বল সাক্ষ্য হিসেবে বিষ্ণু দে-র ‘কেন লিখি’ নামক লেখাটির কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৬। বিমল কর লিখেছিলেন,

“একজন শিল্পী কেন ছবি আঁকেন, গায়ক কেন গান করেন – এমন কথা জানতে চাইলে তাঁরা কতটা সঠিক উত্তর দিতে পারবেন জানিনা। রসতত্ত্ব মান্য করলে বলতে হবে, সব রকম শিল্প-সৃষ্টির মূলে রয়েছে, আনন্দ। আত্মতৃপ্তি। কথাটা অস্বীকার করা মুশকিল।”[২৫৩]

একটি জরুরি বিষয় এক্ষেত্রে লক্ষ করবার মতন, রসতত্ত্ব ও লিখণতত্ব তথা কেন লিখির সম্বন্ধটা যে আমরা আবিষ্কার করেছি আমাদের গবেষণায় - এমনকি তার সঙ্গে যে উৎপাদন ও শ্রমতত্ত্বের অনুষঙ্গ-মূলক সম্বন্ধকেও টেনে এনে আলোচনা করেছি বারং বার – এর কোনটাই আমাদের মন গড়া বা জোর করে টেনে এনে আলোচনা করা কোন তর্ক নয়, এই তর্কের সম্ভাবনা বাংলা লেখা লিখি বিষয়ক আলোচনার মধ্যেই নিহিত আছে। নন্দনতত্ত্ব, শ্রমতত্ব, ভাষাতত্ত্ব নানা প্রসঙ্গেই আমরা ‘সম্বন্ধে’-র তর্কটিকে খুঁজে পেতে পারি - প্রাগাধুনিক, আধুনিক নানা ক্ষেত্রেই – নানা ভাবে। বিমলকর-ও সেরকমই একটি প্রেক্ষিত থেকে বলতে চেয়েছেন, যে রসবাদীদের মধ্যে যে নান্দনিক দিকটির আভাস আছে, সেটিকে অস্বীকার করা - খুব সহজ নয়। সেটা শিল্প বা সাহিত্যের তর্কে নানাভাবে ফিরে ফিরে এসেছে।

---

[২৫২] তদেব

[২৫৩] সুভাষ মুখোপাধ্যায়(সম্পা), *কেন লিখি*, মিত্র ও ঘোষ, কোলকাতা, ২০০০। পৃ-৫৮

৭। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখার মধ্যে উঠে এসেছে, লেখার কাজের একটি রোজকার ব্যবহারিক দিকের প্রসঙ্গ। এই বিষয়ে উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই উনি উল্লেখ করেছেন - অপূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণতার দিকে যাওয়ার প্রসঙ্গ[২৫৪]। বক্তব্যটি আমাদের লিখনের সংক্রান্ত আলোচনায়, লেখার আপন সীমানা লঙ্ঘন এবং একই সঙ্গে অপরের প্রতি কর্তব্য-শীল থাকার তর্কের মধ্যেই আলোচিত।

৮। অনেকানেক লেখকদের মধ্যে, শঙ্খ ঘোষের লেখায় মুখ্যত অসম্ভবের প্রসঙ্গটিকে আমরা খুঁজে পাই। সম্বন্ধ, লেখার মুক্তি ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ আলোচনার সূত্রে আমরা – অসম্ভবের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছি। পরিমেয়ের পরিসর আসলে সম্ভবের পরিসর - গণনের পরিসর কিন্তু অপরিমেয়ের অনুষঙ্গেই উঠে আসে - অসম্ভবের তর্ক। যে সম্বন্ধ বিষয়ে আমরা লেখার কাজের আলোচনায় তিনটি অধ্যায়ে কথা বলেছি – তাকে আমাদের বুঝতে গেলে অসম্ভবের শর্তেই একমাত্র বোঝা সম্ভবপর হবে।

৯। এই গ্রন্থের আরও নানান লেখকদের মধ্যে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের লেখাটি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ওর লেখার মধ্যে বিশেষত নানাত্বের প্রসঙ্গটি উঠে আসছে[২৫৫]। আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করেছি পূর্বেই - লিখন লঙ্ঘনকারী, যে লিখন উন্মুক্তির প্রতি ধাবমান – সেই লিখনের নানা রূপ নানা সংরূপ হতে পারে, বিশেষত কবিতা বা গদ্যের এক্ষেত্রে কোন বিভাজন হতে পারেনা। যে বৃহৎ অর্থে লিখন বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি – সেই অর্থে সাহিত্যের সংরূপগত কোন বিভাজন আলাদা করে উল্লেখযোগ্য নয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘কেন লিখি’ – সংকলনটিতে আরও অনেক বিখ্যাত বাঙালি লেখকদের লেখালিখি বিষয়ক জবানবন্দী খুঁজে পাই আমরা, সেই জবানবন্দিগুলির মধ্যে নানা ধরণের গল্প ও তর্কের মধ্যে দিয়ে আসলে লেখার কাজের মূল যে তর্কটি ঘুরে ফিরে এসেছে তা প্রকারান্তরে অ(ন)ভিজ্ঞতার শ্রমের তর্ক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০০ সালে বাংলাদেশ থেকে বৈদ্যুতিক সংস্করণে একটি ‘কেন লিখি’ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, জনৈক আকাশ অম্বর নামক সম্পাদকের সম্পাদনায়, এই নামটি সম্ভবত কাল্পনিক নাম। এই গ্রন্থের মধ্যেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘কেন লিখি’ গ্রন্থটির কয়েকটি লেখা পুনঃ-প্রকাশিত হয়েছে – তার মধ্যে আছেন জীবনানন্দ দাশের ‘কেন লিখি’ নামক লেখা, মহাশ্বেতা দেবীর লেখা, ইত্যাদি। বাংলাদেশের কয়েকজন লেখকের জবানবন্দিও এখানে প্রকাশিত হয়েছে – যেমন আহমেদ ছফা। এছাড়া বিদেশী লেখকদের, নিজের লেখা লিখি বিষয়ক টুকরো লেখা পত্র, যেমন – স্যামুয়েল বেকেটের লেখা। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলায়, নানাবিধ ছোটখাটো পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, যাদের মধ্যেও

[২৫৪] সুভাষ মুখোপাধ্যায়(সম্পা), *কেন লিখি*, মিত্র ও ঘোষ, কোলকাতা, ২০০০। পৃ-৭৬-৭৯

[২৫৫] কবিতার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, বিশেষ করে, সন্দীপনের লেখাতেই উঠে এসেছে প্রসঙ্গটি – প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্ক্সের এইটিন্থ ব্রুমেয়ারের বিখ্যাত উক্তিটি - “The social revolution of the nineteenth century cannot take its poetry from the past but only from the future.” – সেই ভবিষ্যতের প্রসঙ্গেই যেন একধরণের ইঙ্গিত এখানে। কিভাবে কবিতা অতীত থেকে না উঠে এসে, ভবিষ্যত থেকে আসতে পারে – কোন ভবিষ্যত – যা পরিমেয়, যা অনুমেয় নাকি যা অসম্ভব যা অনির্ণেয় যা অনিশ্চিত ! সেই অনুল্লেখিত বিস্ফোরণের তর্ক সন্দীপণের লেখার আবডালে রয়ে গেছে।

নানা সময় বিদেশী এবং বাংলার লেখকদের লেখালিখি বিষয়ক জবানবন্দি প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের এই অংশের আলোচনায় আমরা সেরকম কয়েকটি সংকলন বিষয়ে উল্লেখ করব এবং তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু লেখা বিষয়ে আলোচনাও করব। যে উৎসগুলি থেকে আলোচনা করব – তাদের মধ্যে প্রধানত আত্মজীবনীমূলক লেখালিখিতে সমৃদ্ধ কয়েকটি পত্রিকার সংখ্যা, বিখ্যাত লেখকদের নিজস্ব লেখালিখি বিষয়ে লিখিত দুয়েকটি পত্রিকা সংখ্যা, এছাড়া লেখকদের প্রকাশিত সাক্ষাতকার, নিজের লেখালিখির ব্যক্তিগত ইতিহাস বিষয়ক লিখিত গ্রন্থ প্রভৃতি। এই ধরণের লেখালিখিগুলি প্রধানত ব্যক্তিগত তথ্যে সমৃদ্ধ লেখা। এই ধরণের বক্তব্যে সকল লেখকেরা খুব সচেতনভাবে লিখন নামক কার্যটিকে দার্শনিক অর্থে ধারণাধীন করবে বলে লিখতে বসেননি। যে ধরণের উদাহরণ আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অমিয়ভূষণের লেখালিখির মধ্যে খুঁজে পাই, সেই ধরণের দার্শনিকতা যে সবসময় অন্যান্য লেখকদের বক্তব্যে খুঁজে পাবো এই প্রত্যাশা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ বাকি লেখকেরা লিখনকে দার্শনিক-ভাবে বিশ্লেষণ করবেন বলে যে সবসময় লিখেছিলেন তা ঠিক নয়। প্রত্যেক লেখকেরই নিজস্ব একটা লিখনের গল্প থাকে, বাল্য থেকে বার্ধক্য অবধি লেখালিখির নানাবিধ ওঠা নামা, ব্যক্তিগত সংগ্রামের কাহিনী থাকে, কিন্তু সেই কাহিনীগুলির মধ্যে থেকেই আমরা খুঁজে দেখব আমাদের তর্কেরা সেই সব লেখকদের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় নিজেদের স্থান খুঁজে পায় কিনা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থটি থেকে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধার করলেই স্পষ্ট হবে, আসলে ওনার গ্রন্থের মধ্যে কিভাবে লেখার কাজের ধারণা আসলে, আমাদের তর্কের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ রূপে বিদ্যমান -

"জলাঞ্জলি দেবার সংকল্পটিকে কাজে পরিণত করবার জন্য কর্মজীবনে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। ধানচালের হিসেবের কাজ নয়; ওতে মনই উঠল না। কাজ, দেশসেবার কাজ। কংগ্রেসের আদর্শে খানিকটা গঠনমূলক কাজ হলেও কংগ্রেসের কাজ নয়... ওখানকার আবালবৃদ্ধ বণিতার সঙ্গে পরিচয় করে ফিরে আসি... মন কর্মের তৃপ্তিতে ভরে উঠল।"[২৫৬]

কাজের দর্শনে নিযুক্ত হওয়ার মধ্যে, নিজেকে জলাঞ্জলি দেওয়া, আরেক অর্থে সঁপে দেওয়া, উন্মুক্ত করে দেওয়ার যে ভাব আছে – সেই বিষয়েই আমরা লেখার কাজ বিষয়ক আলোচনায় লিখেছি বারং বার। এই গ্রন্থেই অন্য আরেকটি জায়গায় তারাশঙ্কর লিখছেন –

"মনে আছে এই বেদনার জন্য কয়েকদিন ঘরে বসেছিলাম। যেমন বসে থাকা অমনি আবার মনের মধ্যে লেখার বাসনা জেগে উঠল।"[২৫৭]

---

[২৫৬] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন*, বেঙ্গল পাব্লিসার্স, ১৩৬০বঙ্গাব্দ, পৃ-২৫

[২৫৭] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন*, বেঙ্গল পাব্লিসার্স, ১৩৬০বঙ্গাব্দ, পৃ-৩২

এখানে তারাশঙ্কর অবসর, অকর্মণ্যতার সঙ্গে সৃজনশীলতার সংযোগ বিষয়ে, জরুরি ইঙ্গিত লিখে রেখেছেন বলে মনে হয়। কি সেই জরুরি ইঙ্গিত, তার অন্যরকমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে আসব, আপাতত আমরা এই গ্রন্থ থেকেই খুঁজে দেখব - কেমন করে এই কাজের ধারণা ও লেখার ধারণা নিজেকে সঁপে দেওয়ার, নিজেকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে –

"এতকালের জীবনে শান্তি পাইনি – তবে আভাষে অনুভব করেছি – আছে। রচনাকালে তন্ময়তার মধ্যে তাকে বোধ করি সকল লেখকই পান।"[২৫৮]

যে সবিশেষ অ(ন)ভিজ্ঞতার কথা আমরা বারংবার লিখেছি – এখানে তন্ময়তার মধ্যে দিয়ে, সেই অজানার কথাই আলোচনা করা হচ্ছে বলে মনে হয়। এছাড়া দুটি অংশে মানিকের বক্তব্যের সঙ্গে তারাশঙ্করের বক্তব্যের সরাসরি সংযোগ আছে –

"আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তা থেকেই আমি আমার উপলব্ধি-সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম।"[২৫৯]

এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে তন্ময়তা বা আমরা যাকে বার বার বলেছি অ(ন)ভিজ্ঞতা - তা মানিকের ক্ষেত্রেও, তারশঙ্করের ক্ষেত্রেও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অভিজ্ঞতার বৈভাষিক বা অনুভাবিক পরিসরভিন্ন লিখনের অনভিজ্ঞতা সম্ভবপর নয়। সেই কারণেই লিখনের এই সূক্ষ্ম তর্কটি যে কোন শ্রেণীর লেখকদের ক্ষেত্রে খুব বেশি আলোচ্য নয়, এটা যে কোন শিল্পের ক্ষেত্রেই সত্য – তেমন তেমন মাপের কোন লেখক না হলে, লিখন-তত্ত্বের এই সুগভীর তর্কের প্রেক্ষিতে তাদেরকে বিশ্লেষণ করার কোন অর্থই থাকেনা। দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিয়ে, মানিক এবং আমাদের সমস্ত গবেষণার সঙ্গেই তারাশঙ্করের আরেকটি সম্বন্ধ তৈরি হয়, তা হল –

"হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝলাম।"[২৬০]

মানবকেন্দ্রীকতার লঘুকরণের সম্ভাবনা, অনেকের মতই তারাশঙ্করের মধ্যেও আছে এবং আমি বার বার এই সম্ভাবনাকে মেনে নিয়েই, এদের মধ্যে ক্রমাগত একটি ভবিষ্যচেতনাকে পাঠ করে চলেছি – কারণ সেই চেতনাও ভীষণই উজ্জ্বল-ভাবে পরিস্ফুট অনেকের মতই তারাশঙ্করের বক্তব্যেও। এই সূত্রেই, কাজের ধারণার সঙ্গে লেখার ধারণা, তার সঙ্গে নিজেকে সঁপে দেওয়ার ধারণা – এই সমস্তটাই আমাদের লেখার কাজ বিষয়ক তর্কটির সঙ্গে

---

[২৫৮] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন*, বেঙ্গল পাব্লিসার্স, ১৩৬০বঙ্গাব্দ, পৃ-৬৯

[২৫৯] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন*, বেঙ্গল পাব্লিসার্স, ১৩৬০বঙ্গাব্দ, পৃ-৯২

[২৬০] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন*, বেঙ্গল পাব্লিসার্স, ১৩৬০বঙ্গাব্দ, পৃ-৯৩

সাযুজ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে বলেই মনে হয়। সেই অর্থে তারাশঙ্করের মধ্যেও আমরা আমাদেরই লেখার কাজের তর্কটির অনুরণন খুঁজে পাই।

আমাদের গবেষণার মূল আলোচনার পাশাপাশি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন যদি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কেও যদি পাঠ করি তাহলে তার বক্তব্য থেকেও কি আমরা সাযুজ্য-পূর্ণ কিছু পেতে পারি? এর উত্তর হিসেবে বলব, বিভূতিভূষণের দিনলিপি প্রধানত রোজের কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত তথ্যে পূর্ণ, ওনার বক্তব্যের খুব কম অংশেই লেখালিখি বিষয়ে দার্শনিক অর্থে সবিশেষ কিছু কথাবার্তা উঠে এসেছে। দুয়েকটি বাক্য উদ্ধার করে, ওনার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের মিলের জায়গাটুকু খুঁজে দেখার চেষ্টা করব –

"এ পৃথিবীর একটা Spiritual Nature আছে, আমরা এর গাছপালা, ফুল ফল, আলো ছায়া, আকাশ বাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি বলে, এর প্রকৃত রূপটি ধরা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন হয়ে পড়ে।"[২৬১]

এই বক্তব্যের মধ্যে জীবনদর্শন এবং দৈনন্দিন বা পরিমেয় রোজকার দেখাদেখি থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার ইঙ্গিত আছে যেন, কথাটা খেয়াল করে দেখার, জগতের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কথা বলা হচ্ছে, মানুষের নয় আলাদা করে। সেই আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উদ্ঘাটন যেন লেখালিখির কারবারের অংশ হতে পারে। এই ধারণা আমাদের মতে অনেক বেশি পরিমেয় এবং অপরিমেয়ের তর্কের দিকেই ইঙ্গিত করে যেন। অবভাস বিদ্যার চোখ দিয়ে যেন বিভূতিভূষণ দেখছেন বলা চলে। একই সঙ্গে, আমাদের আলোচনায় শ্রমসময় বা কাজের সময় বিষয়ে আমরা নানারকমের আলোচনা করেছিলাম, বিশেষত তার পরিমাপ ও তার মধ্যে পরিমাপের অধরা অংশের ইঙ্গিত – এই সব মিলিয়ে আমাদের আলোচনায় সময় বারং বার ফিরে ফিরে এসেছে। বিভূতিভূষণ লিখছেন –

"Time একটা প্রকাণ্ড Element, মানুষের ব্যাপারে এটা বুঝেছি – মহাকাল। কিনা করে দিতে পারে মহাকাল। এর রসায়ন অদ্ভুত।"[২৬২]

ভারতীয় দর্শনে, কাল কী? মহাকাল কী? এইসব তর্কে না গিয়েও বলতে পারি - যে অবিরাম দেখার কথা উল্লেখ করেছি পূর্বে, লেখকের 'জীবনদর্শনে'র যে যুক্তি মানিকের মধ্যে আমরা পেয়েছিলাম, সেইরকম লেখকচিত কর্মকাণ্ডে ঠাসা বিভূতিভূষণের সমস্ত দিন, সমস্ত জীবন। সারাক্ষণ তিনি যেন লেখক হয়ে, একটি ঘটনা থেকে আরেকটি ঘটনাকে দেখে শুনে নিংড়ে নেওয়ার জন্য ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছেন – ওনার দিনলিপি পাঠ করলে এমনটাই বোধ হয়।

---

[২৬১] বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভুতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি*, (সম্পা। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়), নাথ ব্রাদার্স, কোলকাতা, ১৯৬০, পৃ- ১১

[২৬২] বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভুতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি*, (সম্পা। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়), নাথ ব্রাদার্স, কোলকাতা, ১৯৬০, পৃ- ২৩

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রমাপদ চৌধুরীর 'লেখালিখি' নামক গ্রন্থটি থেকে কয়েকটি টুকরো বাক্য উদ্ধার করে এনে হাজির করলে ওনার বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের তর্কের মিল বা অমিলের অংশগুলি স্পষ্ট হয় –

"কালি, কলম, মন – লেখে তিনজন। প্রতিভাধরদের কথা বলতে পারিনা। শুনেছি তাঁদের ওপর ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হয়। কিন্তু আমাদের মত যারা নেহাতই চেষ্টা করে খাটো মাপের সাহিত্যিক হতে পেরেছেন, তাঁদের যেমন কেউ সোনার কলম কিংবা রূপোর দোয়াত উপহার দেননা, তেমনি মন বস্তুটিকেও তাঁদের তৈরি করে নিতে হয়।"[২৬৩]

মানিকের বক্তব্যের সঙ্গে রমাপদের বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রায় একই – লেখকের নিজেকে গড়ে নেওয়ার বিরাট একটি দায় থেকে যায় – এই গড়ে নেওয়ার কার্য কি কেবল, লেখা অভ্যাস করা – মোটেও তা নয় বরং তা আসলে জীবন দর্শন তথা জীবনদর্শনের প্রশ্ন। প্রায় একই প্রসঙ্গে রমাপদ মতাদর্শকে অপ্রত্যাশিত ভঙ্গিমায় ব্যাখ্যা করেছেন, সম্ভবত লেখার কাজের ক্ষেত্রে মতাদর্শের কাজ এভাবে আর কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেনি। তিনি লিখেছেন –

"...আমরা কেউ অর্থের গোলাম, কেউ অনুরোধের গোলাম, কেউ চিন্তার গোলাম, কেউ আশঙ্কার, আতঙ্কের, লোভের, অহংকারের। আপন মন-মর্জিতে আমাদের ক-জনের বাঁশী বাজে?"[২৬৪]

মতাদর্শের গোলাম হয়ে যদি লেখক লেখেন তাহলে সেটাকি প্রকৃত অর্থে লেখা হল? যে লেখা সংযোগের তরে উন্মুক্ত, যে লেখা সত্যকারের দায়বদ্ধ – তেমন লেখার কাজে এই গোলামী থাকতে পারেনা – এমনটাই রমাপদ বলতে চাইছেন। এতদূর অবধি আমরা লেখার কাজ ও মতাদর্শ বিষয়ে যা যা আলোচনা করেছি আমাদের গবেষণায় – সেখানে এত সূক্ষ্মভাবে মতাদর্শকে বিচার করা হয়নি আর কারো লেখায়। মানিক জীবনদর্শন বলতে যে গভীর মতাদর্শের কথা বলবেন – তাঁর প্রকৃষ্ট বিশ্লেষণ যেন আমরা রমাপদ-র লেখায় খুঁজে পাই।

'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২ বঙ্গাব্দ এবং ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে - খ্যাতনামা লেখকদের জবানবন্দীগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। যাদের মধ্যে ছিল, মহাশ্বেতা দেবী, মতি নন্দী, দেবেশ রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, নিহাররঞ্জন গুপ্ত, বিমল মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখেরা। এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই মুখ্য হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত গল্পগুলি। যে গল্পের মধ্যে ঐ সব লেখকদের লেখক হয়ে ওঠার ঘটনাগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। পূর্বে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সংকলিত যে গ্রন্থটির উল্লেখ করেছিলাম – সেটি তুলনামূলক ভাবে কিছুটা বেশি লিখনের দর্শনমূলক একটি গ্রন্থ ছিল। সেই গ্রন্থের বেশীর ভাগ লেখাই লেখার প্রক্রিয়াটিকে বেশ কিছুটা কাটাছেঁড়া করে তবেই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা করেছিল। অন্যদিক থেকে দেখলে, দেশের এই দুটি সংখ্যার লেখাগুলি চরিত্রগত-ভাবে ততখানি

[২৬৩] দেশ পত্রিকা, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃ-১

[২৬৪] দেশ পত্রিকা, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃ-৩৪

বিশ্লেষণাত্মক লেখা নয়, মূলত গল্প – ফলে আবারও সংকলন দুটি থেকে গুটিকয় বাক্য উদ্ধার করে এনে আমাদের গবেষণার তর্কটির প্রেক্ষিতে সেগুলিকে পাঠ করার চেষ্টা করব –

১। "আমি/ আমার লেখা" নামক লেখায়, মহাশ্বেতা দেবী-র তর্কে প্রাথমিকভাবে যে বক্তব্যটি ফুটে উঠেছে তাহলো - তীব্র ভবিষ্যৎ চেতনা – "আমরা ভুলে গেলাম, আমরা বাঁচি সন্তানদের, উত্তরপুরুষের মধ্যে। এই সততা ও সাহসিকতার অভাব কি উত্তরপুরুষ ক্ষমা করবে? শুধু শরীর বাঁচলে কি আমি বাঁচব?"[২৬৫]

আরও লিখেছেন,

"লেখায় আমি আপাত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করায়, বিচার করায় সময়কে দলিলীকরণে বিশ্বাস করি। কেননা একমাত্র সেভাবেই আমার মতে, উত্তরণ সম্ভব বৃহত্তর, আরও মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ কোন আকাশে।"[২৬৬]

এই দুটি বক্তব্যেই আমরা মহাশ্বেতা দেবীর তীব্র ভবিষ্যৎ চেতনার খবর পাই। লেখার কাজ ও ভবিষ্যতের প্রতি দায়বদ্ধতাকে এক হয়ে যেতে দেখি।

২। খুব জরুরি একটি বিষয়, যা নিয়ে আমরা এর পূর্বে কেবল উল্লেখ করেছি মাত্র - সৃজনশীলতা বা লিখনকে অনেকসময় মহিমান্বিত করার মধ্যে দিয়ে সমালোচকেরা উক্ত কাজের মৌলিক গতিটাকেই ধরতে অপারগ হন। এই কাজের মধ্যে এমন এক ধরণের আবশ্যিকতা আছে - যা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই লেখকদের ক্ষেত্রে অজানা তাড়নার মতো কাজ করে, ফলে এই প্রবৃত্তিকে যে কেবলমাত্র ঐশ্বরিক বরদানের মত কল্পনা করতে হবে তার অর্থ নেই। বোদলেয়ার যে অর্থে লেখার কাজ কে বুঝবেন, সম্ভবত সেই বোঝা নিশ্চিতরূপে শয়তানের অভিশাপের সামিল হবে - যদিও তাড়নার বোধ, তাড়নার বেগের অনুষঙ্গটি একইরকম থাকবে। ঠিক যেন সেরকম এক অর্থেই সুধাংশু ঘোষ, লিখেছেন –

"কিসের তাগিদে, কাদের উৎসাহে আবার শুরু করি – কেন আমার এ অসুখ সারেনা, বলতে গিয়ে নিজের কেচ্ছা এসে যায়।"[২৬৭]

বলাবাহুল্য, অসুখ বলতে সুধাংশু এখানে লেখার কাজের কথাই বলছেন। উপসংহার অংশে আমরা লেখা ও অসুখ বিষয়ে আলোচনা করব আরেকটুখানি বিস্তারিত ভাবে।

৩। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের একটি বক্তব্যে, আমরা আবার খুঁজে পাব - মানিকের জীবনদর্শন ও অভিজ্ঞতার তর্ক –

---

২৬৫ দেশ পত্রিকা, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃ-৮০

২৬৬ দেশ পত্রিকা, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃ-৯০

২৬৭ দেশ পত্রিকা, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃ-১০০

"সাহিত্যে লেখকের বাস্তব জীবনের সঞ্চিত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন হয়। আমার লেখার পিছনে কী ধারণা, কোন দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপকরণ রয়েছে, এসব হল তারই সমীক্ষা।"[২৬৮]

৪। ব্যক্তি মানুষ এবং ব্যক্তি লেখক নিয়ে আমরা বার বার আমাদের তর্কে ফিরে ফিরে এসেছি – কবিতা সিংহের "বিলু ও ছটি মরচে পড়া আলপিন" লেখায় ও লিখছে –

"সাগরবাবু, আপনি লেখক জীবনের কথা লিখতে বলেছেন। কিন্তু যতদিন রক্তমাংসে বেঁচে আছি ততদিন তো নিজের জীবন থেকে তা অসম্পৃক্ত করতে পারিনে? কেইবা পেরেছেন? মানিক – বিভূতি – তারাশঙ্কর থেকে সুবোধ ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর? সমরেশ?

যারা লেখক জীবন আর নিজের জীবনকে চমৎকার ভাবে আলাদা রাখতে পারেন ঈশ্বর তাঁদের রক্ষা করুণ।"[২৬৯]

খুব সূক্ষ্ম অথচ খুব জরুরি কতগুলি কথা কবিতা এখানে উল্লেখ করেছেন, ব্যক্তি মানুষ ও ব্যক্তি লেখকের পৃথকত্ব ও সম্বন্ধ বিষয়ে এখানে দীর্ঘ আলোচনা করা সম্ভব - কিন্তু আমাদের সে সুযোগ বা পরিকল্পনা এখানে নেই।

৫। 'গদ্যের গার্হস্থ্যে' নামক লেখায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছে –

"কী লিখতে চাই? কেন লিখি? এমন কূট প্রশ্ন অনেকে করেন আজকাল। বিশেষত সভা-সমিতিতে। তখন আমি একটা-দুটো গদ্য পড়ি। বলি, এরকম কিছু কিঞ্চিত লিখেছি। বলুন দেখি, ঠিক লিখেছি কিনা ? উত্তর থাকেনা তখন, জানাই কথা। আরে মোলো, যদি সে কথাটাই জানতাম, তাহলে লেখে কে ? লিখতে পারছি, লিখছি। যখন পারবোনা, তখন লিখবো না। লেখা শুরু করেছি বিশ-বাইশ বছরে, কিংবা তারও পরে। তার আগে তো লিখিনি একদম। আঠারো বছর বয়সী মহাকবির খবর তো জানাই ছিলো। তাহলে লিখিনি কেন?"
[২৭০]

এই প্রসঙ্গে জরুরি প্রসঙ্গও হল – শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'কেন লিখি?' - প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আসলে, পাঠকে আরেকটি প্রতিপ্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন – একটা লেখা সামনে রেখে প্রশ্ন করেছেন, লেখাটা কি ঠিক লেখা হয়েছে? অসাধারণ একটি প্রশ্ন সন্দেহ নেই। এর থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়, অদ্ভুতভাবে যেন 'কেন লিখি' – প্রশ্নটির সঙ্গেই যে কোন সাহিত্যের যাথার্থ্যের প্রশ্নটিও সংযুক্ত। লিখন বিচারে, ন্যায়ের প্রশ্নটিকে সরিয়ে রেখে, 'কেন লিখি' – প্রশ্নটিকে নিয়ে আলোচনা করা খুব একটা ন্যায়সঙ্গত হবেনা। আমাদের গবেষণার মধ্যেও এই প্রবণতা বিদ্যমান।

---

[২৬৮] দেশ পত্রিকা, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃ-১১৭

[২৬৯] দেশ পত্রিকা, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃ-১২৬

[২৭০] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *গদ্যের গার্হস্থ্যে,* দেশ পত্রিকা, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃ-১৬৯

আমরা 'কেন লিখি' তথা লেখার কাজ বিষয়ে আলোচনা করতে নেমে, ক্রমে যাথার্থ্য বা ন্যায়ের প্রসঙ্গে পর্যায়ক্রমে এসে উপস্থিত হয়েছি। কাজেই নৈতিকতাকে বাতিল করে, লেখার কাজ নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়, লিখনের রাজনৈতিকতার তর্কও নৈতিকতার তর্ককে বাতিল করে সম্ভবপর নয়। নৈতিকতা, ন্যায় ও যাথার্থ্য বিষয়ে আমরা এই অধ্যায়ে অনেকখানি আলোচনা করেছি, শক্তির বক্তব্য প্রসঙ্গে সেই প্রসঙ্গটিকে পুনরায় স্মরণ করে নেওয়া হল এখানে।

'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যা দুটি ছাড়াও 'উলুখড়', 'বৈশাখী', 'দীপন', 'অবকাশ', 'পুরালোকবার্তা', 'রাবণে'র চার-পাঁচটি আত্মকথা সংখ্যা – প্রভৃতি নানান জায়গায়, মূলত ছোট পত্র-পত্রিকাতেই আত্মজীবনী মূলক লেখালিখির মধ্যে, বাংলার লেখকদের নিজস্ব লেখালিখি মূলক বক্তব্য সংকলিত আছে। যুক্তির সূত্রে যতটুকু সম্ভব বিখ্যাত ও যুগান্তকারী লেখকদের জবানবন্দী ও নিবন্ধ থেকে আমাদের গবেষণার তর্কটিকে আলোচনা করার প্রচেষ্টা করলাম। কিন্তু এই দীর্ঘ অসংগঠিত মহাফেজখানাকে সংগঠন করবার জন্য অনেক গবেষকদের পরিশ্রম প্রয়োজনীয় - এটা কোন একজনের পক্ষে বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়। তথাপি যতটুকু পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি পৌঁছতে পারল, তার মধ্যে থেকে আমরা মূল যে তর্কটি খুঁজে পেলাম - তার সুস্পষ্ট ছাপ বাংলা লেখকদের লেখায় প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান – এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'দীপন' পত্রিকার ২০০৬ সালের 'আত্মজীবনী' – সংখ্যাটিতে অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল, সাহিত্যিক সহ আরও নানান কাজের সঙ্গে নিযুক্ত বিখ্যাত বাঙালিদের প্রকাশিত 'আত্মজীবনী'-র একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করেছেন। যে তালিকায় উল্লেখিত বিশেষত সাহিত্য ও শিল্পীর তথাকথিত অনালোচিত আত্মজীবনীগুলির অনুসন্ধান যদি কেউ করে - সে হয়ত আমাদের এই তর্কটির আরও নানা রকমের অনুরণন তার মধ্যে খুঁজে পেতে পারে। ২০১২ সালে প্রতিভাস প্রকাশনা থেকে - কল্যাণ মৈত্রের সম্পাদনায়, 'আলাপ' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে – লেখক-লেখিকাদের অকথিত জীবন ও দর্শন নিয়ে সাক্ষাতকার ইত্যাদি নেওয়া হয়েছে। সেখানে একাধারে যেমন চণ্ডী লাহিড়ী, দিনকর কৌশিক, পূর্ণ দাস বাউলের সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছে – সেরকমই অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, আবুল বাশার, দিব্যেন্দু পালিত বানী বসু – প্রমুখেরও সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিও মূলত ব্যক্তিগতভাবে কতগুলি শিল্পী হয়ে ওঠার গল্প-বিশেষ, যদিও এর মধ্যেও চেষ্টা করলে আমাদের গবেষণার অনুরণন খুঁজে পাওয়া সম্ভব। শেষ দুটি-পত্রিকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আমরা এই অংশের আলোচনায় ইতি টানবো – ২০২০ সালে, মাহমুদ কামাল ও মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সম্পাদনায়, স্বদেশ শৈলী প্রকাশনী থেকে 'কেন লিখি' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আহমদ ছফা, হুমায়ুন আহমেদ, আলমামুদ কিংবা মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বিখ্যাত লেখকদের 'আত্মকথা' মূলক লেখা, যা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে তথা পশ্চিমবঙ্গের বাজারে বারংবার প্রকাশিত ও প্রচলিত – কেবল সেই ধরণের লেখালিখিই শুধু নয় - বলা চলে প্রায় বাংলা দেশের বড়, ছোট ও মাঝারি মাপের যাবতীয় সমসাময়িক এবং কিছুটা পুরাতন লেখকদের লিখন বিষয়ক জবানবন্দী নিয়ে এই সংকলন প্রকাশিত। আমাদের

গবেষণার তর্কটিকে যদি - বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, আলাদা করে বিচার করতে চায় কোন গবেষক – বিশেষত একুশ শতকের প্রেক্ষিতে – তার জন্য এই গ্রন্থ খুবই মূল্যবান হবে বলে আমার ধারণা। সদ্য ২০২২ সালে প্রকাশিত ‘ছাপাখানার গলি’ নামক পত্রিকার দুটি সংখ্যায় – সমসাময়িক পশ্চিমবাংলার অনেক সাহিত্যকারের লেখালিখি বিষয়ক নানাধরনের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কেউ প্রচেষ্টা করলে, সেই দুটি সংখ্যার ভিত্তিতেও আমাদের গবেষণার তর্কটিকে বিচার করে দেখতে পারে - তার মধ্যে দিয়ে, তর্কের আরও অনেক পরত উন্মোচিত হবে সন্দেহ নেই। এই সংখ্যা দুটির মধ্যে প্রথম সংখ্যাটিতে, কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা - সন্দীপ দত্তের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে উনি – ওনার নিজস্ব সংকলনে আত্মজীবনীমূলক কোন কোন পত্রিকা সংরক্ষিত আছে - সে বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ লিখেছেন। বলাই বাহুল্য ওনার সংরক্ষিত পত্র-পত্রিকাগুলি এই ধরণের গবেষণার জন্য অমূল্য সম্পদ।

উপসংহার

অতএব তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখলাম - সাহিত্যের মূল্য আসলে লিখনের যাথার্থ্য এবং আত্ম-অপরের সম্বন্ধের উপরেই নির্ভরশীল। লিখনের সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা এবং মুক্তির পদক্ষেপের সঙ্গে অপরের প্রতি - অজানা, অনির্ণেয়, ভবিষ্যতের প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতাই লেখার কাজের প্রকৃত স্বরূপ। যাকে লেখকের অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতায় কিংবা ভাষা ও লিখন পদ্ধতির আঙ্গিকের, শৈলীর নিয়ম কানুনের সমীকরণে বেঁধে ফেলা সম্ভবপর নয়। লেখার কাজ আসলে, শ্রমের ধরাবাঁধা অর্থনীতির ফাঁক গলে, শ্রমাতিরিক্ত বা বলা চলে অনভিজ্ঞতার শ্রমের কারবার বিশেষ। এমন কিছু যা ঠিক অভিজ্ঞতার ছকে ধরা পড়তে চায়না - এক অপরূপ অনভিজ্ঞতা, তবু তার প্রকাশ অভিজ্ঞতার রূপ-রেখা পথ ধরে – তাই তাকে বলতে পারি অ(ন)ভিজ্ঞতার শ্রম। লেখক তাঁর কাজে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতাকে বজায় রেখেই এই অ(ন)ভিজ্ঞতার শ্রমেরই কর্তব্য পালন করে চলে। এটাই একজন লেখকের সুস্পষ্টরূপে নৈতিক একটি দায়।

উপসংহার

আমাদের আলোচনায়, তিনটি অধ্যায় জুড়ে প্রায় প্রতিটি ধাপেই আমরা গবেষণার প্রতিপাদ্য এবং ছোট ছোট সিদ্ধান্ত বিষয়ে উল্লেখ করতে করতে এগিয়ে এসেছি। প্রতিটি অধ্যায়েই আমরা বেশ কিছু ছোট বড় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম। প্রথমে সেই সিদ্ধান্তগুলিকে পুনরায় সাজানোর চেষ্টা করা যাক -

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছিন্ন-পত্রাবলী' গ্রন্থের টুকরো একটি পত্রাংশ আলোচনার সূত্র ধরে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করেছিলাম। আমাদের আলোচনার প্রাথমিক ধাপে - আমরা দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রধান সংরূপগুলিতে নিজের লেখার অভিজ্ঞতাকে পরিপূর্ণ ও যথার্থ প্রকাশ বলে মেনে নিতে পারছেননা। সেখানে পাঠকদের সঙ্গে ওনার কোন সংযোগ তৈরি হতে পারেনা বলে তিনি মনে করেছেন কিন্তু ইন্দিরাদেবীকে লেখা চিঠির ক্ষেত্রে উনি অনেক বেশি উন্মুক্ত ভাবে নিজেকে প্রকাশে সক্ষম। তথাকথিত সাহিত্য সংরূপের যেসব সীমাবদ্ধতা - সেই সকল সীমাবদ্ধতাকে উনি ভেঙে ফেলতে পারছেন সেখানে। যদিও তিনি এই লেখার পাঠকের বিষয়ে, এই লেখার অভিমুখের বিষয়ে সচেতন তথাপি কেমন করে তিনি এমন প্রকাশে সক্ষম সে বিষয়ে তিনি অনিশ্চিত। তিনি ভাবছেন সম্ভবত কোন দৈব উপায়েই লেখক নিজের সত্যকার প্রকাশে সক্ষম হন। এই আলোচনা থেকে ক্রমে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লেখকের কথা'-য় এসেও লেখকের আদত শ্রম যে কীরূপ - তার পরিমাপের সমস্যায় এসে উপনীত হই। সম্ভবত সে শ্রম পরিমাপের অতীত। সম্ভবত তাকে উৎপাদনের অর্থনীতির মধ্যে ধরা যাচ্ছেনা। হয়ত এই শ্রম - শ্রমের থেকেও আরও বেশি করে সৃজন যেন। এই আলোচনায় অবতীর্ণ হয়ে - ক্রমে শ্রমের মূল্যের তর্ক থেকে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নির্মাণের তর্ক হয়ে আমরা লিখনে এসে উপনীত হই। বুঝতে পারি - লিখন আসলে কেবলমাত্র কথনের অনুলিপি বা তুচ্ছ বিকল্প নয়। লিখন আরও গভীর এবং ব্যাপক। জাক দেরিদার লিখনের দর্শন – আমাদের লেখার সংকীর্ণ অর্থনীতি ও উন্মুক্ততার প্রসঙ্গে, অপরের প্রতি লেখকের কর্তব্য-বোধের প্রসঙ্গে, দায়ের প্রসঙ্গে অবগত করেছে। ফলে একই সঙ্গে আমরা বুঝতে পেরেছি – লিখন আসলে একাধারে কর্ম আবার অন্যদিকে ঘটনাও। সবটা যে নিয়ন্ত্রণাধীন এমনটাও বলা চলে না। সবটুকু যে লেখকের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও তার প্রকাশের সমানুপাতে ধরা দেবে এমনটা বলা চলেনা। লিখন একটি ঘটনা – একথা সত্য। অমিয়ভূষণ লিখনকে ঘটনার তত্ত্বে নানাভাবে বিশ্লেষণ করতে চাইবেন। দেরিদার লিখন-দর্শনের পটভূমিকায় মানিক, রবীন্দ্রনাথ ও অমিয়ভূষণের লেখাকে আশ্রয় করে - প্রথম অধ্যায়ের শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে - লেখার কাজ আসলে, সম্পূর্ণরূপে লেখকের অভিজ্ঞতা নির্ভরও নয়, আবার লিখনের কায়দা কানুন নির্ভরও নয়। এই দুয়ের কোন একটাকে দাগিয়ে দেওয়া চলে না। বরং আমরা লেখার কাজকে বলতে পারি অ(ন)ভিজ্ঞতার শ্রম। কিন্তু সেটা বলতে পারি কি? একটি প্রতিপাদ্য হিসেবে, একটি প্রশ্ন হিসেবে প্রথম অধ্যায়ের

শেষে এই তর্কটি আমাদের সামনে উঠে আসে। এই তর্কের সম্ভাব্য মীমাংসার হদিশ খুঁজতেই আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে - প্রাথমিক ভাবে দেরিদীয় সাহিত্যতত্ত্ব ও বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসকে পাঠ করি এবং ক্রমে সাহিত্যের মূল্য বিষয়ক তর্কে উপনীত হই। এই মূল্যের তর্কটি থেকে আমরা মার্ক্সবাদ, আধুনিকতাবাদ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেকার মূল্যের তর্ক তথা ভবিষ্যৎবাদের তর্কে উপনীত হই এবং ক্রমে আবিষ্কার করি যে - লেখার কাজ আসলে, আত্ম-পরের সম্বন্ধের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত হওয়ার কাজ। অপরের প্রতি কর্তব্যবোধকে কোন ভাবেই খণ্ডন না করে। আমরা লক্ষ্য করি সাহিত্যের মূল্য কি তথা সাহিত্য কি এই প্রশ্নগুলির প্রেক্ষিতে লেখকেরা - সমালোচকেরা নানা ভাবে কোন একধরণের যথাযথ লিখন এবং আসন্ন লিখন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ও তৎপরতা প্রকাশ করেছেন। ফলত আমাদের আলোচনা থেকে আমরা বুঝি - যে তথাকথিত মার্ক্সবাদী সাহিত্য বা লিখন চিন্তাই হোক কিংবা অন্য কোন ধরণের সাহিত্য বা লিখন চিন্তা – সম্বন্ধ-তত্ত্বের আভাসের পাশাপাশি – অজানা একধরণের ভবিষ্য-চিন্তার প্রেক্ষিতও নানাভাবে এই আলোচনার অনুষঙ্গী হয়ে উঠেছে। আমাদের আলোচনা লিখনের সত্ত্বা-গত কোন অন্বেষণ নয় (সত্ত্বা-গত আলোচনা আরও নির্দিষ্টরূপে দার্শনিক ও আরও বেশি চিন্তাকেন্দ্রীক হওয়া উচিৎ বলে আমরা মনে করি), বরং লেখার কাজের রকম, লেখার কাজের বিন্যাস, লেখার কাজের মানচিত্র বা বলা বাহুল্য লেখার কাজের স্বরূপটি ঠিক কেমন সেই বিষয়েই আমাদের আলোচনা। সেই প্রেক্ষিত থেকে, আমরা আমাদের সম্ভাব্য একটি মীমাংসাকে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন লেখকের - লেখা সংক্রান্ত লেখালিখির বিচারে বেশ কিছুটা অনুসন্ধান করে দেখেছি। মোটের উপর বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে লেখার কাজের ধারণা বিষয়ে - একধরণের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া গেছে। যদিও লেখা কেমন হবে বা হতে পারে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে নানাবিধ মতান্তর, মনান্তর – তফাতের কোন অন্ত মেলেনি।

গবেষণার মধ্যে দু-একটি প্রসঙ্গ ছিল, যে বিষয়ে আমাদের উপসংহার অংশে আলোচনা করার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছিলাম। তার মধ্যে একটি প্রসঙ্গ হল - সৃজনশীলতা কি লেখকদের ক্ষেত্রে অভিশাপ বা একধরণের অসুখের মত করেও দেখা যায়? অভিশাপ বা দুর্বলতা বা অকর্মণ্যতা অর্থে কি পাঠ করা যায়? যেটা সুধাংশু ঘোষের লেখার ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করেছিলাম, খানিকটা বিমল মিত্রের মধ্যেও খেয়াল করেছিলাম। হয়ত এধরণের বক্তব্য আরও অনেকের ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যাবে। বিশেষত আধুনিকতাবাদী লেখকদের ক্ষেত্রে আরও বেশি করে একথা সত্য (প্রসঙ্গত আমরা বোদলেয়ারের আলোচনা করেছি, এমনকি অর্থনীতি বা উপহার বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেও দেরিদা বোদলেয়ারের সাহিত্য বিষয়েই আলোচনা করেছেন)। দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টি আলোচনা করা আমাদের সাধ্যাতীত অথচ সেই বিষয়ক প্রশ্ন আমাদের আলোচনা থেকে উঠে আসা খুবই স্বাভাবিক। প্রশ্নটি হল – 'লেখার কাজ' বিষয়ক যে সমস্ত সিদ্ধান্ত বা ধারণা আমরা গড়ে তুলতে চেয়েছি – সেই সিদ্ধান্তগুলি কি সাধারণ অর্থে কাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ? আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এবিষয়ে কিছু লিখবার মতো যোগ্যতা আমাদের নেই, কেবলমাত্র – উপরোক্ত প্রশ্ন-দুটিকে একত্র করে আমরা আমাদের মতানুসারে একটি যুক্তি প্রস্তুত করার চেষ্টা করব।

প্রথমত উল্লেখ করি, সৃজনশীল কাজ তথা সৃজনের ধারণা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে জাক দেরিদার সমসাময়িক একজন ফরাসী দার্শনিক জিল দ্যলুজের সৃজন সংক্রান্ত আলোচনাকে গবেষণার মধ্যে টেনে আনার অন্যতম কারণ ঐ আলোচনাটির যে নতুন ধরণের ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে জর্জিও আগামবেন প্রস্তুত করেছেন – সেই বিষয়টি নিয়ে উপসংহার অংশে আলোচনা করা (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য – মরিস ব্লাঁশো এবং জাক দেরিদা তাদের বিভিন্ন লেখায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু আগামবেনের এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের মূল বক্তব্যটুকু একত্রে তুলে ধরা সহজ হচ্ছে বলেই আমরা এটিকে বেছে নিয়েছি)। আমাদের ধারণা যেহেতু এই বিষয়ে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে কিছুটা আলোচনা করেছি ফলত তার সূত্র ধরে উপসংহারে বাকি আলোচনাটুকু করা অনেকটা সহজ হবে। দ্বিতীয়ত, যে কথাটি উল্লেখ করে নিতে চাই – আগামবেন তাঁর বক্তৃতায় যদিও কাব্যিকতা, সৃজনশীলতা বিষয়ে কথা বলছেন তথাপি তাঁর আলোচনা আদৌ সাধারণ সাহিত্যতত্ত্ব বা দর্শনের আওতায় পড়ছেনা, বরং আগামবেন এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের গভীর দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। দর্শনের তথা তর্কবিদ্যার যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে - এ বিষয়ে আলোচনা করা উচিত বলে আমার মনে হয় না। যে কোন গবেষক বা পাঠক চাইলে আগামবেনের সেই বক্তৃতাকে অন্তর্জাল থেকে শুনে নিতে পারেন। বক্তৃতাটির নাম ‘আর্ট অ্যাজ রেসিস্টেন্স’ অর্থাৎ দেলেউজের বক্তব্যের সূত্র ধরেই শিল্প, সৃজনশীলতা ও প্রতিরোধের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করেছেন আগামবেন। আলোচনা করেছেন মূলত অ্যারিস্টটলকে কেন্দ্র করেই। (এই বক্তৃতাটি প্রবন্ধাকারে পরবর্তীকালে আগামবেন – এর “Creation and Anarchy” – নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়) -

যে মূল কয়েকটি সিদ্ধান্ত উনি জিল দেলেউজের তর্ক থেকে তুলে এনেছেন সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করছি পর পর –

১। প্রথমত সৃজন যে আসলে একধরণের কাজ এটা স্বীকার করে নিয়েও উনি সৃজনের মধ্যে - তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়তার মধ্যে একধরণের কর্মহীনতা (Worklessness[২৭১]) বা অকর্মণ্যতা তথা অন্যঅর্থে কর্ম পূর্তির হদিশ খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

২। এই কর্মহীনতাকে আগামবেন একধরণের খামতি বা আমরা যাকে লেখার রোগ, লেখার অসুস্থতার মত করে বুঝতে চাইছিলাম - খানিকটা তেমন করেই বুঝতে চেয়েছেন যেন। উনি যাকে কাজের ‘Impotentiality’[২৭২] – বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তাকে আমরা অভিশাপ, অসুস্থতা, রোগ – এই ধরণের নঞর্থক ধারণা দিয়েও পড়তে পারি। আসলে সৃজনের মধ্যে যে একধরণের গড়ে তোলা বা নির্মাণের ধারণা আছে - যাকে অনেকটা অট্টালিকা নির্মাণের মতও মনে হতে পারে - সেই সাধারণ, কেবলমাত্র ‘operative’ নির্মাণের ধারণার সঙ্গে যাতে

---

[২৭১] Agamben Giorgio, *Creation and Anarchy*, Standford University Press, Caliornia, 2019, p-25

[২৭২] Agamben Giorgio, *Creation and Anarchy*, Standford University Press, California 2019, p-23

আমরা গুলিয়ে না ফেলি - সেই কারণেই আগামবেনের সৃজন সংক্রান্ত এই অসদর্থকতা বিষয়ে আমাদের এক্ষেত্রে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

৩। যে 'Inoperative' –শর্তে আগামবেন সৃজনকে চিন্তা করতে চাইছেন - তার মধ্যে বা তার সঙ্গেই উনি আসলে মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার বা আমরা তিনটি অধ্যায় জুড়ে যে অজস্র কথা অজানা, অসম্ভব ভবিষ্যৎ বিষয়ে বলে আসছি – সেই ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠার যে ধারণা – তাকে যুক্ত করে দিচ্ছেন প্রকারান্তরে। বলছেন "For Carpenter, for Shoe maker there is a work but for man as such, there is no work."[২৭৩]

প্রসঙ্গত উঠে আসছে "poetics of impotentiality"-র কথা। মানুষের সৃজনশীলতা যেন প্রকৃত মানুষতার দিকে একধরণের ধাবমাণতা। প্রকৃত মানুষতাকে আগামবেন ঐশ্বরিক অবস্থার নিরিখে কল্পনা করে একধরণের সম্পন্নতা, পূর্ণতা ও কর্মপূর্তির শর্তে দেখতে চাইবেন। সেই অর্থে প্রকৃত অর্থে মনুষ্যের জন্য আসলে কোন কাজ নেই বলে উনি মনে করতে চাইবেন। এই সমস্তটাই গভীর দার্শনিক আলোচনার বিষয়। দার্শনিক আগামবেন তাঁর গভীর পাঠ থেকে এই বিষয়ে আলোচনা করছেন। আমরা আমাদের মত করে তাঁর বক্তব্যের সিদ্ধান্তগুলি থেকে আমাদের গবেষণার তর্কটিকে খানিকটা সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করছি মাত্র। 'কাজের দর্শন' গভীর আলোচনার বিষয় - সেই বিষয়ে আমাদের আলোচনা করার হয়ত ততটা অধিকারও নেই।

তাহলে মোটের উপর যে বিষয়টি সম্বন্ধে আমরা খানিকটা আন্দাজ করতে পারি - যে কোন কাজের মধ্যেই সম্ভাব্য একধরণের সৃজনশীলতা বা কাব্যত্বের সম্ভাবনা আছে। কাজকে তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিতে পারলে হয়ত কাজের পূর্ণতা তথা অসম্ভব, অজানা, ভবিষ্যতের প্রতি উন্মুক্ত হওয়া যায়। অনিশ্চিত অনির্ণেয়ের প্রতি উন্মুক্ত হওয়া যায়। লেখার কাজের ক্ষেত্রে তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে - তার একধরণের বিশ্লেষণের চেষ্টা আমরা করেছি আমাদের গবেষণায়। সাধারণ অর্থে কাজের ক্ষেত্রে তা কিভাবে সম্ভব বা আদৌ সম্ভব কিনা – তা আরও গভীর গবেষণার প্রশ্ন। আগামবেন বলবেন – রাজনীতি বা দর্শনচর্চাই হল সাধারণ অর্থে মনুষ্যকর্মের কাব্যিকতা (মনুষ্যকর্মের কাব্যিকতাকে এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলাটা ঠিক কিনা সেটা আরও বিস্তৃত আলোচনার বিষয়)। আমাদের গবেষণার প্রেক্ষিতে প্রায় সমস্ত আলোচনাটিই কম বেশি একরকম করে - দেরিদীয় রাজনৈতিকতার মধ্যে দিয়েই পরিচালিত হয়ে এসেছে। সেই রাজনৈতিকতাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আলগোছে বললে - সেই রাজনৈতিকতায় একধরণের বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক বহুত্বের ধারণা প্রকট বা প্রচ্ছন্নভাবে হলেও কার্যকরী। কিন্তু সেই ধারণা কি একেবারে পরিচিত উদারবাদী গণতন্ত্রের সঙ্গে যথার্থ ভাবে মিলে মিশে যাবে ? সেরকম মনে হয়না – কারণ তথাকথিত ফরাসী কিংবা মার্কিনী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নানান ত্রুটি বিচ্যুতি বিষয়ে দেরিদা বিভিন্ন সময় কথা বলেছেন। ফলত আমার ধারণা ওনার রাজনৈতিক চিন্তার একটা খোলা দিক আছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিচ্যুতিগুলি থেকে উত্তরণ ঘটানোর একটা মাত্রাও আছে - যেটা কার্যত অজানা। যেহেতু আমরা

[২৭৩] Agamben Giorgio, *Creation and Anarchy*, Standford University Press, Caliornia, 2019, P-25

প্রসঙ্গত আগামবেনের সূত্রে কাজের ধারণাকে আমাদের প্রেক্ষিতে বুঝবার চেষ্টা করছিলাম - তাই আগামবেনের রাজনৈতিকতার (একভাবে পাঠ করলে Anarchic রাজনীতি) তুলনা থেকে আমাদের তর্ককে স্বভাবতই সরিয়ে রাখতে পারিনা। যদিও আমার মতে সেই তর্ক আসলে - উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে থেকেই পথ খুঁজে নেওয়ার তর্ক। গণতন্ত্রের সত্যকারের সম্ভাবনাগুলিকে বিচ্ছুরিত হতে দেওয়ার প্রশ্ন। আগামবেনের রাজনীতিকে আমরা এখানে দেরিদার সূত্রে এভাবেই পাঠ করতে পারি (বরং খুব সংক্ষেপে বলা চলে - এই সূত্রে গণতান্ত্রিক রাজনীতির সর্বোচ্চ সম্ভাবনার প্রশ্ন আসলে কিভাবে মানুষের তথা ব্যক্তি মানুষের যাবতীয় প্রশ্নের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সেই বিষয়টিও খানিকটা স্পষ্ট হয় এবং ভবিষ্যৎ চিন্তায় বহুত্ব বা অনেকাত্ম বা তথাকথিত Heterogeneity-ও তার নিজস্ব গুরুত্বে প্রতিস্থাপিত হয় বলে আমাদের ধারণা)। একটি কথা এখানে স্পষ্ট করে নেওয়া উচিৎ - সংসদীয় রাজনীতি বা তথাকথিত সংসদ-বিরোধী রাজনীতি (যাকে সাধারণ ভাবে একটি নির্দিষ্ট অর্থে সক্রিয় রাজনীতি বলে আমরা চিনি) আমাদের গবেষণার বা আলোচনার বিষয় নয়। আমরা সে বিষয়ে আলোচনার যোগ্যও নই। কেবল 'লেখার কাজ' বিষয়ে যেসকল সিদ্ধান্তগুলি আমরা পেয়েছি সেই প্রেক্ষিত থেকে সাধারণ অর্থে 'কাজ'-এর ধারণাকে কি আমরা কোন ভাবে ভাবতে পারি - এটাই আমাদের এই অংশের মূল প্রশ্ন (এই রাজনীতিকে কেউ লিখনের রাজনীতি বলে চিহ্নিত করতে পারেন)।

প্রসঙ্গত লক্ষ্য করা যেতে পারে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় একটি খটকা ছিল, তিনি বলেছিলেন লেখকের জীবনদর্শন থাকতে হবে[২৭৪]। তাহলে মজুরের কি জীবনদর্শন থাকবেনা? এই বিভাজনের সঙ্গেই কিন্তু আসলে, জড়িয়ে আছে, বিশুদ্ধ কাজ আর অশুদ্ধ কাজ কাকে বলব তার ধারণা। যখন আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি প্রথম অধ্যায়ে, ঠিক কেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আমাদের গবেষণায় দেরিদীয় দর্শনের চোখে উপস্থিতির অধিবিদ্যার ছকে পড়ে যাচ্ছে - তখন আমরা আসলে এটাও বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি, যে মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রম, বিশুদ্ধ কাজ ও অশুদ্ধ কাজের বৈপরীত্য মানিকের অজান্তেই মানিকের লেখায় ক্রিয়াশীল। মানিক এই বিভাজনকেই ভেঙে ফেলতে চাইছেন, কিন্তু কোথাও কোথাও অজান্তেই এর ফাঁদে পড়ে যাচ্ছেন যেন। সেই আলোচনার সূত্রকে যদি আমরা বৃহৎ অর্থে কাজের আলোচনায় টেনে আনি তাহলে প্রশ্ন জাগে - কাজের ক্ষেত্রে উন্মুক্তি, কর্তব্যের কি কোন স্থান নেই? কাজ কি নেহাত যন্ত্র-তত্ত্ব বিশেষ? সৃজনশীল কর্মী আর সাধারণ কর্মীর তফাতটা কি এতটাই জল অচল? এই বিষয়ে, এখানে উপসংহারের পরিশেষে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প দিয়ে আমাদের আলোচনার ইতি টানতে চাই –

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী'[২৭৫] গল্পের মদন তাঁতি সারা রাত্রি জেগে কেবল নিজের খালি তাঁত চালায় তবু সে তার কাজের প্রতি কোন আপোষ করে না। বাবুদের মতে মত মিলিয়ে নিজের কাজকে বিসর্জন দেয়না, এমন কি

[২৭৪] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *লেখকের কথা,* নিউ এজ পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ-৩৬

[২৭৫] মানিক বন্দোপাধ্যায়, (সম্পা, যুগান্তর চক্রবর্তী), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প,* বেঙ্গল পাব্লিসার্স, ২০০৮, পৃ- ১০৮-১১৩

তথাকথিত উৎপাদনশীল কোন কার্যও সে করেনা। সে কেবল নিখাদ অকর্মণ্যের মত একটা খালি তাঁত চালায়। পায়ের খিঁচ সারাই করতে - মদন তাঁতি-কে তাঁতটাই কেন চালাতে হল ? সে গন গন করে সারা রাত্রি হাঁটতে পারত অথবা অন্যকিছু করতে পারত, নিদেন পক্ষে শুয়েই থাকতে পারত। ঋত্বিক ঘটক তার ‘যুক্তি তক্কো গপ্পো’ সিনেমার শেষ অংশে - মৃত্যুর আগে, মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় - মানিকের ‘শিল্পী’ গল্পের মদন তাঁতির সেই কৈফিয়তটিকেই আরেকবার আউড়ে ওঠেন, বলেন - “কিছু তো একটা করতে হবে”। এই কৈফিয়তের বিশ্লেষণ হিসেবে এরকমটা মনে হতে পারে - কি আর করব আমরা - কিছু একটা করাই যেন আমাদের কাজ। একটা তথাকথিত অর্থহীণতার দ্যোতনা যেন - একই সঙ্গে কারো কারো মনে হতে পারে যা খুশি করার ছাড়পত্র। কোন কাজ নির্দিষ্ট করা নেই যখন - তখন যা খুশি করাটাকেই যেন বেছে নেওয়া যায়। নীতি-রাজনীতির কথা ভাবা অবান্তর - কিন্তু আমরা আমাদের গবেষণার নিরিখে গল্পটিকে আদৌ সেভাবে পড়ছিনা। আমরা পড়ছি – একটা সতর্ক, জ্বলন্ত প্রশ্ন, আহ্বান, কর্তব্যের মত করেই। আমাদের কাছে অন্তত গল্পে সেভাবেই উঠে আসছে সংলাপটা। খুব গভীর ভাবে চিন্তা করতে পারলে - শূন্য তাঁত চালানোর তাৎপর্যকে কর্তব্যের সতর্কতার সঙ্গে এক করে পাঠ করা যায় (দেরিদার দর্শন অনুসারে যা অপরের প্রতি আহ্বানের কর্তব্য, নিজেকে উন্মুক্ত করার কর্তব্য) । যেন মদন তাঁতির নৈঃশব্দ্যে এবং সিনেমার সংলাপটির ব্যঞ্জনায় তীব্র কর্তব্যের আর্তনাদ উদ্ঘাটিত হয়। অন্তত আমরা আমাদের গবেষণায় এভাবেই পাঠ করছি - এভাবে পাঠ করাকেই এখানে কর্তব্য মনে করছি। পৃথিবীর বুকে একজন খাঁটি লেখকের - ঐ খালি, শূন্য, চরমতম জটিল ও ততোধিক অসম্ভব কাজটুকুই হয়ত একমাত্র কাজ।

গ্রন্থপঞ্জী

(বাংলা)

১। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *কাব্যজিজ্ঞাসা* , বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৮০৯

২। অনির্বাণ দাশ (সম্পা.), *বাংলায় বিনির্মাণ/অবিনির্মাণ,* অবভাস, কোলকাতা, ২০০৭

৩। অবন্তীকুমার সান্যাল, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব* , সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৫

৪। অমিয়ভূষণ মজুমদার, *লিখনে কী ঘটে* , আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭

৫। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস,* দে'জ পাবলিশিং , কোলকাতা, ২০১৯

৬। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, *রবীন্দ্রস্মৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

৭। কমলকুমার মজুমদার, *অগ্রন্থিত কমলকুমার* ,অবভাস , ২০০৮

৮। কল্যাণ মৈত্র (সম্পা.), *আলাপ : লেখক-লেখিকা-শিল্পীদের অলখিত জীবন ও দর্শন নিয়ে আলাপচারিতা,* প্রতিভাস, কোলকাতা, ২০১২

৯। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন,* বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬০বঙ্গাব্দ

১০। ধনঞ্জয় দাশ (সম্পা-), *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক* , করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩

১১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পা। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়), *বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি,* নাথ ব্রাদার্স, কোলকাতা, ১৯৬০

১২। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *সাহিত্য-মীমাংসা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

১৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *লেখকের কথা,* নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭

১৪। মালিনী ভট্টাচার্য, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : একটি জীবনী* , আর বি এন্টারপ্রাইসেস, কোলকাতা, ২০২১

১৫। জীবনানন্দ দাশ, *আমার কথা কবিতার কথা,* ছোঁয়া, ২০১৫

১৬। রণজিৎ গুহ, *দয়া : রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা,* তালপাতা , ২০১০

১৭। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব,* অবভাস, সেপ্টেম্বর - ২০১৭

১৮। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ,* সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

১৯। সুকল্প চট্টোপাধ্যায় (সংকলন ও সম্পা), *সংলাপ সংলাপ : একটি সাক্ষাৎকার সংকলন,* ধানসিঁড়ি, ২০১৬

২০। সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০

২১। সুভাষ মুখোপাধ্যায়(সম্পা), *কেন লিখি,* মিত্র ও ঘোষ, কোলকাতা, ২০০০

২২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের একদিক,* শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

২৩। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *আলিবাবার গুপ্তভান্ডার : প্রবন্ধ সংকলন,* গাঙচিল , কোলকাতা , ২০০৮

(English)

1. Althusser. Louis, *On The Reproduction of Capitalism*, Verso, London, 2014

2. Attridge Derek, *The Singularity of Literature*, Rutledge, London, 2004

3. Attridge Derek, *The Work Of Literature*, Oxford, UK, 2017

4. Agamben Giorgio, Creation and anarchy, Standford University Press, Caliornia, 2019

5. Banerjee Trina Nileena, *Performing Silence: Women in The Group Theater Movement in Bengal*, Oxford University Press, 2021

6. Chaudhuri Rosinka, *Letters from a Young Poet: 1887-1895*, Penguin, UK, 2014

7. Chaudhuri Rosinka, *The Literary Thing*, Oxford University Press, 2014

8. Clark Timothy, *The Poetics of Singularity* , Edinburgh University Press, Edinburgh, 2005

9. Das Anirban, *Toward a Politics of the (Im)Possible : The Body in The Third World Feminisms*, Anthem Press, London, New York, 2010.

10. Deleuze Gilles, *Two Regimes of Madness: Texts and Interviews 1975-1995 ed. David Lapoujade*, trans. Ames Odges and Mike Taormina(Semiotext(e) Foreign Agents distributed by Cambridge : MIT Press, 1976

11. Derrida Jacques, Gayatri Spivak, (trans.), *Of Grammatology, John Hopkins Press, London, 1997*

12. Derrida Jacques, *Writing and Difference*, Rutledge, London, 2002

13. Derrida Jacques, (Ed. Derek Attrite), *Acts of Literature*, Rutledge, New York, 1992

14. Derrida Jacques, (Ed. John Branigan, Ruth Robbins and Julian Woulfreys), *Applying: To Derrida*, Macmillan Press LTD, 1996

15. Derrida Jacques, *Specters of Marx : The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International*, Taylor & Francis, 2012

16. Derrida Jacques . *Writing and Difference*, University of Chicago Press, 2017

17. De Sushil Kumar (Ed.), *History of Sanskrit Poetics* (In Two Volumes), Firma K LM Pvt. Ltd., Calcutta, 1998

18. Douzinas Costas (Ed.), *Adieu Derrida* (Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007

19. Foucault Michel, *The Focault Reader* , Pantheon Books, New York, 1979

20. Ghosh Swati, *The Gendered Proletariat : Sex Work, Workers' Movement and Agency*, Oxford University Press, Delhi, 2017

21. Kristeva Julia, *Passions of Our Time*, Columbia University Press, New York, 2018

22. Kirby Vicki, *Telling Flesh: The Substance of the Corporeal*, Rutledge, New York, 1997

23. Lyotard. Jean Francois, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1984

24. Marx Karl, *Capital (Vol-1)*, Foreign Language Publishing House, Moscow

25. Macherey Pierre, *A Theory of Literary Production*, Rutledge, London, 1978

26. Louis Althusser, Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macherey and Jacques Ranciere, *Reading Capital* (The Complete Edition), Verso, London, 2015

27. Rubin I.I, *Essays on Marx's theory of value,* Black Rose Books, New York

28. Williams Raymond, *Marxism and Literature*, Oxford University Press, 1977

পত্রিকাপঞ্জী

(বাংলা)

১। এক্ষণ পত্রিকা, কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যা, ১৯৬৮ (পুনর্মুদ্রণ ২০১৮)

২। দেশ পত্রিকা, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩

৩। দেশ পত্রিকা, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২

৪। উলুখড় পত্রিকা, দ্বাদশ সংকলন, শরৎ ১৪১৮

৫। উলুখড় পত্রিকা, চতুর্দশ সংকলন, গ্রীষ্ম ১৪২২

৬। বৈশাখী, সাহিত্য সংস্কৃতির ধুসর স্মৃতিসম্ভার, ২০১০-১১

৭। দীপন, বিষয় : আত্মজীবনী, ২০০৬

৮। অবকাশ, সাহিত্য পত্র, বিশেষ সংখ্যা, ২০১৯

৯। পুরালোকবার্তা, আত্মকথা বিশেষ সংখ্যা, ২০১৬-১৭, বার্ষিক সংখ্যা।

১০। রাবণ (একটি আত্মকথার ষাণ্মাসিক) – জানুয়ারি ২০১২

১১। ঐ - অগাস্ট ২০১২

১২। ঐ - জুলাই ২০১৬

১৩। ঐ - আগস্ট ২০১৪

১৪। ঐ - জানুয়ারি ২০১৯

১৫। ছাপাখানার গলি (আত্মজীবনী সংখ্যা – এক –মে ২০২২)

১৬। ছাপাখানার গলি (আত্মজীবনী সংখ্যা – দুই- মে ২০২২)

(English)

1. *Diacritics,* Winter, 1985
2. *Critical Inquiry*18, no. 2, 1992